রাধামতি

উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়

মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।

মহাশয়,

সংসার-জীবনের সূত্রপাতে ভবদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব স্নেহের চক্ষে দেখেন, সে দর্শনে আপনাদিগের অনুগ্রহ লাভ! সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে আপনি আমার সহায়স্থানীয় ও পৃষ্ঠপোষক, সেজন্য সে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ, আমার এই অকিঞ্চিৎকর "রাধামতি" আপনার পবিত্র করকমলে অর্পিত হইল, নিবেদন ইতি, ১৭ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৩ সাল।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরাধানাথ মিত্র।

অনেকগুলি কবিতা আছে। সংসারে থাকিয়া গৃহস্থালী করিতে হইলে, গৃহস্থ ও গৃহিণীর কি করা কর্ত্তব্য, সে সবেরও আভাস এই গ্রন্থে আছে। অতিথি সেবা, কুটুম্বিতা, পোষ্য ও পশ্বাদি পালন প্রভৃতির চিত্রও চমৎকার, কবিতাগুলি মিষ্ট। বিষয়গুলি গল্পেরমত কৌতূহলোদ্দীপক। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই পুস্তকের আদর হইবে, ইহাই আমাদের ভরসা।"—বঙ্গবাসী।

"The object of this poem has been stated by the author himself to be the inculcation of practical lessons. He has wonderfully successed in this mission of his and we think that the book will find a ready and willing reading public of our Hindu Community."—The Amrita Bazar Patrica.

অপূর্ব্ব কাহিনী।—আপন নামের স্বার্থকতা সাধন করিবে। বঙ্গভাষায় ইহা অভিনব বস্তু, সাহিত্যামোদীর আদরের সামগ্রী, মূল্য ১৲ বাঁধা ১।০ "গল্পটী মনোহর, লিপিচাতুর্য্যে, বর্ণনার মধুরতায়, ভাবের সমাবেশে এবং চরিত্র চিত্রণে এই পুস্তকখানি পাঠকপাঠিকার আদৃত।"—হিতবাদী।

লালকুঠি।—সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস, নূতন সংস্করণ মূল্য ॥০, বাঁধা ৸০।

"গল্পটী যেমন কৌতুকপ্রদ, ভাষাও তেমনই সরস ও তরল। পড়িতে পড়িতে লালকুঠি যেন চুম্বকের আকর্ষণে পাঠককে টানিয়া লইয়া যায়।"—বঙ্গবাসী।

বিশালাক্ষী।—দাম্পত্য প্রণয়ের নিখুঁত চিত্র, মনোহর উপন্যাস, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট, মূল্য ।৶০, বাঁধা ॥/০।

"বিশালাক্ষী গল্পাংশে বড়ই মজাদার। পাঠে কৌতূহল অতীব উদ্দীপ্ত হয়। রাধানাথ বাবু অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বলি—এখানি সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় হইবে। ভাষাকৌশলও সুন্দর।"—বঙ্গবাসী।

ভাগ্যলক্ষ্মী।—প্রবন্ধ পুস্তক মূল্য ।৶০, বাঁধা ৸৶০ আনা পুস্তকে অনেকগুলি [illegible] ও [illegible] আছে

ইহাতে শিখিবার, দেখিবার ও ভাবিবার বিষয় যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কলিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক অনাদৃত হইবে, এরূপ আশঙ্কা নাই।”—হিতবাদী।

সচিত্র প্রেমপত্র।—কবিতায় স্ত্রী পুরুষের উত্তর প্রত্যুত্তর, ২য় সংস্করণ মূল্য ।০ আনা। পুরুষ ও প্রকৃতি সংসারের মূলাধার। প্রেম-পাশে জড়িত হইয়া স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, আপনার করিয়া লয়. সতীর পতিই পরম গুরু, পতির পত্নী জীবনসঙ্গিনী “প্রেমপত্র” সে বিমল প্রেমের—বিশদ ছবি।

“এই পুস্তকে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর বিবিধ পত্ররূপে কতকগুলি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রচনা আশাপ্রদ, আকৃতি সুন্দর, চিত্রগুলি উৎকৃষ্ট, মুদ্রাঙ্কণও পারিপাট্য, যুবক যুবতীর নিকট ইহার সমাদর হইবে।”—হিতবাদী।

লক্ষ্মীশ্রী।—প্রবন্ধ পুস্তক, মূল্য ।০ “রাধানাথ বাবু এই পুস্তকে যে কয়েকটী প্রবন্ধ দিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই সুললিত ও সদুপদেশ পূর্ণ, এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি”—বসুমতী।

কাণাকড়ি।—(পকেট্‌বুক্) মূল্য ।/০ সমাজ,সংসার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচিত্র চিত্র। “হুজুগে ও কাপট্যে, দেশের অস্থি মজ্জা কিরূপে মড়্ মড়্ ভাঙ্গিতেছে, কয়েকটী চরিত্র চিত্রে রাধানাথ বাবু তাহাই দেখাইয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার সিদ্ধহস্ত রচিত সরল সহজ গদ্য ও পদ্যের পরিচয় পাইয়াছি। ইহার আদর সর্ব্বত্র হইবে, ভরসা।”—বঙ্গবাসী।

ভাবে অভাব।—ধর্ম্মমূলক গল্প,সাহিত্যে নূতন জিনিষ,২য় সং, মূল্য ৵০

“সরল সরস লিপিপটুতায় রাধানাথ বাবু চিরপ্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থে তাঁহার সে মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে। পাঠক পাঠিকা মাত্রেই ইহা আদর করিয়া পড়িবে, আমাদের এই বিশ্বাস।”—বঙ্গবাসী।

সত্যনারায়ণ—স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ড হইতে সংগৃহীত, মূল হইতে পদ্যে অনুবাদিত, সংবাদপত্রে বিশেষ প্রশংসিত, মূল্য ৶০।

মোহিনী—সামাজিক উপন্যাস, মূল্য—সুলভ সংস্করণ ॥০ আনা।

জীবন সংগ্রামে সুখ দুঃখের সংঘটন, একদিকে শঠ লম্পটের কুৎসিত প্রবৃত্তি, অন্য পক্ষে পবিত্র হৃদয়ের সদাচার, অধিকন্তু সতী অসতীর চিত্র এই পুস্তকে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মানব চরিত্রে পতন উত্থানের সুস্পষ্ট চিত্র দেখিয়া যদি কিছু শিখিতে ও শিখাইতে চাহেন, তাহা হইলে মোহিনী পাঠ করুন।" —বঙ্গবাসী।

ছায়াপথ।—উপন্যাসে সনাতন ধর্ম্মপ্রসঙ্গ। মূল্য ২৲।

যদি সংসারের নূতন চিত্র দেখিতে চান, যদি মোহিত হইবার সাধ থাকে, যদি শিখিবার সঙ্কল্প থাকে, দুদণ্ড ভাবিবার অবসর থাকে—তবে এই ধর্ম্মময় উপন্যাস পাঠ করুন, আনন্দ পাইবেন অথচ জ্ঞানলাভ হইবে।

"ইহাতে ধর্ম্ম কি, প্রেম কি, বৈরাগ্য কি, বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশ্বধর্ম্ম কেন? জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে কোন পথ শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি কঠিন সমস্যা বিস্তৃত ও বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে এ গ্রন্থের অনাদর সম্ভবে না" —হিতবাদী।

ছায়া।—সাহিত্যের সেই অত্যুজ্জ্বল কোহিনুর—বঙ্গসংসারের জলন্ত আলেখ্য। ২য় সংস্করণ, সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা, মূল্য ১॥০।

"স্ত্রীশক্তি সংসার-আশ্রমে পুরুষের উপর স্ত্রীশক্তির লীলা—এ পুস্তকে দেখান হইয়াছে। এক দেবভাবে, আর এক পিশাচভাবে। এই পুস্তক পড়িতে হয় এবং বুঝিতে হয়; আর বুঝিলে, জ্ঞানলাভ হয়। এমন শিক্ষাপ্রদ সামাজিক উপন্যাসের আদর দেখিলে আমরা সুখী হইব।"—বঙ্গবাসী।

রাধামূর্ত্তি

উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠ মাস। গ্রীষ্মের আতিশয্যে জীবগণ, ম্রিয়মাণ ও স্ফূর্ত্তিহীন। শান্তি-লাভমানসে সকলেই উৎকণ্ঠিত। ঊষা-সতীর সলজ্জ পূর্ণবিকাশ হইতে না হইতেই, যেন অরুণদেব, ঊষাকে ধরিবার জন্য রক্তরাগবিরঞ্জিত হইয়া আকাশের এক প্রান্তে দেখা দিলেন। ঊষা-সতী, ভয়ে বসনাঞ্চল গুটাইতে গুটাইতে নভোমণ্ডলে মিশিয়া গেলেন। সূর্য্যের আশায় ছাই পড়িল। দিনমণি, ভগ্নমনোরথ হইয়া ভীষণক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাই আজি বালসূর্য্যের মূর্ত্তি বড়ই প্রখর। রাজার ক্রোধ হইলে, প্রজার অনেক অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। ইহাই জগতের নিয়ম। সেই নিয়ম, পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হইল। সূর্য্যদেব, রোষকষায়িতলোচনে আকাশের চারি দিকে দেখিতে লাগিলেন। চন্দ্রদেবের সঙ্গে যাহারা পূর্ব্বরাত্রিতে শূন্য-স্থলে নৃত্য করিয়াছিল, সে সকল মূর্ত্তি আর নাই। যে দুই একটি চন্দ্রের সহচরী, সমস্তরাত্রি-বিহারের পরও আকাশে দুই এক বার উঁকি মারিয়াছিল, তাহারাও ঊষার সহিত চলিয়া গিয়াছে; নভোমণ্ডলে সূর্য্যসখা কেহই নাই। কাহাকেও না দেখিয়া সূর্য্যের মূর্ত্তি, ক্রমে প্রখর হইতে প্রখরতর হইল। সূর্য্যের সেই বিরাট আকৃতি দেখিয়া পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তু ভীত হইল। প্রাণিসকল মৌনভাবাপন্ন; বৃক্ষপত্র নিস্তেজ; সরোবরের জল, শুষ্ক-প্রায়।

রাজা আইনকানুন সৃষ্টি—নিয়মনির্দ্দেশ এ সকলই করেন বটে; কিন্তু তাহা কেবল দরিদ্রের জন্য। ধনবান্‌দিগের পক্ষে সে নিয়ম, নির্দ্দিষ্ট হইলেও, তাহা বড় একটা কার্য্যে পরিণত হয় না। গ্রীষ্মের জ্বালায় আমরা কষ্ট পাইতেছি বটে; কিন্তু একবার সম্মুখের ঐ হাস্যময়ী গর্ব্বিত-অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি সূর্য্যের প্রখর কিরণে অশেষ ক্লেশ পাইতেছ, আর ঐ দেখ—সমীরণ, ঐ প্রকোষ্ঠমধ্যে কেমন শীতল, শান্ত ও মনোরম! বৈঠকখানার চারিদিকে খস্‌খসের সাহায্যে দ্বার-বাতায়নগুলি আচ্ছাদিত, কমলার প্রসাদভোগী ধনকুবের, মসৃণ-মর্ম্মর-প্রস্তরাসনোপরি আসীন। আজ্ঞাবাহী ভৃত্য, ব্যজন সঞ্চালন করিতেছে। গোলাপ, কেওড়া ও বরফ-মিশ্রিত পানীয়ে তাঁহার তৃষ্ণা নিবারিত। তাঁহাকে গ্রীষ্মের কোন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে না। কিন্তু দরিদ্রের প্রতি চাহিয়া দেখ। তাহাদের প্রাণে শান্তি নাই, সুখ নাই। শরীর হইতে অবিরত প্রবাহিনী বহিতেছে, যেন সকলে এক এক জন গঙ্গাধর!

এই প্রখর জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্নকালে বায়ুমূর্ত্তি স্তম্ভিত। সময়ে সময়ে স্তম্ভিত বায়ুর অগ্নিশিখাসদৃশ জ্বালায় চতুর্দ্দিক্ উত্তপ্ত। বৃক্ষলতাদির শাখা-পত্রাদি নড়িতেছে না। পথঘাট লোকশূন্য প্রায়। দুই একজন পথিক সেই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

জনৈক ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ-সন্তান সেই সময়ে সামান্য কোন গৃহস্থের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ, গৃহস্থের বহির্দ্বারে উপনীত হইয়াছেন। গৃহস্বামী অথবা বাটীর অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায়, তিনি সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিলেন; এমন সময়ে একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা দেখা দিল। কুমারী দেখিতে পরম রূপবতী; কিন্তু তাঁহার নয়নযুগল সৌদামিনীসদৃশ চঞ্চল; তৃষ্ণায় ব্রাহ্মণের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, গৃহস্থের বাড়ীতে পিপাসার জলপানে বঞ্চিত হইবেন না জানিয়াই, তিনি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

কুমারী, ব্রাহ্মণের মনোগত ভাব কিছুমাত্র না বুঝিয়া, সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি দাঁড়াইয়া কেন গা?"

ব্রাহ্মণ। পিপাসার্ত্ত হইয়াছি, আমায় একটু জল দাও।

বালিকা। এখন বাটীর সকলেই নিদ্রিত, তোমাকে কে জল আনিয়া দিবে? স্থানান্তরে যাও।

ব্রাহ্মণ, বালিকাপ্রমুখাৎ এই কয়েকটী কথা শুনিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে ম্লানবদনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, কোথায় গেলেন—তাহার কিছুই সন্ধান পাওয়া গেল না; কিন্তু যাইবার সময়ে একবারমাত্র পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিয়া সেই বালিকার উদ্দেশে কি যেন দুই চারিটী কথা বলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কেহ, দাস-দাসী-পরিবৃত সুরম্য হর্ম্ম্যে সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন, কাহারও দৈনন্দিন পরিশ্রমোপার্জ্জিত অর্থে বহু কষ্টে দিনাতিপাত হইতেছে,—আর কেহ বা পর্ণ-কুটীর-বাসে একসন্ধ্যামাত্র আহার জুটাইতেছে! একের উন্নতি, অপরের অবনতি—এই ধারাবাহিক স্রোত সংসার-সমুদ্রে অবিরত বহিতেছে। ভাগ্যলক্ষ্মী কখন যে কাহার প্রতি সদয়া, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই! আজি যে ব্যক্তি, সংসার-যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতেছেন, গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত ক্ষণকালও যাহাকে ভাবিতে হইতেছে না; ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হয়তো তাহাকেই উদরান্নের বা পরিধেয় বস্ত্রের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করিতে হইবে।

কোদালেগ্রামখানি হুগলী জেলার অন্তর্গত। গ্রামে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র—বিবিধ লোকের বাস। কোদালে অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও, ইহাতে সকলপ্রকার অবস্থাপন্ন লোক দেখা যায়। এই গ্রামে বঙ্কেশ্বর মিত্রের বসতি। মিত্রজের পূর্ব্বপুরুষগণ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন। গাড়ী

বাড়ী, উদ্যানপ্রভৃতি ধনাঢ্যতার পরিচায়ক! উক্ত মিত্র-বংশে সে সব গৌরবই ছিল, কিন্তু তিনি লেখা-পড়ায় অনুরাগী ছিলেন না। ধনশালীর সন্তানগণ, বাল্যে যেরূপ বিলাসভোগী হইয়া পড়ে,বক্কেশ্বরের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল! তিনি পৈতৃক বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াও নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা-দোষে পিতৃ-ধনে বঞ্চিত!

সংসারে একপ্রকার জীব আছে, যাহারা ধনাঢ্যবর্গের মনস্তুষ্টিই সার জানিয়া অনুক্ষণ তাহাতেই নিযুক্ত। ধনশালীর প্রীতিকরকার্য্যসম্পাদনে তাহাদের হিতাহিত বিচারের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। তাহারা যে ব্যক্তির চাটুকারিতার অনুরাগী, তাঁহার ইচ্ছানুসারে, ন্যায়ান্যায়—সত্যাসত্যের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, বাবু যাহা বলেন, তাহারই পোষকতা করে! বক্কেশ্বরের অল্প বয়সেই এইরূপ অনুচর ও সহচর জুটিয়াছিল; তাহারা স্বার্থের উদ্দেশেই এইরূপ করিতেছে, বাবু কিন্তু তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই। পিতার একমাত্র পুত্র, যৌবনের প্রারম্ভেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া উক্ত সহচরদিগের পরামর্শানুসারে মাদকসেবনে আসক্ত হইলেন। অদৃষ্টচক্র, সকলকে সমভাবে চালিত হইতে দেয় না, ভগবান্ যে নিয়তিচক্র, মনুষ্যের উপর বিধান করিয়াছেন,তাহার কঠোর হস্ত হইতে কাহার পরিত্রাণ আছে? পিতা, পিতৃব্য, গুরুজনগণ একে একে সকলেই পরলোকগত হইলেন। বক্কেশ্বরই, সংসারের কর্ত্তা হইলেন। পিতামাতা, সামাজিক নিয়মানুসারে সন্তানের বিবাহ দিতে বাধ্য। বিশেষতঃ গুরুজন দ্বারা এ কার্য্য, বিশেষ আগ্রহের সহিত সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য—বক্কেশ্বরের পরিণয়-কার্য্য পূর্ব্বেই সমাধা হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি এক তনয়ারত্ন লাভ করিয়াছেন। পাঠক! এই বালিকার নাম রাধামতি। ইনিই আমাদের নায়িকা। প্রখর জ্যৈষ্ঠের দ্বিপ্রহরে যে বালিকা, অভ্যাগত ব্রাহ্মণের আতিথ্যসৎকারে বিমুখ হইয়াছিল, সেই—এই রাধামতি।

মানুষের যখন অবস্থার অবনতি হইতে থাকে, সে সময়ে সকলই প্রতি-কূল। বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় ক্রমাগতই মতিগতি সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে! যে বক্কেশ্বর, স্নেহময়ী জননীর একমাত্র নয়নপুত্তলী, পিতার প্রিয়তম বংশধর, সহচর-বৃন্দের আশ্রয়স্থল,—ভাগ্যদোষে সেই অভাগ্য, কু-সংসর্গে স্বল্প দিনে তাঁহারি যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিলেন। তিনি মাদকসেবা, বেশ্যাগমনাদি গর্হিত কার্য্যে আসক্ত হইবার সূত্রপাতেই, স্বীয় জনকজননী রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, সময়ে তাঁহারা উভয়েই কালগ্রাসে পতিত! যাঁহাদের লক্ষ্মী, তাঁহাদের সঙ্গেই চলিয়া গেলেন; বক্কেশ্বর প্রায় প্রতি দিন ঋণজালে জড়িত হইয়া নিঃস্ব হইতে বসিলেন।

অবস্থার বৈষম্যে বক্কেশ্বরের চৈতন্য হইল না, কুৎসিত ও গর্হিত কার্য্যে এখনও তাঁহার অনুরাগ। আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত হইলে, লোকের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি থাকে কি? অলীক সুখসম্ভোগে সংসারের প্রিয় পরি-জনবর্গের প্রতি যত্নের হ্রাসবশতঃ লোককে সর্ব্বদা অভিপ্রেত বিষয়েই সংযত থাকিতে হয়। সংসার কি ভাবে চলিতেছে, পরিবারের কোন অভাব হইতেছে কি না, বক্কেশ্বর সে দৃষ্টি হারাইলেন; তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আমোদ-প্রমোদকে সংসারের সার জানিয়া, তাহাতেই বিহ্বল। লক্ষ্মীর চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহস্থের গৃহে বিবিধ বিঘ্নের সূত্রপাত হয়। পিতৃ-মাতৃহীন বক্কেশ্বর, বিষয়সম্পত্তি নষ্ট করিয়া দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন, এই দুঃসময়ে জনৈক আত্মীয়ের কর্ম্মের জন্য তিনি কোন মহা-জনের নিকট জামিন-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন, কিছুদিন পরে উক্ত ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা-অপরাধে তাঁহাকে চারি পাঁচ সহস্র টাকার দায়ী হইয়া ক্ষতি পূরণ করিতে হইল। দুঃখের দশায় সহসা এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহার আর দুঃখের সীমা রহিল না। বিষয়সম্পত্তি ইতঃপূর্ব্বেই প্রায় শেষ হইয়া-ছিল, এক্ষণে অকস্মাৎ এরূপ দেনায় তাঁহাকে ভদ্রাসনবাটীখানিও হস্তান্তরিত

করিতে হইল! একে নিঃস্ব, তাহাতে মূর্খ—কোন বিষয়কর্ম্ম জুটাইয়া নিজের ও পরিজনগণের প্রতিপালন করিবেন, সে সুবিধাও তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না, তদুপরি অবিবাহিতা দুহিতা! আজকাল ব্রাহ্মণকায়স্থের গৃহে কন্যা পাত্রস্থ করিতে হইলে অগণ্যপ্রায় অর্থের প্রয়োজন। বক্কেশ্বরের এক্ষণে যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ হওয়াই দুরূহ. কিরূপে তিনি এই গুরুতর কন্যাদায় নির্ব্বাহ করিবেন—মনে মনে সেই আন্দোলন করিয়া সমধিক চিন্তিত হইলেন।

অর্থকৃচ্ছ্রতায় দিবারাত্রি দুঃখেই অতিবাহিত হয়। বক্কেশ্বর ঈদৃশ বিপন্ন হইয়াও নিজের অবস্থা নিজেই বুঝিতে অসমর্থ; ঘৃণিত প্রবৃত্তিবশে তাঁহার যে, এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা তিনি তখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রিয়ভোগ-লালসায় বক্কেশ্বর এরূপ উন্মত্ত যে, সংসারের প্রতি না তাকাইয়া আমোদপ্রমোদেই কালক্ষেপ করিতে ব্যাকুল। দাসদাসীগণ বেতন না পাইয়া একে একে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; কেবলমাত্র বহুদিনের পরিচারিকা এক বৃদ্ধা বিনা বেতনেও বক্কেশ্বরের গৃহকার্য্যে তখনও নিযুক্ত! যে চাটুকারেরা সুখের দিনে পরিবেষ্টিত থাকিয়া মহানন্দে কালক্ষেপ করিত, বক্কেশ্বরের এই দুরবস্থায় আর কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও করে না; এমন কি, পথে ঘাটে ঘটনাক্রমে কাহারও সাক্ষাৎ হইলে, বক্কেশ্বরের প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়াই, সে চলিয়া যায়। বিলাস-ভোগে, আমোদপ্রমোদে বক্কেশ্বরের বাল্য-জীবন অতিবাহিত, যৌবনেও তাঁহার সে সুখসম্ভোগে ত্রুটি হয় নাই; সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহে পরিণামে তাঁহার যে এরূপ যাতনা হইবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি ধনীর পুত্র, বিষয়-কর্ম্মের ভার নিজহস্তে কখন গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং পরিবারের ভরণপোষণ জন্য অন্যের গলগ্রহ হওয়াও তাঁহার পক্ষে দুষ্কর। এক দিন বক্কেশ্বর, কার্য্যের সন্ধানে এক ভদ্রলোকের

বাটীতে গেলেন, বহু সাধ্যসাধনায় একটী কাজ জুটিল; কিন্তু কর্ম্মক্ষম না হওয়াতে তাঁহাকে সত্বরই পদচ্যুত হইতে হইল। দাসত্ব-জীবনে ধিক্কার দিয়া অগত্যা বক্কেশ্বর মলিনবদনে গৃহে ফিরিলেন। গৃহিনী—পতিপ্রাণা; নাম—কমলিনী। তিনি পতির বিষণ্ণমূর্ত্তিদর্শনে মনে মনে ক্ষুণ্ণা হইলেন। মনোভাব জিজ্ঞাসায় স্বামীর মনোবেদনার সম্ভাবনা; সুতরাং তিনি কোন কথার উত্থাপনেই সাহসিনী হইলেন না।

জগদীশ্বর, জীবের আহারদাতা। সেই প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে অনাহারে কেহই থাকে না। মনুষ্য শ্রেষ্ঠজীব। সেই শ্রেষ্ঠ প্রাণী, অনাহারে দিনাতিপাত করিবে, সেই মঙ্গলময়ের এমন বিধান নহে। বক্কেশ্বরের সহধর্ম্মিণী, অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া, পতির প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষায় ছিলেন; তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সত্বর স্নানাদির উদ্‌যোগ করিয়া দিলেন।

মাদকের দাস উদ্ধতস্বভাব বক্কেশ্বর, বিষয়-সম্পত্তি-বঞ্চিত হইয়াও অভ্যাসবশতঃ তখনও তাহাতে অনুরক্ত। এদিকে গৃহে অর্থের অভাব নিমিত্ত দুই বেলা আহারসংগ্রহ করা ভার, অন্য পক্ষে বাল্যকাল হইতে কুসংসর্গে তিনি যে কদাচারে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাহা ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবে কি? আমোদ-আহ্লাদে দিনাতিপাতে কত উপসর্গ জুটে, সেই উত্তাল প্রবাহ-স্রোতে দেহ ভাসাইয়া যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত, কোথায় সে যাইতেছে—কিছুই চাহিয়া দেখে না, পরিণামে তাহাকে কতই ক্লেশে কালাতিপাত করিতে হয়। বক্কেশ্বরের অদৃষ্টে এক্ষণে সেই অবস্থাই ঘটিয়াছে। যৌবনকালে অসৎপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইতে থাকে। যে ব্যক্তি তরুণ বয়সে সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর, তাঁহার চিরকালই সমভাবে যাপিত হয়। বক্কেশ্বর যৌবনে বন্ধুবান্ধব-পরিবৃত হইয়া সুরাদেবীর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; প্রচুর অর্থের সংস্থানপ্রযুক্ত কোন অভাবই তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় নাই; এক্ষণে তাঁহার আর সে দিন

নাই! উৎকট মদ্যপানাদি অসদ্ব্যয়নির্ব্বাহে অনন্যোপায় হইয়া, পরিমিত ব্যয়ে—গঞ্জিকাসেবনে ব্রতী হইয়াছেন! তাহাতেও দৈনিক কিছু খরচ আছে। পরিজন-গণ, অনাহারে দিনযাপন করিতেছে, নিজেরও আহার জুটিতেছে না; তথাচ তাঁহাকে সেই মাদকদ্রব্যসেবন করিতেই হইবে। অর্থাভাবজনিত যথেষ্ট কষ্টে তখনও তাঁহার চৈতন্য নাই! গৃহে আসিয়া সংসারের ভাবনা-চিন্তা দূরে গেল; বক্কেশ্বর, গঞ্জিকাসেবনে ব্যস্ত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সময় কাহারও মুখাপেক্ষী নহে; যথানিয়মে আসিতেছে ও চলিয়া যাই-তেছে। রজনী-প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বগগনে দিনমণি, উজ্জ্বল কিরণ-মালায় ভূষিত হইলেন। সংসারী, সংসারকার্য্যে নিয়োজিত হইল। প্রভা-তের পর মধ্যাহ্ন, পরে অপরাহ্ণ। রবি-ছবি, আকাশপথে পূর্ব্ব দিক্ হইতে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া অস্তাচলে বিলীন হইলেন। দিবার উজ্জ্বল আলোকরাশি, তপনদেবের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। অন্ধকারে জগৎ আবৃত হইল। পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু, দিবাভাগে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া নিরাপদ্ হইয়া রাত্রিযাপনজন্য প্রাণিজগতের নির্দ্দিষ্ট-স্থানে আসিল। রজনীর অন্ধকারে সুযোগ বুঝিয়া নিশাচরেরা, সানন্দ মনে আহার অন্বেষণে বহির্গত হইল। প্রকৃতির গতি পরিবর্ত্তনময়ী—দিবার পর রজনী! রজনীর পর দিন!

মনুষ্যজীবনে জন্ম ও মৃত্যু এই দুইটী ধারাবাহিক নিয়ম নির্দ্দিষ্ট। কাল-চক্রে সময়ের অন্তরালে সকল কার্য্যই সাধিত হয়। মুহূর্ত্ত হইতে দণ্ড, দণ্ড হইতে প্রহর, প্রহর হইতে দিবা যেরূপে পরিণত হয়, সেইরূপে সংসারে মনুষ্য-জীবনে এই দুইটী বিচিত্র পরিবর্ত্তন। শিশুকাল আমোদপ্রমোদে কাটিয়া যায়, পরে যৌবনের সমাগম,—যৌবন, জীবনের সন্ধিস্থান। এই

যৌবনেই লোকে সাধের সংসার পাতিয়া সুখস্বচ্ছন্দে দিনাতিপাতের উপায় অন্বেষণে নিযুক্ত থাকে। যে ব্যক্তি সংসারী, এই অদ্ভুত পথ-পর্য্যটনে তাহাকে বিশেষ সাবধানতায় প্রতিকার্য্যে লক্ষ্য রাখিয়া, অগ্রসর হইতে হয়; পরে বার্দ্ধক্য। এই বার্দ্ধক্যে এক কালে শৈশবের ঘটনাবলী বিপরীত পর্য্যায়ে সংঘটিত হইতে থাকে। এক সময়ে যে ব্যক্তি প্রবল-প্রতাপে অপরের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, বৃদ্ধাবস্থায় আর তাহার সে শক্তি থাকে কৈ! যৌবনে যেরূপ মনোবৃত্তির প্রাবল্য লক্ষিত হইয়া থাকে, অন্য সময়ে কদাচ সে ভাব দৃষ্ট হয় না। সংসারীর ক্রিয়াকলাপ, যৌবনের গর্ব্বে প্রচ্ছন্ন; বাল্যকালে বুদ্ধিশক্তির সঞ্চার হয় না, বৃদ্ধকালে তৎসমুদায়ই হীনবল—নিষ্প্রভ। এক্ষণে বক্কেশ্বর, যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কাজকর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে; সংসারত্যাগের দিন সন্নিকট জানিয়া বিষয়ভোগলালসা, ক্রমে ক্রমে তাঁহার মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছে।

আজকাল হিন্দুসমাজে তনয়ার পরিণয় পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার। যাঁহার অর্থ আছে, তাঁহার কন্যার বিবাহজন্য চিন্তা কি? কিন্তু দরিদ্র পিতামাতা, কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার দিবস হইতেই উৎকণ্ঠিত ভাবে কালক্ষেপ করিতে থাকেন। আমাদের দেশাচারে দশ বৎসরের অধিকবয়স্কা কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিলে, পিতা ভ্রাতা-প্রভৃতিকে নিরয়গামী হইতে হয়। বক্কেশ্বরের বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে একেই তাঁহাকে অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার উপর ন্যূনাধিক সহস্র মুদ্রার সংগ্রহ না করিলে, কন্যার বিবাহ-ক্রিয়া সমাধা হইবে না, এই ভাবনাতেই তাঁহার জীবন বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। রাধামতি এক্ষণে দশমবর্ষীয়া। কন্যার বিবাহ না দেওয়া সমাজের চক্ষে আর ভাল দেখায় না এই ভাবিয়া, স্ত্রীপুরুষে ক্ষুণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতেছেন।

অনাথের দৈবসখা। লোকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া উদ্ধার পাইবার আশায় যিনি যতই কেন চেষ্টা করুন না, জগদীশ্বরের অনুগ্রহ-দৃষ্টি তাঁহার প্রতি না পড়িলে, সেই আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধারের উপায় কোথায়! সুখদুঃখ, জীবের কর্ম্মফল হইলেও, ঈশ্বরকৃপাব্যতিরেকে কেহ সেই বিপত্তি হইতে মুক্তি পাইতে পারে কি? বক্কেশ্বর বিষণ্ণ বদনে অহোরাত্র পুত্রীর বিবাহসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অবশেষে দুই চারি জন আত্মীয়স্বজনের সাহায্য-গ্রহণে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা কিছুই সুবিধা হইল না; অধিকন্তু তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতাজন্য ভৎ‌সনা লাভও ঘটিল; মিত্রজ কি করিবেন, কাহাকে জানাইলে তাঁহার উপকার হইতে পারে, এইরূপ ভাবনা-চিন্তায় তিনি এক কালে হতবুদ্ধি।

বক্কেশ্বরের জনৈক প্রাতিবেশী সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া, স্বয়ং সেই উদ্বাহের তাবৎ ব্যয়বহনে স্বীকৃত হইলেন; তিনি পাত্রের অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। মিত্রজ, প্রাতিবেশীর এরূপ উদার প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া, মনে মনে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন; ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গলকামনা করিলেন। লোকে কেহ দুরবস্থাগ্রস্ত হইলে সত্যব্যাপারেও অনেক সময়ে সন্দিগ্ধ হয়। বক্কেশ্বরের পক্ষে তাহাই দাঁড়াইল। এক সময়ে যাঁহারা বক্কেশ্বরের আদেশমাত্র কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াও তাঁহার কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। জনৈক কুলাচার্য্যের নিকট বক্কেশ্বর বার বার যাতায়াত করায় সে ব্যক্তি, কোন্নগরনিবাসী বসু-পরিবারভুক্ত চন্দ্রনাথ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র ফণীন্দ্রনাথের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিল। হিন্দুপ্রথানুসারে পাত্রপাত্রীর পিতা বা গুরুস্থানীয় অন্য আত্মীয়-স্বজন উভয় পক্ষে দেখা শোনা করিয়া থাকেন, একারণ চন্দ্রনাথ বাবু জনৈক বন্ধুকে লইয়া বক্কেশ্বরের কন্যা দেখিতে আসিলেন। বক্কেশ্বরের অবস্থা হীন হইলেও তিনি সম্ভ্রান্তবংশ-সম্ভূত; সমাগত ভদ্রলোকদ্বয়ের আদর

অভ্যর্থনার কোন অংশে ত্রুটি হইল না। রাধামতি তাঁহাদিগের সমক্ষে আনীত হইল। রাধামতি রূপবতী। বর্ণ, প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায়, মুখমণ্ডল প্রফুল্ল; কিন্তু নাসিকা ও নয়নযুগলে সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিৎ যেন অভাব। এক কথায় কুমারীর অঙ্গসৌষ্ঠব তাদৃশ মন্দ নয়। পাত্রের পিতা সেই বালিকাকেই পুত্রবধূ করিতে মনন করিলেন; একটী স্বর্ণমুদ্রা দিয়া পাত্রীর আশীর্ব্বাদ হইল। রাধামতিকে দেখিয়াই তাহাকে পুত্রবধূ করিবেন, এই ধারণায় চন্দ্রনাথের মনে যেন কি অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল! তিনি এক কথায় পাত্রী মনোনীত করিলেন, পরে বন্ধুসঙ্গে সে বাটীতে জলযোগাদি করিয়া বিদায় লইলেন। ফণীন্দ্রনাথের পিতা আগামী মাসে শুভকার্য্য সম্পাদন করিবেন, স্থির করিলেন; এজন্য দুই চারি দিবসের মধ্যেই বক্কেশ্বরকে পাত্র দেখিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ হইল।

বক্কেশ্বর, পুত্রীর বিবাহকারণে এতাবৎকাল উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালক্ষেপণ করিতেছিলেন, সে কার্য্য সত্বর সুসম্পন্ন হইবে স্থির জানিয়া, তিনি মনে মনে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। বিবাহের সমস্তভারগ্রহণে প্রতিশ্রুত দ্বারকানাথ সহ মিত্রজ, পাত্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে ভদ্রোচিত আদর আপ্যায়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফণীন্দ্রনাথ তথায় আসিলেন; ফণীন্দ্রনাথ মধ্য-বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষায় বৃত্তির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বিনাব্যয়ে হিন্দুস্কুলে পড়িয়া গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন। ফণীন্দ্রনাথ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, মিষ্টভাষী, শিষ্ট ও নম্রপ্রকৃতি। বক্কেশ্বর তাঁহাকে লেখাপড়া-সম্বন্ধে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বক্কেশ্বর, বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া, পাত্রদর্শনীস্বরূপ দুইটী সুবর্ণমুদ্রা ফণীন্দ্রকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ফণীন্দ্রনাথ, বক্কেশ্বর ও দ্বারকানাথকে প্রণাম করিয়া, তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। এই

বিবাহে উভয় পক্ষেরই মতামত স্থির হইল। তদ্দণ্ডেই দিন স্থির করিয়া লগ্ন-পত্র লিখিত হইল।

দ্বারকানাথ, বাটীতে ফিরিয়াই বক্কেশ্বরকে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্র সমস্ত সরবরাহ হইতে লাগিল, পল্লীস্থ দুই চারিজন বিজ্ঞ লোকের সহানুভূতিতে এই বিবাহের উদ্যোগাদি হইতে লাগিল। যথাদিনে যথানিয়মে শুভ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

রাধামতি, পিত্রালয় হইতে ভর্ত্তৃগৃহে নীতা হইল। পাঠক! আমরা বলিয়াছি, ফণীন্দ্রনাথ নিরীহ, শান্ত, সুশীল যুবক। তাঁহার নিকট রাধা-মতির অনাদর হইবার সম্ভাবনা আছে কি? ফণীন্দ্র এখনও বিদ্যার্থী, ক্রমে বয়ঃ-চিত্ত প্রণয়াবেগ, সে হৃদয়ে বিকাশ পাইয়াছে। আনন্দে পুষ্প-শয্যা অতিবাহিত হইল। রাধামতি, পিতৃগৃহে পুনরাগমন করিলেন। বিবাহের পর ফণীন্দ্রনাথ, পত্নীকে সুশিক্ষিতা করিতে একান্ত অভিলাষী হইলেন, সেই হেতুই রাধামতির পিত্রালয়ে আসিবার কালে, তিনি একখানি বর্ণ পরিচয়ের ১ম ভাগ, সুচারুরূপে বাঁধাইয়া দিলেন। রাধামতি এত কাল চঞ্চলভাবেই কালক্ষেপ করিয়াছে, সংসারের কোন দিকেই তাহার লক্ষ্য ছিল না, পতি-প্রদত্ত পুস্তিকাখানি সে, পুতুলের বাক্সমধ্যে রাখিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পশ্চিম আকাশে আরক্তিম-বিভা। আতপ-তাপ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ-ভাবাপন্ন, তপনদেব অস্তাচলাভিমুখী, বৃক্ষলতাদির পত্রসমূহে স্থানে স্থানে ক্ষীণ রবির ক্ষীণ কিরণমাত্র এক এক বার খেলিতেছে। মধ্যাহ্নের প্রখর প্রতাপ আর নাই, মধ্যে মধ্যে শীতল সমীর-হিল্লোলে নব-প্রস্ফুটিত কুসুম-দামের সুগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে। সূর্য্যদেব, পশ্চিম গগনে লুপ্তপ্রায়। দিন-

মণির আদরিণী দিবারাণী পতিবিরহে ম্লান বদনে মলিন বিষন্ন বেশে ভূষিতা। সংসারে কাহারও উন্নতি, কাহারও অবনতি। যে, যখন উন্নতিপথে অগ্রসর হয়, তৎকালে তাহার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? কিন্তু কালক্রমে সেই ব্যক্তির অদৃষ্টে দুঃখ ঘটিলে, তাহার অবনতি অনিবার্য্য। কমলিনী-কান্ত অস্ত গত, প্রকৃতিসুন্দরীর বর বপুঃ তিমিরবাসে আবৃতা। তারকানিকরবেষ্টিত শশাঙ্ক, গগনমণ্ডলে বিকাশ পাইলেন, দিবাশ্রমান্তে গৃহী জন নিজ নিজ আবাসে ফিরিল। পশু-পক্ষি-কুল ক্ষুধায় আহারান্বেষণে এতক্ষণ এখানে ওখানে আকুল ছিল, এখন তাহারাও আপন আপন যামিনী যাপনস্থলে আসিল। বিরামদায়িনী, শান্তিময়ী নিদ্রার ক্রোড়ে সকলেই বিশ্রাম করিল।

রাধামতির পরিণয়-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে যে বালিকাকে ধূলাখেলা করিতে দেখিয়াছি, যাহার চঞ্চল অথচ সরলস্বভাব দেখিয়া দর্শকের মনে বাৎসল্যভাবের উদ্রেক করিয়াছে, আজি তাহার প্রতি সহসা চাহিলে, লোকে লজ্জায় অধোমুখ হয়। ইহ সংসারে রমণীই মোহিনী।

এই মোহিনীর কি মোহিনী শক্তি! জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে রমণী, সর্ব্ব-মূল-স্বরূপিণী। আদ্যাশক্তির শক্তিবিকাশে যখন দেবদেব স্বয়ম্ভু স্বয়ংই বশীভূত হইয়াছিলেন, তখন এ মর সংসারে সে ভাবের ভাবান্তর হইবে কেন? পুরুষ, প্রকৃতি ছাড়িয়া থাকিতে পারে কি? প্রকৃতি, পৃথিবীতে সুখদুঃখের প্রসূতি? প্রিয়পরিজনসঙ্গে মিলিত হইয়া আনন্দে দিন যাপন হয় প্রকৃতিই তাহার মূল ভিত্তি। পুরুষ, শ্রমোপার্জ্জিত অর্থে সংসারের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু প্রকৃতি হইতে গৃহধর্ম্ম রক্ষিত হয়। যে সংসারে রমণীর অভাব, সে সংসার দুঃখ ও অশান্তির আলয়। কামিনী কোমলপ্রকৃতি; কাঠিন্যভাবে যদি অহোরাত্র অতিবাহিত হয়, তাহাতে আর সুখ কোথায়? তাই পার্থিব সুখের রমণীই আকর। অন্য পক্ষে রমণী, বিপদের মূলস্বরূপিণী, নারীপ্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া লোকের কত শত সর্ব্বনাশই

না ঘটে! পরিণামের প্রতি না চাহিয়া, কত যে অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তাহার নির্ণয় নাই! চিত্তে যখন যাহা উদয় হয়, অবিমৃষ্যকারিতাদোষে তৎসাধনে অগ্রসর হইয়া, ভূত ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া আপাতমনোরম আনন্দভোগ করিয়া পরিণামে অনন্ত বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হয়। রাধামতি এক্ষণে বালিকা নহে, যৌবনোচিত লক্ষণ তাঁহার শরীরে বিরাজিত; প্রণয়মাধুরীর মোহিনী মূর্ত্তি সে সরলহৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাসিত। কিরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইলে স্বামীর মন মুগ্ধ হইবে, এই চিন্তাই এক্ষণে যুবতীর জল্পনা কল্পনা। কামিনী, বক্কেশ্বরের বহু কালের পরিচারিকা, এখনও বৃদ্ধা দাসীবৃত্তিতে নিযুক্তা; রাধামতির বাল্যে কামিনী, তাহাকে কন্যাভাবে লালন-পালন করিয়াছিল, বিবাহোৎসবেও কামিনী, রাধামতির সঙ্গে তাহার শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল। বাল্যকালাবধি কামিনী, রাধামতিকে পালন করিত বলিয়া, তাহার প্রতি সে একান্ত অনুরক্তা, রাধামতির মনে কোন ভাবের উদয় হইলে, সে কামিনীকে তাহা জানাইত; অধিক কি—কন্যা, মাতৃসমীপে যে সকল কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিতা হইত, অকপটচিত্তে তৎসমুদায় সে সেই বৃদ্ধাকে জানাইত। অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককালব্যাপী শীতগ্রীষ্ম কামিনীর মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেলেও, তাহার চপল-স্বভাবের কোন বৈলক্ষণ্য হইত কি? সে, সাংসারিক কর্ম্মে বিশেষ পারদর্শিনী। বহুকালাবধি একইপ্রভুর কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, এই নিমিত্ত এক্ষণে সে বক্কেশ্বরের সংসারে গৃহিণী স্থানীয়া; সমস্ত বিষয়কার্য্যেই বক্কেশ্বর তাহার পরামর্শ প্রার্থী। যদি তাহার অজ্ঞাতসারে কোন কার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহা হইলে বৃদ্ধার দুঃখের সীমা থাকিত না। কাহারও বাটীতে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইলে, কামিনী তথায় কর্ত্তৃত্ব করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে স্বভাবের সহজে পরিবর্ত্তন হয় না! এই কারণে কামিনী, বয়সে প্রবীণা হইলেও, চপলতা হেতু যুবতীরা যেরূপ হিতাহিত-বিবেচনা-রহিত

হইয়া মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তাহারই পূরণে তাহারা যত্নবতী। কামিনীও, পরিণামে মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না রাখিয়া, তৎসাধনে অগ্রসর হইত।

স্ত্রীজাতি কোমলপ্রকৃতি। জগদীশ্বর, রমণীকে এই কমনীয় ধাতুতে গঠিত করিয়াছেন, এই কারণে পুরুষের কঠোরতার লাঘব সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে পথে ঘাটে দেখিতে পাওয়া যায়—পক্কেশ, দন্ত-বিহীন স্থবির নবীন যুবকের মত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া সময়ে সময়ে বিহার করে। ইহার কারণ—বাল্যাবধি সে, এই ভাবেই কাটাইয়াছে, বিলাসভোগকেই সে তাহার জীবনের সার জানিয়াছে। লোকের নিন্দাভাজন হইতে হইবে বা তজ্জন্য কোন কথা সহ্য করিতে হইবে, একবারও সে তাহা ভাবিয়া দেখে না। যে অকৃতী পুরুষ আপনার বেশভূষা বা বিলাসভোগ লইয়াই ব্যস্ত, এই সংসার অচিরে ত্যাগ করিতে হইবে এবং পরলোকে ইহজীবনের কার্য্যাদি যে সম্যক্ সমালোচিত হইবে, একবার সে চিন্তা তাহার হৃদয়ে আবির্ভাব হয় না। পুরুষের গর্হিত কার্য্য জনসমাজে ব্যক্ত হইলেও, তাহাকে নিন্দনীয় হইতে হয় না। যাহারা তাহার প্রতি উপহাসনেত্রে দৃষ্টিপাত করিল, সে তাহাদেরই নিন্দাভাজন হইল; কিন্তু তাহাতে সমাজে তাহার অনিষ্ট হয় কি? স্ত্রীলোকের চরিত্র ক্ষণভঙ্গুর কাচখণ্ডসম! একবার কলঙ্করেখাপাত হইলে, সে অপবাদ, জীবনে ঘুচিবার নয়। যে রমণী, কুল-শীলে জলাঞ্জলি দিয়া কুপথগামিনী হইয়াছে, তাহাকে আজীবন বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন থাকিতে হয়। সংসারে মনের সুখই পরম সুখ। যাহাকে নিত্য নব ভাবে নবীন উপপতির মনস্তুষ্টি করিবার জন্য সংযত থাকিতে হয়, সে স্ত্রীলোকের মনের শান্তি কোথায়? বক্কেশ্বরের পরিচারিকা কামি-নীর চরিত্র, দূষিত ছিল। শোনা যায়, যৌবনে কোন লোকের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সে গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত ছিল, তাহাতে যথাসর্ব্বস্বে বঞ্চিতা হইয়া

এক্ষণে সে পরের গৃহে দাসী। অভাগীর যৌবন ঘুচিয়া এখন তাঁহার বাৰ্দ্ধক্য উপস্থিত। কালবৈষম্যে বৃদ্ধবেশ্যা এক্ষণে তপস্বিনী! তথাপি তাহার চরিত্রের দোষ ঘুচে নাই। কামিনী, বয়োধিকা হইলেও আমোদপ্রমোদে রসরঙ্গের কথায় সৰ্ব্বাগ্রণী।

রাধামতির ভাইভগিনী কেহই নাই। সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত একত্র কালযাপন করিতে তরুণ বয়সে সকল বালিকারই ইচ্ছা। রাধামতি অবিবাহিতাবস্থায় পল্লীস্থিত বালিকাগণের সহিত খেলা করিত। হিন্দুরমণী, কপালে সিন্দূরবিন্দু ধারণ করিলেই অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার আর তাহার উপায় থাকে না। রাধামতি এক্ষণে যুবতী। যে সকল বালিকার সহিত তাহার সখীত্ব ছিল, তাহারা শ্বশুরালয়ে পতি-অঙ্কশোভিনী হইয়াছে, পরস্পরের পূর্ব্বের মত দেখাসাক্ষাৎ আর ঘটে না; দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইলে মঙ্গলামঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসামাত্র হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সঙ্গদোষে লোকের চরিত্র কলুষিত হয়। কোন ব্যক্তির স্বভাব ভাল হইলেও অসৎসহবাসে নিয়ত তাহার স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটে; সংসারে ভালমন্দের যে তারতম্য হয়, একমাত্র সঙ্গীই অনেক স্থলে তাহার প্রধান কারণ। পিতামাতার কৃপায় সংসারে জন্মগ্রহণ, তাঁহাদিগের স্নেহবাৎসল্যে লালিত, পালিত ও বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রত্যহ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে কিন্তু বিচলিত হইতে হয়। সেই উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত ভাবে একমাত্র প্রিয়বন্ধু হইতে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। অনেক সময়ে সংসার-ভাবের বিকাশ জনক-জননীর নিকট গোপন রাখিয়াও বন্ধুর নিকট সেই মনোভাব অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যক্ত হয়। যাহাকে বন্ধু বলিয়া

সম্বোধন করিয়াছি, আত্মপর যাহার সহিত কোন প্রভেদ রাখি নাই, সময়ে সেই ব্যক্তির অনুরাগে আমার জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। দৃঢ় বিশ্বাসে যাহার প্রতি প্রাণ-মন, সমর্পিত হইল, নিশ্চিতই তাহার নিকট সরল-ভাবে সকল কথা ব্যক্ত হইয়া যায়। কিন্তু, মৌখিক সারল্য দেখাইয়া, যদি কেহ, অন্তরে কপট ব্যবহার করে—সে, বিষধরোদ্গীর্ণ কালকূট হইতে নিস্তার কোথায়? সাধারণতঃ—লোকে, নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য এবংবিধ কষ্ট ভোগ করে।

রাধামতি সরলা; কিন্তু—কিঞ্চিৎচপলস্বভাবা। শৈশবচরিত্রে লক্ষ্য রাখিয়া, বার্দ্ধক্যে তাহার কি মতিগতি হইবে, তাহা সহজে সম্যগ্রূপ বোঝা যায় না। মাতার আদরসোহাগ, পিতার স্নেহযত্ন, সকল বালকবালিকারই তৃপ্তিসাধক—শান্তিদায়ক। যতই সংসার-পথে লোককে অগ্রসর হইতে হয়, ততই লোকচরিত্রদর্শনে তদনুযায়ী হইতে, লোকের প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়। রাধামতি, যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিয়াছেন। যুবতীর হৃদয়-গতি, তখনও অপেক্ষাকৃত বলবতী। সহচরী 'কামিনীর' সংসর্গে তাহার সকল ভাবের বিকাশ পাইতেছে। অন্য পক্ষে রাধামতির সংসার-শিক্ষার ভিত্তিই—'কামিনী'। কামিনী তাহাকে যে দিকে ফেরায়—রাধামতিও, সেই দিকে ফেরে। তৎসম্বন্ধে যুবতী, অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া দেখে না। রাধামতি—যুবতী; কামিনী—বৃদ্ধা। কামিনী, সংসারের আদ্যোপান্ত দেখিয়া শুনিয়া, বিশেষ বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। বৃদ্ধা, যুবতীর সহিত সরল ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় সতর্ক থাকে। অথচ রাধামতির মনস্তুষ্টি করিতে, তাহার কোন ত্রুটিই ঘটে না। অন্দরমহলের ছাদে উঠিয়া, তাহাদের নানা-বিধ কথাবার্ত্তা হয়। কখনও বা আকাশের চন্দ্রমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহার কলঙ্ক লইয়া, কত কথাই উঠে। পরক্ষণে চন্দ্রমা-দেবের বিমলকিরণ-মালার সহিত নক্ষত্রাবলীর কর-নিকরের তুলনা করিয়া, উহারা নিন্দাবাদ

করিতে থাকে ; অথবা গুল্মলতাদিতে জড়িত খদ্যোতপুঞ্জের ক্ষীণালোক-প্রকাশে ফণীর মণি সিদ্ধান্ত করিয়া লয় ; এইরূপ কত শত ভাবের কথায় তাহারা ভাবনা-স্রোতে ভাসিতে থাকে ! কোন দিন এমন সময়ে কামিনী, যেন কোন সঙ্কেতানুসারে সহসা স্তম্ভিত হইল ! ধাত্রীর এরূপ ভাব দেখিয়া, রাধামতি, উৎসুক চিত্তে তাহার মুখের প্রতি চাহিল। কিছুক্ষণ উভয়ের মুখ হইতে, একটীও কথা, নিঃসৃত হইল না। পরস্পরমৌনভাবধারণের অনতিবিলম্বে দাসীর মুখে হাস্যের বিকাশ হইল। তাহা লক্ষ্য করিয়া, যুবতী, সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তদুত্তরে কামিনী, রাধামতির কানে কানে যেন কি দুই একটা কথা বলিল। যুবতীর সহিত বৃদ্ধার কথাবার্ত্তায় অনুমান হইল, যে ব্যক্তির আনুকূল্যে মিত্রজাত্মজার বিবাহেছিসব সাধিত হইয়াছে, তাহারই পরিচিত কোন লোকের সম্বন্ধে যেন কথা হইল। উভয়ে, দ্বারকানাথের বাটীর দিকে অনেক ক্ষণ চাহিয়াছিল, এবং সেই দিকে দুই এক বার অঙ্গুলি নির্দ্দেশও করিয়াছিল। রাত্রির অন্ধকারে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান না হইলেও, সেই ছাদের উপরে যেন কে একটা লোক বেড়াইতেছিল। সে, মধ্যে মধ্যে দুই এক ছত্র কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল। রাধামতি, কামিনী-সঙ্গে ছাদে অনেক ক্ষণ চিন্তাকুলচিত্তে দাড়াইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পরে ধাত্রীর সহিত নিম্নতলে নামিয়া আসিল। তখনও উভয়ে গোপনে আলাপ করিলেন। কিন্তু, কি যে কথাবার্ত্তা হইল—কিছুই বোঝা গেল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রায় মহাশয়ের সহিত বঙ্কেশ্বরের বিশেষ সখ্য। একের সহিত অপরের আলাপ-পরিচয়ে সংসারধর্ম্মে যে উপকার দর্শে, সময়ে আত্মীয়স্বজন দ্বারাও তাহা সাধিত হয় না। বন্ধুর সদৃশ প্রিয় ব্যক্তি, জগতে আর দ্বিতীয়

কে? সূর্য্য-হীন জগতের সহিত বন্ধুহীন মনুষ্য তুলনীয়। তাই যে ব্যক্তি ইহজীবনে প্রকৃত বন্ধু লাভ করিয়াছেন, তিনিই সুখী; নতুবা কপট বন্ধুর প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাসপ্রযুক্ত সময়ে বিপজ্জালে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। বক্কেশ্বরের উপকারী দ্বারকানাথ রায়ের নিবাস মুরসীদাবাদের অন্তর্গত কাঁথি। রায় মহাশয়, দেখিতে খর্ব্বাকৃতি; কিন্তু বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ বিশ বৎসরের অধিক স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পরিবারবর্গ সহ তিনি হুগলীতে বাস করিতেছিলেন। বুদ্ধিজীবী দ্বারকানাথ, পৈতৃক বিষয়-বিভব তাদৃশ না থাকিলেও, স্বীয় পারদর্শিতায় বেশ দশ টাকা সংস্থান করিলেন। অপরিচিত স্থানে রায় মহাশয়ের বসতি হইয়াছিল বটে, তথাপি অলৌকিক বদান্যতা ও মিষ্টভাষিতা হেতু অল্পদিনে গ্রামবাসী অনেকেরই তিনি প্রিয় হইলেন। হুগলীর আদালতে মোক্তারী করিয়া মাসে তিন চারি শত টাকা তাঁহার উপায় ছিল। ইতোমধ্যে জনৈক ভূম্যধিকারীর ফৌজদারী মোকদ্দমার তদ্বির করায়, তিনি অনেক টাকা পারিতোষিক লাভ করিলেন। এ সকল কার্য্যে পারদর্শী ও মিষ্টালাপী হইলে, সুখ্যাতি ঘোষিত হইয়া থাকে। লোকেও এরূপ মোক্তারকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য প্রয়াসী হয়।

দ্বারকানাথ, বঙ্গজ কায়স্থ। হুগলীবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের সহিত আদানপ্রদান, সামাজিক প্রথায় অসম্ভব। তিনি হুগলীতে প্রথম আগমনকালে পরিবারাদি কাহাকেও সঙ্গে আনেন নাই। মুহুরী ললিতচন্দ্র দে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সেই সময়ে বক্কেশ্বরের অবস্থা এরূপ হীন হয় নাই, তাঁহার বাটীতে দোলদুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের ক্রিয়া, মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। দ্বারকানাথ, বক্কেশ্বরের বাটীর সন্নিকটে একটী বাসা ভাড়া লওয়ায় সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সহিত পরিচয় হয়। সে সময়ে জমিদারীসংক্রান্ত বিষয়াদি লইয়া বক্কেশ্বরের মামলা মোকদ্দমা প্রায়ই ছিল, এজন্য অল্পদিনেই উভয়ে বন্ধুত্ব হয়। দ্বারকানাথ, কার্য্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ

করিয়া, কিছুদিনপরে পরিবার লইয়া আসেন এবং বক্কেশ্বরের পল্লীতেই একখানি বাটী ক্রয় করেন। সুদীর্ঘ সহবাসে পরস্পরের প্রণয়, গাঢ়তর হইয়া উঠে; আদানপ্রদানাদি সামাজিকতা না থাকিলেও উভয়ের বাটীতে উভয়ের আহারাদি চলিত। সময়ক্রমে বন্ধুদ্বয়ের পরিবারবর্গের পরস্পর আলাপপরিচয় হইল।

রাধামতি, বাল্যাবধি দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ কন্যা সুমতির সহিত একত্র খেলাধূলা করিত। তাঁহারা পরস্পরে উভয়ে 'বকুলফুল' পাতাইয়াছিল, উভয়ের তত্ত্বাদিও চলিত। সুমতির সহিত রাধামতির এরূপ সখ্য হইয়াছিল যে, একত্র আহারবিহার না হইলে, উভয়েই যেন ক্ষুণ্ণ হইত। কালচক্রের বিচিত্র গতি, জীবের ভাগ্যে প্রতিনিয়ত ভিন্নভাবে চালিত হইয়া থাকে। এক দিকে বক্কেশ্বরের অধোগতি, অন্য পক্ষে দ্বারকানাথের দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি! সংসারে ধনাঢ্য লোকের গৃহে বিনা আহ্বানে জনতা হয়। সকলেই সেই ধনশালী দ্বারা সময়ে কোন উপকার দর্শিবে—এই কল্পনায় অহোরাত্র তাঁহার বাটীতে গতিবিধি করিতে থাকে। নিঃস্বের নিকেতনে লোকের সেরূপ যাওয়া-আসা দূরে থাকুক, পথে ঘাটে দেখা সাক্ষাৎ হইলেও, কেহ ভাল করিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহে না। তাহাতে দ্বারকানাথ—শান্তপ্রকৃতি, মিষ্টভাষী, ধনী ও নির্ধনের তারতম্য না করিয়া, সকলের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিতেন। লোকে যথায় যত্ন পায়, সেই স্থানেই প্রায় যায়; তাঁহার বাটীতে লোকজনের সমাগম না হইবে কেন? অবস্থার উন্নতিতে আমোদপ্রমোদেরও বৃদ্ধি। আজ বন্ধুবান্ধবের প্রীতি-ভোজ হইল, কাল নৃত্যগীত-বাদ্যাদি চলিল; এইরূপ নিত্য নূতন আমোদ-প্রমোদ, দ্বারকানাথের বাটীতে হইত।

সুমতির সহিত রাধামতি, প্রীতিসূত্রে আবদ্ধা। অধিকন্তু, দ্বারকানাথ তাঁহাকে কন্যার মত আদরযত্ন করিতেন। রাধামতিও, দ্বারকানাথকে

খুল্লতাত বলিয়া জানিতেন। বাল্যে সুমতির সহিত রাধামতির বন্ধুত্ব। তাঁহারা উভয়েই সমবয়স্কা, উভয়ে উভয়কে সহোদরা বলিয়া জানিতেন।

এক্ষণে বঙ্কেশ্বরের হীনাবস্থা জানিয়া দ্বারকানাথ, সুমতির জন্য যখন যে কোন বস্ত্র লইয়া আসিতেন, তাহা দেখিয়া রাধামতির মন ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এই ভাবিয়া তিনি সেই জিনিস দুই প্রস্থ করিয়া লইয়া আসিতেন। দ্বারকানাথের ঈদৃশ স্নেহযত্নে দরিদ্র পিতার কন্যা হইলেও, রাধামতির কোন বিষয়ে অভাব ছিল না। সুমতির ন্যায় রাধামতিও, বেশভূষায় সজ্জিতা থাকিত। যেখানে স্নেহযত্ন, বালকবালিকা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকিতেই ভালবাসে। রাধামতি, এই জন্যই দ্বারকানাথের বাটীতে নিয়তই থাকিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দ্বারকানাথের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রনাথ, পিতৃসদৃশ শিষ্ট ও লেখা-পড়ায় সুপণ্ডিত ; বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া আইনশিক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপনে সকলেই তৃপ্ত হইত। পিতার ঐশ্বর্য্যজনিত অহঙ্কার, তাঁহার অন্তরে লেশমাত্র ছিল না। দ্বারকানাথের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া তিনি কদাচ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপে ইচ্ছা করিতেন না। অধিকন্তু, তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার গর্ব্ব ছিল না। মানসরঞ্জন চন্দ্রেও যেরূপ কলঙ্ক আছে, সেইরূপ এই সর্ব্বগুণ-বিভূষিত মহেন্দ্রনাথ বিধর্ম্মী। পিতা পরমহিন্দু—বিষ্ণু উপাসক। পুত্র, নব-ব্রাহ্মধর্ম্মী—কিন্তু, ধর্ম্মসংক্রান্ত মতভেদে সুখের সংসার, বিষাদাগারে পরিণত হইয়াছিল। পিতা যে সকল কার্য্য করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন এবং সেই ভাবে সামাজিক প্রথারক্ষার নিমিত্ত সন্তানসন্ততিকে উপদেশ প্রদান করিতেন; মহেন্দ্রনাথের পক্ষে সে পরামর্শ, অপ্রিয় বোধ হইত। কনিষ্ঠ হেমেন্দ্রনাথ—

কথাবার্ত্তায় অমায়িকপুরুষ; কিন্তু যৌবনসুলভ চাপল্যে তাহার চরিত্র কলুষিত। লেখাপড়ায় তাহার মনোযোগ না থাকায় আমোদ-প্রমোদে সে, একান্ত অনুরাগী। কেবল সঙ্গিগণসঙ্গে কুস্থানে গমন ও মদিরাপানকে সে, জীবনের সার জানিয়াছে। পিতা, বৃদ্ধদশায় বহু পরিশ্রমে কতই দুঃখকষ্টে অর্থসংগ্রহ করিতেছেন, সে দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। আপনার মনের আনন্দে কালক্ষেপ হয়, হেমেন্দ্রের অহরহঃ সেই একই চিন্তা। ধনবানের সন্তান, পিতার অবর্ত্তমানে অতুল বিভবের অধিকারী হইবে, এই সিদ্ধান্তে ভিন্ন-প্রকৃতির কত লোকে, তাহাকে দিবাযামিনী বেষ্টন করিয়া থাকিত। বৈঠকখানাগৃহে তোষকের উপর জাজিম পাতা। মধ্যে মধ্যে ভৃত্যগণ, আল্‌বলায় তমাক সাজিয়া দিতেছে। এ সুখভোগে 'লোকসমাগমের' অভাব হইবার কথা কি?

শৈশবাবধি সুমতির সহিত রাধামতির একত্র ক্রীড়া-কৌতুক চলিত। সুমতি, হেমেন্দ্র ও মহেন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদরা। সে, তাহাদিগকে দাদা বলে। রাধামতিও, তাহাদের উভয়কে ভ্রাতা জানিত। সরলস্বভাবা রাধামতি, সংসারের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে অনভ্যস্তা। হেমেন্দ্র, অন্তঃপুরে আসিয়া সুমতিকে ও রাধামতিকে একত্র খেলা করিতে দেখিলে, তাহাদিগের নিকট যাইত, কথাচ্ছলে আমোদ-আহ্লাদ করিত, কখন বা দুই একটী উপহাসের কথাও কহিত। হেমেন্দ্র যুবক। তাহার ইন্দ্রিয়, স্বল্পক্ষমতাবিশিষ্ট। এদিকে সুমতি ও রাধামতি, উভয়েই যুবতী। হেমেন্দ্র, যে ভাবেই তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করুক না, তাহারা ভ্রাতৃস্নেহ ও আদর ভিন্ন অন্য ভাবে তাহা গ্রহণ করিত না। অন্য-পক্ষে হেমেন্দ্র; রাধামতির রূপলাবণ্যে মুগ্ধ; তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। যুবকের সে কলুষিত অন্তঃকরণের ভাব, স্বপ্নেও রমণীযুগলের হৃদয়ে অঙ্কিত হয় নাই। যে চক্ষে হেমেন্দ্র, রাধামতির প্রতি চাহিয়া দেখে, তাহা পশুবৃত্তিমূলক

পাপময়; কিন্তু, তাহাদের নির্ম্মল হৃদয়, হেমেন্দ্রে গুরু-বৎ ভক্তিপূর্ণ। রাধামতি, ধাত্রীসঙ্গে ছাদদেশে সে দিন বিচরণ করিতে করিতে, অকস্মাৎ মনের আবেগে যেমন নিম্নতলে আসিল, অমনই ছাদে যে পুরুষমূর্ত্তির অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাইল, সেই নরপিশাচ হেমেন্দ্র। ইতরপ্রকৃতিতে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য থাকে না; তাহাদের দ্বারা পার্থিব যাবতীয় অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। অবলা রাধামতি, কোমল-প্রকৃতি। তাহার আন্তরিক ও বাহ্য ভাবের কিছুমাত্র ভেদ ছিল না। সরলহৃদয়া দ্বিধাশূন্য। সে, যাহা দেখে—তাহার পক্ষে তাহাই সুন্দর; যাহা আহার করে, তাহাই মধুর; কিন্তু বিমলিন কুসুমকোরকে কীটের প্রবেশ, সহজে অনুভূত হয় না। রাধামতি, আপন গৌরবেই গর্ব্বিতা, কি ভাবে চলিলে লোকের নিন্দা-ভাজন হইবে না, কি কার্য্যে লোকের মনোরঞ্জন করিবে, সে দৃষ্টি তাহার থাকে কি? মৃগশাবককে আয়ত্ত করিয়া শৃগালের যেরূপ আনন্দ, রাধা-মতিকে সুমতির সহিত মিলিত দেখিয়া, দুর্বৃত্ত হেমেন্দ্রের সেই আনন্দ! কি কৌশলে সে, সেই মনোরমা রাধামতিকে হস্তগত করিবে, সারাদিন তাহার সেই চেষ্টা।

কোন একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে বিবিধ বিঘ্ন ঘটে; কিন্তু, পাপা-চারের পথ, আপাত-প্রতীত প্রশস্ত। হেমেন্দ্রের হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়াছে। বীজ, অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই, শাখা প্রশাখাদিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সুমতি, রাধামতির সহিত একত্র খেলা করে। সে গৃহে অপর কে হ যায় না। এই সুযোগে হেমেন্দ্র, তাহাদিগের সহিত বালকের ন্যায় হাস্য পরিহাস করিয়া থাকে। কখনও বা রাধামতির আরক্তিম গণ্ডস্থলে হাত বুলাইয়া তাহার মনের অভিলাষ বুঝিতে প্রয়াস পায়। প্রেমোন্মত্ত যুবক, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য—মান, সম্ভ্রম, গুরুগঞ্জনা প্রভৃতি সমাজবন্ধনের প্রতি সে, দৃষ্টি রাখে না। কি কৌশলে—কি ছলে রাধামতি, তাহার প্রণয়িনী

হইবে, অহর্নিশ তাহার সেই চিন্তা। সাংসারিকবিষয়-ভোগে বীতানুরাগী হইয়া পাপমতির পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করাই এক্ষণে একমাত্র উদ্দেশু। লম্পট হেমেন্দ্র, জ্ঞানহারা। সেই উদ্দেশ্যে সে, রাধামতির ও সুমতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে;' তৎপ্রতি আত্মীয়স্বজনের সহসা :দৃষ্টি পড়িলেও, তাহার'লজ্জা বা ভীতির ভাব নাই।

জগতে রূপবতী যুবতীর শত্রু .পদে পদে। মনোমোহিনীর মনোভাব বুঝিতে কেহ কেহ কল্পনা জল্পনা করে; কিন্তু, পরিণামে হয়তো তাহাকে আত্মহারা হইতে হয়। নারীপ্রেমে মুগ্ধ কত শত লোকেই, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় কি? সংসারে সকল অনিষ্টের মূলেই রমণী। এই রমণীপ্রেমে বিহ্বল হইয়া রাজার রাজ্যনাশ, স্বাধীনের স্বাধীনতার খর্ব্বতা যে, কত শত ঘটিয়াছে, তাহার নির্ণয় হয় না। হেমেন্দ্রনাথ, হিতাহিত না ভাবিয়া, পুণ্যাপুণ্যের প্রতি না চাহিয়া, অবলা রাধামতির রূপমাধুরীতে তন্ময়'হইয়া, জীবনের সুখের দিন শেষ করিয়া তুলিল। আত্মীয়কুটুম্বের সদুপদেশ, সহধর্ম্মিণীর প্রবোধবাক্য, আহারবিহার—সকল বিষয়েই যেন বিতৃষ্ণা জন্মিল। রাধামতির অনূঢ়াবস্থায় হেমেন্দ্রের তৎপতি অনুরাগের সঞ্চার। রমণীর কি অলৌকিক রূপমাধুরী! যে ভাবে যখন তাহাকে দেখ না কেন, মন মুগ্ধ হয়। রাধামতির ভুবনভুলান রূপ—তাহাতে সুমধুর বচনসুধা—দুরাচার হেমেন্দ্রনাথের মাহেন্দ্রযোগ! যুবা হেমেন্দ্র, সেই রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া তৎস্পর্শে আত্মহারা!

পাপকর্ম্ম যতই গোপনে'ঘটুক না কেন, পরিণামে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ পাইয়া থাকে। রাধামতির প্রতি হেমেন্দ্রের অবৈধ অনুরাগ, দ্বারকানাথ ও তদীয় পত্নীর কর্ণগোচর হইল। রাধামতিও, সর্ব্বদা রায় মহাশয়ের বাটীতে যাতায়াতে'বিরতা। এই নিমিত্তই দ্বারকানাথ, যজ্ঞেশ্বরকে রাধামতির যাহাতে সত্বর বিবাহ হয়, সেই জন্যই বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রায় মহাশয়ের পরিবারবর্গ হেমেন্দ্রের এরূপ হীনপ্রকৃতির পরিচয় পাইয়া তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিল। হেমেন্দ্র, অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল। কিন্তু, যাহারা চিরকাল অসৎ-কার্য্যে বৃতী, তাহাদিগের পক্ষে এরূপ ব্যাপার, দুরূহ বলিয়া বোধ হয় কি? হীনচেতা তখনও কি উপায়ে পূর্ণমনোরথ হইবে, তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় উদ্যুক্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধরা-ধামে সুখ-দুঃখ, ধারাবাহিক নিয়মে পর্য্যায়ক্রমে ঘটিতে থাকে। এক যায়, আর আসে—সে যাতায়াতের গতি রোধ হইবার নয়। ধূলার দেহ, ধূলায় মিশিবে; পঞ্চভূত পঞ্চভূতের আশ্রয় লইবে; জীবন-মরণের এই সুদীর্ঘ ব্যবধানে শরীরির বিরাম কোথায়? সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলকে সহিতে হইবে! কিন্তু, সাবধানের বিনাশ সম্ভবে কবে? যে ব্যক্তি, সতর্কতা-সহকারে সংসার-পথের পথিক, তিনিই মহাপুরুষ। তাঁহার নাম, ইহ লোকে লুপ্ত হইবার নয়। যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া তাঁহার সুযশ কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে। সেই দিব্যপুরুষকে আদর্শ-পরিগ্রহণে যে মানুষ, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাহার পক্ষে বাধা-প্রতিবন্ধকে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটে না। বক্কেশ্বর, ধনাঢ্যের পুত্র—অর্থবিনিময়ে সুখ-সম্ভোগে পরিচিত ছিল, তৎসমুদায়ই বক্কেশ্বরে বর্ত্তমান। কিন্তু বর্ত্তমানে দিনান্তে এক মুষ্টি অন্নসংগ্রহ করিয়া, তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। এত দুঃখকষ্টেও তাঁহার প্রতি কমলা সদয়া। সহৃদয় দ্বারকানাথের আনুকূল্যে বক্কেশ্বর, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন; নিঃস্ব হইলেও, তাঁহাকে সে কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই; কিন্তু, যে চরিত্রদোষে

মিত্রজকে ধনপতি হইতে দারিদ্র্যে নিঃক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে, সে সংক্রামক ব্যাধি, এখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। বিত্তমানে তাঁহার কতক চৈতন্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অভ্যাসদোষে তিনি সে স্বভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

গৃহিণীর পারদর্শিতায় গৃহস্থালীর কোন অভাব থাকে না। অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানে অন্নব্যঞ্জনের অভাব কোথায়? যেখানে গৃহিণী শুদ্ধচারিণী—সে সংসার, যেমন চালিত হউক না কেন; অসদ্ভাব হয় না। বক্কেশ্বরের ভার্য্যা কমলাসুন্দরী সাধ্বী। তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে পারিবারিক সকল অভাবের সঙ্কুলন হয়। পতিপ্রাণা, স্বামীর মঙ্গল-সাধন-ব্রত-পালনে পতি ও কন্যার অভাবমোচনে অহরহঃ চিন্তিতা থাকিতেন। তাঁহার সুমধুর কথায় সকলেই বিমুগ্ধ। দীন দুঃখী হইতে ঐশ্বর্য্যশালী সকলেই—তাঁহার প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ। সতীর দেহে ক্রোধের কণামাত্র নাই। পিতা, ধনশালীর গৃহে তনয়ার বিবাহ দেন। সে সময়ে বক্কেশ্বরের পিতামাতা উভয়েই জীবিত। এ কারণ, সে সংসারে সুখসমৃদ্ধিবৃদ্ধি যথেষ্ট ছিল। সময়ে সে ধনসম্পত্তি-সকলই, হস্তান্তরিত হইয়াছে। বক্কেশ্বরের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কমলা, এখন গৃহিণী। বাল্যে দাসদাসীতে তাঁহার পরিচর্য্যা করিত। সে সুখ এখন কোথায় গেল? পঞ্চত্রিংশ বর্ষ বয়স হইলেও, কমলার বিমল রূপরাশি, পূর্ণযৌবনের পরিচয় দেয়। সতী, সত্য সত্যই যেন নারীরূপিণী নারায়ণী, বক্কেশ্বরের গৃহে বিরাজিতা! বক্কেশ্বর, বিষয়াদি নষ্ট করিলেও, কমলার শোকতাপনিমিত্ত হাহাকার নাই। স্বামী, তাঁহার কথায় মর্ম্মপীড়িত হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় পতির অপরাধের দিকে তিনি লক্ষ্য রাখিতেন না। রাধামতির ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন হইতে সংসারে অবনতির সূত্রপাত। কিন্তু, কমলা, পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে সংযত থাকায়, কোন বিষয়েই তাঁহার অভাব ঘটিত না। স্ত্রী-পুরুষে, রাধামতির

কুমারীকালে বিবাহ জন্য ভাবিতেন। কোন কার্য্যেই তাঁহাদিগের স্ফূর্ত্তি ছিল না। কি উপায়ে কন্যাদায়ে উদ্ধার পাইবেন, সদাই সেই ভাবনা। উদারচেতা দ্বারকানাথের অনুগ্রহে সে দায়ে তিনি তো উদ্ধার পাইয়াছেন। এক্ষণে হুগলীর আদালতে বক্রেশ্বর, ত্রিশ টাকা বেতনে একটী নকলনবিশির কার্য্য পাইয়াছেন। সুখে, দিনাতিপাত হইতেছে। সময়ের পরিবর্ত্তনে লোকে, উত্তরোত্তর বিকৃতভাবাপন্ন হয়। কিন্তু, সুগ্রহের সূত্রপাতে সে দুশ্চিন্তা ঘুচিয়া যায়। কয়েক মাস পরেই বক্রেশ্বরের দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। এদিকে তাঁহার এক পিতৃব্যের লোকান্তরে তিনি তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার পিতৃব্যের অন্য সন্তানাদি কেহই ছিল না। নিঃস্ব বক্রেশ্বর, পঁচিশ হাজার টাকার অধিকারী হইলেন!

যে সকল বন্ধুবান্ধব তাঁহার দুর্দিনে একে একে সরিয়া গিয়াছিল, পুনরায় তাহাদের দুই একজন আসিয়া সাক্ষাৎ করিল। বক্রেশ্বর, সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাত উত্তম বুঝিয়াছেন; সুতরাং তাহাদিগের প্ররোচনায় তাঁহার আর ভাবান্তর হইবে কেন? তাহারা তাঁহার নিকট পূর্ব্বের আদর পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারে না। বক্রেশ্বরের পূর্ব্বস্বভাবের পরিবর্ত্তন বুঝিয়া, তাহারা একে একে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। সময়ক্রমে বক্রেশ্বরের পৈতৃক মানসম্ভ্রম বজায় রহিল। ক্রিয়াকলাপ, পৈতৃক রীতিতে পুনর্ব্বার চলিল। দুঃখের দিন আর নাই। কিন্তু—দেখ দেখ, বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! তিনি দুঃখীকে ধনী ও ধনীকে নির্ধন করিতেছেন। বিস্তর দুঃখ ও জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া উপস্থিত অবস্থায় বক্রেশ্বরের সংসারযাত্রা, সুখসচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইতেছে। জামাতাকে লইয়া সাধ-আহ্লাদ চলিতেছে। এই ভাবে কিছু কাল গত হইলে, কমলার শরীর ভগ্ন হইল। সাধ্বীর নিজশরীরের প্রতি যত্ন ছিল কৈ? তিনি পরিজনবর্গের ভরণপোষণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্যই রাখিতেন। অবস্থার হ্রাসবৃদ্ধিতে

কমলার মনোভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি প্রকৃতই দয়া-বতী। দুঃখের দিনে এক সন্ধ্যা আহারে যখন তাঁহার দিনাতিপাত হইয়াছে, সে সময়েও অতিথিসৎকারে তিনি এক দিনও বিমুখ ছিলেন না। পরের দুঃখে তিনি যেরূপ মর্ম্মপীড়িতা হইতেন, আজকাল সেরূপ রমণীর সংখ্যা কত? তিনি সংসারে নিঃস্বার্থ রমণী। পতী-পত্নিতে যে যেমন কামনা করিয়া—ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া—কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, প্রগাঢ়চিত্তে যদি তাহার ধর্ম্মে অনুরাগ ও আসক্তি থাকে, কাষ্ঠ কঠোর হস্তে নিপীড়িত হইলেও, বক্কেশ্বরের দুর্দ্দশার দিনে সকল দিক্ বজায় রাখিয়া, যে সংসারধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছিল এবং কালক্রমে সে দিন ঘুচিয়া যে উন্নতির দিন আসিল, পতিপ্রাণা ধর্ম্মভীতা কমলার পরিচর্য্যায় এই সমস্ত নির্ভর করিয়া-ছিল। পিতামাতার স্নেহযত্নে রাধামতি, দুঃখের দিনেও ক্লেশ পান নাই। এখন তিনি সুশিক্ষিত যুবকের অঙ্কলক্ষ্মী। তাহাতে পিতার সংসারে উন্ন-তির সূত্রপাতে তাহার কেবল সুখেরই বৃদ্ধি।

নবম পরিচ্ছেদ।

সুখদুঃখের বৈষম্যেও কমলার সমভাবেই দিন যায়। দাস-দাসী, পূর্ব্বের মত নিয়োজিত। সংসারে শ্রী, পূর্ব্বের মত বজায় হইয়াছে। জগদীশ্বর, যাহার প্রতি যাহা বিধান করেন, তন্মুহূর্ত্তে তাহাই সাধিত হইয়া থাকে। তিনি সুখের সংসারকে দুঃখের আগারে পরিণত করেন; আবার দুঃখের দিনে সুখ-তপন উদিত করেন। মনুষ্যের চিরদিন সমভাবে যায় কি? অবশ্যম্ভাবী ছায়াযন্ত্রের দৃশ্যরাজির একটীর পরে অন্যটীর পরিবর্ত্তনের ন্যায় কালে দুঃখভোগ হইয়াছে, সে দিনের অন্তে ভাল সময় আসিবে, এ কথা কে বলিতে পারে? বক্কেশ্বরের সংসারে অভাবের অভাবে সকল দিকই

নচ্ছল ; কিন্তু এভাবে চিরকাল গত হয় কি ? যদি এক ভাবে চিরকাল যাইত, তাহা হইলে হিতাহিত, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির বৈষম্য কেন ? ধর্ম্মপথে থাকিয়া আজীবন দুঃখভোগে যাপিত হইল। এক দিনও তিনি সুখী হইলেন না। প্রকৃত পক্ষে সে ব্যক্তির বাহ্য ভাবগতি দেখিয়া তাহাকে অসুখী নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে যে ব্যক্তি, ঈশ্বরপরায়ণ—ধর্ম্মমতে তিনিই বিধাতার বিধি পালন করিতেছেন। দিনান্তে অভুক্ত থাকিলেও, তিনিই পরম সুখী। সেই মহাত্মার হৃদয়-কন্দর, মধুর প্রেমরসে আপ্লুত। পার্থিব সুখে সে প্রীতির তুলনা নাই। মঙ্গলনিদান আশ্রিতের হিতসাধনে কখন বিমুখ নহেন। যে সংসারে ধার্ম্মিকের সহানুভূতি, সেখানে যতই বিঘ্নবিপত্তি হউক না কেন, কোন আশঙ্কা নাই। হতবুদ্ধি বক্কেশ্বরের দোষে সংসার, ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। একমাত্র কমলার ভক্তিতে সে নষ্টশ্রীতে লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়াছিল। রাধামতি চঞ্চলা। খেলা পাইলে তাহার কোন জ্ঞান থাকে না। প্রিয়সখী সুমতির সহিত মিলিয়া আমোদে সে উন্মত্তা। কমলা ধর্ম্মশীলা। স্বামী ও পুত্রীর মঙ্গলই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা ভক্তবৎসল ভগবান্ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। পতিব্রতা কমলারও অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে ; রাধামতি ও বক্কেশ্বর, সুস্থশরীরে মনের সুখে কালপাত করিতেছে। কমলার সুখদুঃখে ইতরবিশেষ নাই। এক সময়ে তিনি সুখে কাটাইয়াছেন, সময়ে দুঃখের অবধি ছিল না। আবার সুখোদয় হইয়াছে। সে অবস্থার পরিবর্ত্তনে কমলার মতিগতির ভিন্নতা হয় নাই। দাসদাসীরা তাঁহাকে বেশভূষায় সুশোভিতা দেখিতে, অনুরোধ করিলে, তদুত্তরে তিনি বলিতেন,—"ভগবান্ যাহাতে তুষ্ট, তাহার অপেক্ষা আর শোভা কি ?" বাস্তবিকই বাটীর দাস-দাসীর মত তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন। বিলাসভোগে কালক্ষেপ করিবেন, সে কামনা তাঁহার এক দিনও হয় নাই। কমলা, সংসারকার্য্যসমাপনান্তর ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্তা থাকিতেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্মই—লক্ষ্য।

সে কার্য্য যতই দুঃসাধ্য হউক না কেন, অটল বিশ্বাসে অবশ্যই তাহা যথা সময়ে সুসম্পন্ন হয়।

সংসারে যে ব্যক্তি, প্রবৃত্তির অনুগামী, কার্য্যে ঘটনাক্রমে তাহার সুকৃতি লাভ হইতে পারে; কিন্তু সে কৃতিত্ব ক্ষণস্থায়ী। শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অবনতির সূত্রপাত অনিবার্য্য। অধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থে বিশ্বাস কোথায়? হিতাহিত-বিচারবিহীন অবিমৃষ্যকারিতায় কার্য্যভার গ্রহণ করে, সূচনায় শুভ ফল দেখিয়া, কালক্রমে অনিষ্ট ঘটিবে না, এ কথা কে বলিতে পারে? সৎকার্য্যসাধনের প্রারম্ভ, কঠোর বিবেচিত হইলেও, পরিণামে তাহাতেই সমধিক প্রীতির সম্ভাবনা। লোকে, ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া আজীবন কষ্ট ভোগে কাটাইল দেখিয়া—কি ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ আনয়ে? সর্ব্বশক্তিমান, ভক্তের নিমিত্ত যে অনন্ত শান্তির বিধান করিয়াছেন—ঐহিক সুখ, তাহার তুলা নহে! ঐহিক সুখ পাইয়া পারমার্থিক চিন্তা একবারও ভাবিয়া দেখি না; দেহাবসানে পুনরায় যে অন্য দেহে আত্মা আশ্রয় লইবে, অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপের যে, পরলোকে বিচার হইবে, সে চিন্তা কিছুই থাকে না! আপাততঃ যাহা মনোরম, তাহারই সম্ভোগ জন্য আমরা ব্যগ্র হই; কিন্তু, শেষে যে মহা নষ্ট সংঘটিত হইবে, কখনও তাহা ভাবিয়া দেখি না। তাই সংসারে পাপের বৃদ্ধি। কিন্তু, ভগবানের কৃপা, ধার্ম্মিকহৃদয়ে চিরবিরাজিত। যিনি ইহকাল ধর্ম্মাচরণে সংযত, পরলোকে সে ব্যক্তি, যে—পরম প্রীতিতে কাটাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বক্কেশ্বরের সুখের দিন, দুঃখে পরিণত হইয়া, পুনরায় সংসারে সুখ হইয়াছে; কিন্তু, সে সুখ তিনি কি আজীবন ভোগ করিতে পারেন? বক্কেশ্বরের এক্ষণে চরিত্রদোষ সংশোধিত। পাপসংসর্গে কত যে, দুঃখভোগ হইতে পারে, সে জ্ঞান তাঁহার বিলক্ষণ উপলব্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুবান্ধবের এক্ষণে আর তাঁহার নিকটে গতিবিধি নাই। সংসারসম্বন্ধে

এক্ষণে তিনি লোকচরিত্র, বিলক্ষণই বুঝিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মে মতি হইয়াছে; কিন্তু, চিরদিন তাঁহার সুখে কাটিবে, সে সম্ভাবনা কোথায়? নিগ্রহানিগ্রহের মূলাধার বিধাতা। তিনি অনাথকে সনাথ, দুঃখীকে সুখী, ধনীকে নির্ধন—সবই করিতেছেন। প্রকৃত ধর্ম্মপথে বিচরণে যিনি কৃতী, বাহ্য দুঃখকষ্টে তাঁহার মনোবৃত্তি বিচলিত হইবার নয়। সে পবিত্র হৃদয়ে আনন্দ, নিত্য-বিরাজিত। সাংসারিক অভাব ঘুচিয়াছে বলিয়া যে, কমলার হৃদয়, প্রসন্ন—তাহা নহে। সেই পবিত্র চিত্তে, সকল সময়ে চিরশান্তির আধিপত্য। সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে সে চিত্ত বিচলিত হইতে পারে কি? বক্কেশ্বর ও রাধামতি, কমলার ভক্তির অনুরাগে যে সুখ ভোগ করিতেছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বক্কেশ্বরের চরিত্রের সংস্কার ঘটিয়াছে। তিনি সাংসারিক বিষয়ে বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন,—এ সকলই সত্য; তথাচ সে চরিত্রে বিশ্বাস কি?

দশম পরিচ্ছেদ।

রাধামতি আমোদপ্রিয়া; নিরন্তর সুখে থাকিতেই তাহার কামনা। যে, আত্মসুখে যত্ন করে, তাহার উন্নতি কোথায়? বাহ্য দৃশ্যে তাহার সরলতা প্রকাশ পাইলেও, আভ্যন্তরিক কপটতা, সময়ে বাহির হইয়া পড়ে। কমলার ব্যথায় ব্যথিত হইয়াই, অন্তর্যামী পরমাত্মা, বক্কেশ্বরের সংসারের প্রতি চাহিয়াছেন,—অপ্রতুল ঘুচিয়াছে। কমলা, দুঃখে ক্লেশে দিনপাত করিয়া, স্বামী ও কন্যা লইয়া কয়েক বৎসর কাটাইয়াছেন। সাংসারিক আমোদ-প্রমোদ ক্ষণভঙ্গুর; এই আছে, এই নাই। এ অসার আমোদে অবিবেচক ব্যক্তিই অধীর হয়। যে হৃদয়ে সেই অব্যয় অচিন্ত্য চিন্তামণির আরাধনা স্থান পাইয়াছে—সে হৃদয়, সাংসারিক মায়ায় মোহিত হইয়া, কতক্ষণ ভুলিয়া

থাকিতে পারে? ভগবান্, ভক্তের ভাব বোঝেন। যাঁহারা তাঁহার চরণ-ধ্যানে সংযত, ধর্ম্মপথের পথিক, তাঁহাদিগকে সংসারাশ্রমে বহুকাল লিপ্ত থাকিতে হয় না। ইহধামে সাধুপুরুষের লীলাক্ষেত্র, স্বল্পকালের জন্য; কিন্তু, তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ, অনন্তকাল-ব্যাপী। লোকে, সেই মহাপুরুষগণের চরিত্র আদর্শ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। তাঁহাদেরই চরণচিহ্নানুসরণে সামাজিক মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। যে নরনারী, চরিত্রদমনে সমর্থ, প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, অকস্মাৎ তাঁহারা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ঘটনাস্রোতে পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইয়াও, যাঁহারা কখন বিচলিত হন না, সংসারে তাঁহারাই সুখী। বক্রেশ্বরের অবস্থা, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে উন্নত; কিন্তু, মায়ার কি মোহিনী শক্তি! এক দিন যে অসচ্চরিত্রে তিনি বিত্তবানের পুত্র হইয়া নিঃস্ব হইয়াছিলেন, পুনশ্চ তাহাতেই আসক্ত হইয়াছেন; ভাবিয়াছেন—নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় আর দেখাইবেন না; পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন; কিন্তু, সে ভাব, তাঁহার পক্ষে কত ক্ষণ স্থায়ী? তাঁহার চরিত্র, কলুষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, দুই এক জন, পুরাতন চাটুকার জুটিল!

এদিকে রাধামতি, পূর্ণযৌবনা—অথচ সংসারধর্ম্মে তাদৃশ অনুরাগিণী নহেন। ইতোমধ্যে কয়েক বার স্বামিগৃহে বাস করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু, তাহাতে তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। বনচর পক্ষী, শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলে, পালাইতে যেমন চেষ্টা করে, রাধামতিরও সেই ভাব। গৃহস্থের বধূর সংসারের সকল বিষয়েই দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। যে সংসারে শাশুড়ীননদ বর্ত্তমান, সকল বিষয়ে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হয়, মানসম্ভ্রমে লজ্জা-ঘৃণায় নববধূর গুরুস্থানীয় কাহারও সহিত কথাবার্ত্তার অধিকার নাই। শ্বশ্রূঠাকুরাণী বা অন্য গুরুলোকে, অন্যায় কথা কহিলেও, দ্বিরুক্তি করিতে তাহার অধিকার বা সহসা সাহস নাই—তাহা হইলেই লোকে, মুখরা বলিবে!

ক্ষুধার সময়ে আহার পায় না, শাশুড়ীর অবকাশ-মত যখন তিনি জল খাবার দিবেন, তখন সে খাইতে পাইবে। নতুবা ক্ষুধায় খাদ্যযাচ্ঞা, নববধূর অপবাদের কথা। হিন্দুললনা যত দিন না গৃহিণী হইয়া নিজের সংসার নিজে বুঝিয়া লন, তদবধি স্বেচ্ছামত কোন কার্য্যে তাঁহার অধিকার কোথায়? অধিকন্তু তাঁহাকে সর্ব্বদা সলজ্জ ভাবে থাকিতে হয়। রাধামতি, বাল্যাবধি পিতা-মাতার আদর যত্নে পালিতা; সংসারের কাজ-কর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ ছিল না। মাতা কর্ম্মিষ্ঠা ও বুদ্ধিমতী, এজন্য তনয়ার গৃহকার্য্যে অনবধানতায় কখন কন্যাকে তিরস্কার করিতেন না। সুযোগমতে কমলা, রাধামতিকে বুঝাইতেন ও সংসারসম্বন্ধ শিক্ষা দিতেন।

পুত্রকন্যার কেহ নিন্দা করিলে পিতা-মাতার প্রাণে ব্যথা লাগে। লোকমুখে সন্তানসন্ততির সুখ্যাতির কথা শুনিলে তাঁহারা প্রীত হন। অধিক কি, তাহারা কোন দুষ্কর্ম্ম করিলেও, সাধারণের নিকট পিতামাতা তাহা অপ্রকাশ রাখেন। রাধামতির কাজের মধ্যে ভোজন ও বেশবিন্যাস। কমলা তাঁহাকে সংসারধর্ম্মে দীক্ষিতা করিতে চেষ্টিতা থাকিলেও, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। সময়ে সময়ে পুত্রকন্যার দোষ দেখিয়া পিতামাতা বিরক্ত হন, তাহাতেই পরিণামে তাহাদের শুভ হয়। তাঁহাদের অনভিপ্রেত কার্য্যের অনুমোদনে তনয়-তনয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। পিতামাতা যতদিন সংসারে জীবিত থাকেন, লজ্জা সরমে দৃষ্টিহীন হইয়াও পুত্রকন্যার সুখবিধানে ও মঙ্গলসাধনে উভয়েই যত্ন করেন; কিন্তু, সেই স্নেহাধার পিতামাতার অবর্ত্তমানে সন্তানের কতই দুরবস্থা হয়! রাধামতি বাল্যাবধি সাংসারিক কার্য্যে অনুরক্তা থাকিলে—তাঁহার মাতার উপদেশানুগামিনী হইলে—এক্ষণে শ্বশুরালয়ে কর্ম্মের জন্য তাঁহাকে গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত কি? আদর যত্নে লালিতপালিতা রাধামতি, ভর্তৃগৃহে পরের অধীনা বা বশীভূতা হইয়া, কি প্রকারে থাকিতে পারে! পিতার সংসারে যে এত

বিঘ্নবিপত্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে রাধামতির মনোবৃত্তির বৈলক্ষণ্য হইবে কেন? কষ্টের দিনেও রাধামতির গ্রাসাচ্ছাদনের কোনই অভাব হয় নাই। সাংসারিক ঘটনা-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া যাহার কোনপ্রকারে কিছুকাল যাপিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে সাংসারিক বিষয়কর্ম্ম অবশ্যই সহজে বোধগম্য। সরলা রাধামতি সংসারবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। অভাগিনী, আশৈশব মাতৃঅনুষ্ঠিত কার্য্যাদি লক্ষ্য করিয়া সংসার-কার্য্যে দেবীসদৃশা অনুরাগিণী হইলে, পিতার বা পতির গৃহে তিনি মনের সুখে কালক্ষেপ করিতে পারিতেন।

বক্কেশ্বরের সংসারে পুনর্ব্বার দুঃখের সূত্রপাত হইল। কমলা চঞ্চলা। সমভাবে তাঁহার স্থিতি নাই। উন্নতিতে আপনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যিনি বিষয়কার্য্যে দৃষ্টি রাখেন—তাঁহারই চির-মঙ্গল। নতুবা অবৈধ ব্যবহারে নিশ্চিতই কষ্টভোগ করিতে হয়। ভাগ্যলক্ষ্মী কাহার মুখ চাহিয়া বক্কেশ্বরের সংসারে অশান্তির দিনেও যে সুখসম্মিলন করিয়াছিলেন, সে রহস্য কে বুঝিবে? পতিব্রতা কমলা, গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট-ভোগেও পতির প্রতি কখন বিরক্ত ভাব দেখান নাই। সংসারের কিরূপে দুঃখ ঘোচে, পতি ও কন্যার অভাব মোচন হয়, সেই ভাবনাই কমলার হৃদয়-ক্ষেত্রে সর্ব্বক্ষণ জাগ্রৎ থাকিত। তিনি দৈন্যে দিনপাত করিয়াও ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি রাখিয়াছিলেন, কায়মনে মঙ্গলপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিধাতাও তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন; সেই কারণেই দুঃখের দিনে সুখোদয় হইয়াছিল। বক্কেশ্বর কর্ম্মদোষে পুনরায় বিষয়সম্পত্তি নষ্ট করিলে, কমলার ক্ষোভের সীমা রহিল না। ঈশ্বরের নিগ্রহানুগ্রহ, সাধকই হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ। কমলা বুঝিলেন—উন্নতির অবস্থায় যে পতন, তাহাতে শ্রীবৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনা আর নাই! কার্য্যদোষে উন্নতির পথে ব্যতিক্রম ঘটিলে, ইহজীবনে পরিবর্ত্তন কোথায়? উত্তরোত্তর অধোমুখেই লোককে ধাবিত হইতে হয়! গৃহস্থালীতে

নিয়োজিতা থাকিলেও, মিত্রজ-গৃহিনীর সংসারের প্রতি আর সে আস্থা রহিল না। এক্ষণে স্বামী ও দুহিতার জীবদ্দশায় নিজের মৃত্যু কামনা করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান, ভক্তের মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না! পতিতপাবনের শরণে যিনি যে ভাবে আপন মর্ম্মব্যথা জ্ঞাত করেন, জগৎপতি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন। ধরণীতে পাপের স্রোত, অজস্র প্রবাহিত। সে স্রোতে ভাসিয়াও ধর্ম্মানুষ্ঠানে যিনি প্রবৃত্ত থাকেন—ভূতভাবন তাঁহারই মুখ চাহিয়া সে পরিজনবর্গের অভাব দূর করেন; কিন্তু ভ্রম-পথে অগ্রসর হইলে, সে সংসারের অবনতি অনিবার্য্য। এরূপ অবস্থায় ভক্তের প্রতি অনুগ্রহনিবন্ধন ভগবান সেই পাপসংসর্গ হইতে ভক্তকে উদ্ধার করেন। ভক্তের বেদনা ভগবানের প্রাণে বাজে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অদেয় কিছুই নাই। সাধ্বীসতী কমলা সংসারাশ্রমে লিপ্ত থাকিয়াও ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিতপদ হন নাই, সেই পাপে করুণানিদান, কমলার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিলেন, বিসূচিকা-বেশে দেবদূত নকেশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিল। ধর্ম্মপরায়ণা কোমলস্বভাবা কমলা, দেবদূতের স্পর্শে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা হইতে সত্বর মুক্তি পাইলেন। ইতঃপূর্ব্বেই সতী, সংসারে বীতানুরাগা হইয়াছিলেন! রোগাক্রান্তা কমলা তখন প্রাণে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। বাহ্য কষ্ট থাকিলেও তাঁহার আন্তরিক ভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। সাধ্বী, মৃত্যুর দারুণ যন্ত্রণায় ব্যথিতা হইলেন না। আসন্নকাল উপস্থিত জানিয়া, তাঁহার অন্তরাত্মা আনন্দে যেন উচ্ছ্বলিত—সে প্রীতি, সে শান্তি—সতীর সহাস্যবদনে প্রকাশ পাইল।

নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ সতীদেহ শয্যাশায়িত। এ বীভৎস দৃশ্যে বকেশ্বরের চিত্ত চঞ্চল হইল। আশা ভাঙ্গিল বটে, তথাপি কমলা ইহজীবনে যিন্ড়ার

দিয়া জন্মের মত যে বিদায় লইতেছেন, গৃহস্বামীর মনে ক্ষণমাত্র সে চিন্তার উদয় হয় নাই। পত্নীর অসুখ, বুঝিয়া তিনি কবিরাজের সন্ধানে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। পতিপ্রাণা কমলা, স্বামীকে স্থানান্তর যাইতে দেখিয়া, একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র।

জননীর পীড়া সঙ্কটাপন্ন—পূর্ণ-যৌবনা রাধামতির সে জ্ঞান নাই। দুই একবার সে, মাতৃসমীপে বসিল; কিন্তু, সে উপবেশনেও সে সুস্থিরা নহে। চঞ্চলস্বভাবা, গৃহান্তরে যাতায়াত করিতেছিল। পতিপ্রাণা কমলা একাকিনী পীড়ার যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বকেশ্বর, বৈদ্য-সমভিব্যাহারে বাটী ফিরিলেন। চিকিৎসক, নাড়ীপরীক্ষায় কমলার অন্তিম অবস্থা জানিয়া কোন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন না। প্রিয়তমার মুমূর্ষুকাল জানিয়া বকেশ্বরের হৃদয়ে শোকের উচ্ছ্বাস বহিল। মাতার দুর্দশা বুঝিয়া রাধামতি কাঁদিল। তাহারা উভয়ে সংসারের আবর্জনা এবং কমলা গৃহ-লক্ষ্মী, এক্ষণে উভয়ের এই চৈতন্য আসিল; কিন্তু, সে মনঃক্ষোভপূরণের আর সময় কোথায়? গৃহিণীর লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি, ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইল। নাড়ী, পূর্ব্বেই ক্ষীণ হইয়াছিল, এক্ষণে অধিকতর ক্ষীণ হইল। গৃহিণীর নেত্র-প্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। পিতাপুত্রী, কমলার এই শোচনীয় ভাব দেখিয়া, হৃদয়োচ্ছ্বাসনিবারণে অক্ষম হইলেন; উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

সে সময়ে কেহই জাগ্রৎ নাই। গম্ভীরমূর্ত্তিধারণে ত্রিযামা, মর্ত্তবাসীর উপরে আধিপত্য করিতেছিলেন। সংসার নীরব নিস্তব্ধ। পেচক শৃগাল-প্রভৃতি নিশাচরদের বিকট চীৎকারে, সময়ে সময়ে সে শান্তি ভঙ্গ হইতেছিল। মর্ত্তের এই বিকৃত দৃশ্য; নভোদেশে নিশানাথের অদর্শন। নক্ষত্র-নিকর, মৃদুমন্দ কিরণধারায় ভূলোকে ক্ষীণালোক প্রদান করিতেছে। পথ-ঘাট লোক-শূন্য, জনপ্রাণীর সমাগমহীন, চতুর্দ্দিক্ প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন, বৃক্ষ-

লতাদিতে খদ্যোতপুঞ্জ, এবং একবার পুচ্ছ বিস্তারে প্রভা বিকীর্ণ করিতে-ছিল; কিন্তু সে রশ্মি, নিষ্প্রভ—ক্ষণস্থায়ী!

পিতা ও কন্যা, রুগ্নার শেষ অবস্থা তখন বিলক্ষণই বিদিত। কমলার পিপাসাবৃদ্ধিতে রাধামতি, মাতার মুখ চাহিয়া ক্ষণে ক্ষণে ছোট চামুচ দিয়া মুখে জল দিতেছেন। বক্কেশ্বর ও রাধামতি নিস্পন্দভাবে অবস্থিত, এমন সময়ে মিত্রজের বহির্দ্বারে কে যেন ডাকিল। বক্কেশ্বর, দৈবাৎ কোন উত্তর না দিয়া, অপেক্ষা করিতেছিলেন, পুনঃ পুনঃ আহ্বানে রায় মহাশয়ের কণ্ঠস্বর বুঝিয়া ব্যগ্রভাবে গৃহের বাহির হইলেন। কমলার আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়া মিত্রজ, এরূপ সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন যে, বহির্বাটীতে যাইতে অকস্মাৎ অন্ধকারে স্খলিতপদ হইয়া নিম্নে পড়িলেন। তাঁহার দক্ষিণ চরণে গুরুতর আঘাত লাগিল, কিন্তু সে যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া তিনি যাহাতে কমলার জীবন রক্ষা করিতে পারেন, সেই চিন্তায় বিহ্বল হইয়া গুরুতর আঘাতসত্ত্বেও দ্বারোদ্ঘাটনে অগ্রসর। অতিকষ্টে সদর দরজা খুলিয়া বক্কেশ্বর পরম বন্ধু রায় মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইলেন। দ্বারকানাথ জনৈক ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভৃত্যের হস্তে লণ্ঠন। সে, বাবুদের অগ্রবর্ত্তী হইল। দ্বারকানাথ, বক্কেশ্বরের সহিত বাটীর ভিতর প্রবেশকালে, সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কমলার অবস্থা শুনিয়া মনে মনে বিষণ্ণ হই-লেন। যে গৃহে পতিব্রতা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, রায় মহাশয়কে লইয়া বক্কে-শ্বর সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। পতিপ্রাণা, দ্বারকানাথকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপসদৃশ আনন্দে চাহিয়া দেখিলেন। সে সময়ে সতীর পীড়ার যেন কিঞ্চিৎ উপশম দেখা দিল! কিন্তু তখন কমলার কণ্ঠরোধ হইয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে বিকৃত কণ্ঠস্বরমাত্র শ্রুত হইতেছিল। কমলা ক্ষণকালের জন্য রায় মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বামী ও কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরক্ষণে তাঁহার নয়নযুগল হইতে বারিধারা নিপতিত

হইতে লাগিল। সেই হৃদয়বিদারক শোকদৃশ্যদর্শনে দ্বারকানাথ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারও নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইল। কিছুক্ষণ পরে 'গ—ঙ্গা' কথাটী ক্ষীণকণ্ঠে অস্পষ্টস্বরে কমলার মুখে উচ্চারিত হইল। রায় মহাশয়, ধর্ম্ম-পরায়ণা সতীর আসন্নকাল জানিয়া, পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় রুগ্না—গঙ্গা যাত্রায় বাসনা করিতেছেন, বুঝিতে পারিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সাধুজীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয় না, তাঁহার সে কার্য্য আশাতীত হইলেও ভগবান্ সুযোগ দেখাইয়া দেন। পতিব্রতা, পূতসলিলা ভাগীরথীতে দেহ রক্ষা করিবেন—এ সাধ তাঁহার অপূর্ণ থাকিবে কেন? কমলার অভিপ্রায় মত, বঙ্কেশ্বর তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার কথা; রায় মহাশয়কে জানাইলেন।

সহরে কোন জিনিষেরই সহসা অভাব হয় না। অর্থব্যয়ে সকলই সরবরাহ হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে, গঙ্গায় লইয়া যাইতে বাঁশ কাটিয়া খাট প্রস্তুত করিতে হয়; কিন্তু, বঙ্কেশ্বরের সংসারে লোকাভাব। রায় মহাশয়, ভৃত্যকে দ্বারবানের খাটিয়াখানি লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন।

ভৃত্য খাট লইয়া আসিতেছে, এমন সময় হেমেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল; লম্পট-স্বভাব হেমেন্দ্র, নিশাবসানে লোক-লজ্জায় দ্রুতপদক্ষেপে গৃহে আসিতেছিল। অকস্মাৎ অন্ধকারে কে একজন খাটিয়া ঘাড়ে করিয়া যাইতেছে দেখিয়া, তস্করসন্দেহে জিজ্ঞাসা করিল—"কেও?" "কেও?"। ভৃত্য উত্তর করিল, "আমি গোপাল, বঙ্কেশ্বর বাবুর পরিবারকে গঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য খাট লইয়া যাইতেছি।" পিতা বঙ্কেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত

আছেন, এ সংবাদ তিনি কিছুই জানেন না; অকস্মাৎ গোপালের মুখে বক্কেশ্বরের স্ত্রীর শোচনীয় সংবাদে হেমেন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন।

হীনচেতা হেমেন্দ্র, পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়াও স্বভাবদোষে তিনি সকলের অনাদৃত; অভাগা রমণীর প্রেম ও মদ্যপানই, জীবনে উপাদেয় জানিয়া তাহাতেই আসক্ত! গৃহে রূপবতী প্রণয়িনী, স্বামীকে সংসারের সর্ব্বস্ব জানিয়া দিবারাত্রি পতির মঙ্গলকামনা করিতেছেন, কিন্তু সেই সাধ্বী সরলার প্রতি হেমেন্দ্র মমতাহীন। যুবক আপন আমোদপ্রমোদে মত্ত হইয়া—পিতামাতা, ভাই ভগিনী, সহধর্ম্মিণী আত্মীয়স্বজন—সকলেরই আদর, স্নেহ উপেক্ষা করিয়াছেন। রাধামতির প্রতি হেমেন্দ্র একান্ত আসক্ত। মিত্রজ কন্যা এক্ষণে পূর্ণযৌবনা; কিন্তু দুরভিসন্ধিপূরণের হেমেন্দ্র সুযোগ পাইতেছে না; বক্কেশ্বরের বিপদের কথা শুনিয়া লম্পটের আনন্দ হইল। সে, মনে মনে ভাবিল, এতদিন যে রমণীর প্রণয়প্রার্থী হইয়া ব্যাকুল চিত্তে কালযাপিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে তাহাকে আয়ত্তাধীন করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়—এই রূপ স্থির করিয়া ভৃত্যের সহিত হেমেন্দ্র, বক্কেশ্বরের বাটীতে প্রবেশ করিল।

রায় মহাশয়, পুত্রকে তথায় দেখিতে পাইয়াই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু উপস্থিত বিপদে দুই চারি জন যুবকের সহায়তার প্রয়োজন ভাবিয়া, এক্ষণে কোন, দ্বিরুক্তি করিলেন না। গোপাল খাট লইয়া বক্কেশ্বরের বাটীতে প্রবেশকালে কমলার অন্তিম সময় উপস্থিত। ইতঃপূর্ব্বেই দ্বারকানাথ পল্লীস্থ দুই তিন জন ভদ্রলোককে উপস্থিত রাখিয়াছিলেন, কমলার গঙ্গালাভে ঐকান্তিক ইচ্ছা; এক্কারণ সত্বর গঙ্গাযাত্রার উদযোগ হইল। বক্কেশ্বরের জীবন-সর্ব্বস্ব—সংসারের আশ্রয়—কমলাকে অবিলম্বে পবিত্রসলিলা ভাগীরথী-তীরে লইয়া যাওয়া হইল। রায় মহাশয় অবিলম্বে বাটী হইতে সুমতি ও জনৈক পরিচারিকাকে বক্কেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বক্কেশ্বরের পাদদেশে ইতঃপূর্ব্বে যে আঘাত লাগিয়াছিল, সেই যন্ত্রণায় তিনি উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছেন; অন্য পক্ষে সহধর্ম্মিণীর আসন্ন মৃত্যুতেই তিনি শোক বিহ্বল। রায় মহাশয় ভাবিয়াছিলেন—রাধামতিকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই, মিত্রজের বাটীতে কন্যা ও দাসীকে আনাইয়া দিলেন। বক্কেশ্বরকে গঙ্গাতীরের কার্য্যাদি অবশ্য সুমাধা করিতে হইবে; অগত্যা তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইবে। একারণ তিনি বাড়ীর গাড়ী আনিতে বলিয়া পাঠাইলেন। আদেশমাত্র বক্কেশ্বরের বাটীর সম্মুখে সেই গাড়ীখানি আনীত হইল। রায় মহাশয়, বক্কেশ্বরসঙ্গে গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অন্তঃপুরে রাধামতি, সুমতি ও জনৈক পরিচারিকা ভিন্ন আর কেহই রহিল না। বহির্দ্দেশে পল্লীস্থ এক ভদ্র ব্যক্তি তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিল।

কালের বিচিত্র গতি! মুহূর্ত্তের ব্যবধানে পার্থিব ভাবের বৈলক্ষণ্য হয়। পরিবর্ত্তন, জগতের অলঙ্ঘনীয় নীতি। এইমাত্র পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত ছিল; ভীষণ নিস্তব্ধতা একাধিপত্য বিস্তার করিতেছিল; পথ ঘাটে জন-মানবের সমাগম ছিল না। সময়ের অন্তরায়ে আর সে ভাব থাকিল না—ঊষার প্রাক্কালে প্রকৃতি-রাণী সুচারুবেশে সজ্জিতা! স্বভাবসুন্দরীর সুন্দরশোভাসন্দর্শনে সে সময়ে মনঃপ্রাণ প্রফুল্ল!

মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে কমলাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়াই বাহকদিগের উদ্দেশ্য, এ কারণ তাহারা প্রাণপণে দ্রুতপদে ঊষার প্রাক্কালেই জাহ্নবীতটে উপনীত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে পতিব্রতার নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল। বাহকগণ তাঁহাকে হুগলির ঘাটে লইয়া গেলে, তাঁহার কথঞ্চিৎ জ্ঞানসঞ্চার হইল। ব্যাধি যেন সে সময়ে তাঁহার শরীরে নাই, তিনি গঙ্গাভিমুখে নয়ন ফিরাইয়া যোড়হস্তে প্রণাম করিলেন। পরক্ষণে ব্রহ্মমূর্ত্তিতে দিনমণি প্রকাশিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে জগৎ আলোকে পূর্ণ হইল; কমলাও অন্যান্য

লোকের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিলেন। ইত্যবসরে দ্বারকানাথ বক্কেশ্বর সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। কমলার অবস্থার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনদর্শনে, তাঁহাদিগের মনে কথঞ্চিৎ আশা হইল। হেমেন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য লোক, যাহারা কমলাকে গঙ্গাতীরে লইয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে স্থানান্তরে বসিয়া আমোদ-আহ্লাদে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

রায় মহাশয় ও মিত্রজ ব্যগ্রচিত্তে কমলার মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন। অকস্মাৎ পতিব্রতার শ্বাসরোধ হইল; নয়নযুগল নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। সতীর মনোরম গণ্ডস্থলে পূর্ব্ব হইতে নীলবর্ণের আভা দেখা দিয়াছিল, এক্ষণে তাহা গাঢ়তর হইল। সে বদনমণ্ডলে আর সে পূর্ব্বলাবণ্য নাই! রায় মহাশয়, সুবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি—অন্তিম সময়ে রোগীর বাহ্য লক্ষণ সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন। তিনি কমলার এই বিকৃতমূর্ত্তিদর্শনে আর নিশ্চিন্ত রহিলেন না; হেমেন্দ্রপ্রভৃতিকে তথায় আহ্বান করিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে, কমলাকে ধীরে ধীরে গঙ্গার তলদেশে লইয়া যাওয়া হইল। কমলার সংজ্ঞা নাই, গঙ্গাজলস্পর্শমাত্র সাধ্বীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। বক্কেশ্বর হতবুদ্ধি হইয়া মৃতস্ত্রীর মুখপানে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অজস্র ধারায় অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। বক্কেশ্বরের পক্ষে সংসার—জনশূন্য মরুভূমি-সমজ্ঞান হইল। দ্বারকানাথ সান্ত্বনা কারণ বন্ধুকে নানাবিধ প্রবোধ-বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন।

এ দিকে হেমেন্দ্র ও অন্যান্য লোক, কমলার সৎকারকার্য্যের উদ্যোগী হইল। সুখ-দীপ চিরনির্ব্বাপিত জানিয়া, শোকসন্তপ্ত বক্কেশ্বর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। শাস্ত্রমতে বক্কেশ্বরকেই পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর মুখাগ্নি করিতে হইল। তিনি প্রিয়তমার মুখে অগ্নি প্রদান করিতে যাইয়া এরূপ বিহ্বল হইলেন যে, অগ্নিস্পর্শে পরিধেয় বস্ত্রের অগ্রভাগ পুড়িয়া গেল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিতা জ্বলিল, বক্কেশ্বর উন্মত্তের ন্যায় অনিমেষ-

লোচনে তৎপ্রতি তাকাইয়া রহিলেন। মুখে কথা নাই, কিন্তু অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল অবিরত সিক্ত হইল। দাহ-কার্য্য সমাপনের সঙ্গে সঙ্গে সতীমূর্ত্তি ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। কমলার চিহ্নমাত্রও সংসারে রহিল না। দ্বারকানাথ, বন্ধুকে স্নানাদি করাইয়া বাটীতে ফিরিলেন। হেমেন্দ্র ও অন্যান্য সকলে পদব্রজে বকেশ্বরের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্বিগ্নহৃদয় শান্তিশূন্য, আমোদের বস্তু নিকটে পাইয়াও সে চিত্ত-চাঞ্চল্য নিবারিত হয় না, যে বিষয়ের জন্য মন উৎকণ্ঠিত, যতক্ষণ না তাহার সম্মিলন হয়, ততক্ষণ কিছু ভাল লাগে না। এরূপ চিত্ত-বৈকল্যে যদি কেহ উপহাস করে, তাহাতেও বিরক্তি বোধ হয়। আহারবিহার, আমোদ-প্রমোদ, জীবের নিত্য প্রয়োজনীয় হইলেও, সে সময়ে সে সকল সম্ভোগে তাদৃশ আস্থা থাকে না। কোলাহল-শূন্য নির্জ্জন স্থানই এ সময়ে অধিকতর তৃপ্তিপ্রদ! একাকী গৃহমধ্যে থাকিয়া যতই সেই চিন্তায় হৃদয় অভিভূত হইতে থাকে, উত্তরোত্তর ততই যেন সে চিত্তচাঞ্চল্যে শান্তি বোধ হয়। জননীকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে, জন্মের মত তাঁহার সহিত রাধামতির সাক্ষাৎ রহিত হইল, সংসারের বিঘ্নবিপত্তিতে স্নেহময়ী মাতাকে হারাইয়া রাধামতি সে আদর যত্নের প্রত্যাশায় আর কাহার মুখের প্রতি চাহিবে? কে আর তাহাকে সে মাতৃস্নেহে দৃষ্টিপাত করিবে? ক্ষুধায় আহার, পীড়ায় শুশ্রূষা, একমাত্র মাতার উপর নির্ভর, আজ সেই মাতৃধনে বঞ্চিতা রাধামতিকে কে আর সে স্নেহ আদর করিবে—রাধামতি নির্জ্জনে একমনে এই চিন্তা করিতেছেন, অজ্ঞাতসারে তাঁহার নয়নযুগল হইতে বিগলিত অশ্রুধারায় ধরাতল আর্দ্র হইতেছে। বিলাসিনী রাধামতির শরীরের প্রতি এক্ষণে আর

সে যত্ন নাই, ধূলিবিলুণ্ঠিত কুন্তলদাম ধূসরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রখানি কর্দ্দমাক্ত হইতেছে; যুবতী একাগ্রচিত্তে মায়ের দিব্য মূর্ত্তি ভাবিতেছেন, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন নাই, এই উল্লেখে রাধামতি কতই রোদন করিতেছেন! একমাত্র বাল্যসখী সুমতি, নিকটে বসিয়া তাঁহার শোকাচ্ছন্ন চিত্তের সান্ত্বনা নিমিত্ত প্রবোধ দিতেছেন। এ দিকে কামিনী হতবুদ্ধি অবস্থায় গৃহান্তরে বসিয়া আছে; সে এ শোকের দিনে গৃহিণীর জন্য ভগ্নহৃদয়ে কতই বিলাপ করিতেছে।

ললিতচন্দ্র দে দ্বারকানাথের কর্ম্মচারী, রায় মহাশয়ের মোহরারের কার্য্যে নিযুক্ত। দেখিতে কৃষ্ণাকৃতি, বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চবিংশতিমাত্র, বিষয়-কার্য্যে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও বাজারের ক্রয় বিক্রয়কার্য্যে যুবক পারদর্শী; সে, তাহাতেই সময়ে সময়ে পাঁচ সাত টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ উদার প্রকৃতি প্রভুর আশ্রয় পাইয়াও ললিত কিছুমাত্র সংস্থান করিতে পারে নাই, কীটদষ্ট কুসুমসদৃশ ললিতচন্দ্রের দুশ্চরিত্র প্রযুক্ত শ্রীবৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। দরিদ্র-সন্তান দুঃখে কষ্টে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা সঞ্চয়ে চেষ্টা করিলে, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিত; কিন্তু সেই উপার্জ্জিত অর্থ অসৎ কার্য্যে নষ্ট হইলে, তাহার উন্নতি কিরূপে হইতে পারে? ললিতচন্দ্র, হেমেন্দ্রকে সুরায় ও বেশ্যায় আসক্ত ও আমোদপ্রিয় দেখিয়া, তৎসংসর্গে মিলিয়া মনে মনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে. কিন্তু সেই সঙ্গদোষেই তাহার পার্থিব উন্নতির আশালতা চিরনির্ম্মূলিতা হইয়াছে! মূঢ়মতি ললিত কাজ-কর্ম্মে অমনোযোগী হইয়া, অসার আমোদ-প্রমোদকেই সংসারের উপাদেয় বস্তু জানিয়া তাহাতেই অনুরক্ত হইয়াছে। রায় মহাশয় তাহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ যত্ন করিতেন, কয়েক বৎসর তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, দুর্ব্যবহারবশতঃ ললিত তিরস্কৃত হইলেও, সে কর্ম্মচ্যুত হয় নাই। ললিতচন্দ্র প্রভুর আদেশানুসারে সুমতি ও পরি-

চারিকাকে বক্কেশ্বরের বাটীতে লইয়া আসিবামাত্র দ্বারকানাথ তাহাকে যোগেন্দ্র সমভিব্যাহারে কমলাকে গঙ্গাতটে লইয়া যাইতে অনুমতি করিয়াছিলেন। বাবুর কথায় ললিত, ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে তথা হইতে চলিয়া যায়।

পরিচারিকাসহ সুমতি, বক্কেশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র কামিনী-দাসীকে ভূতলশায়িনী হইয়া রোদন করিতে দেখেন, তাহাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই রাধামতির সাক্ষাতে এদিক্ ওদিক্ অনুসন্ধানে প্রিয়সখীর সাক্ষাতে, তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়াই অধোবদনা হইলেন। বাল্যকালাবধি রাধামতির সহিত সুমতির আলাপ পরিচয়; একের সুখদুঃখে অপরে সমভাগী। রাধামতি, জননীর শোকে একান্ত বিহ্বলা, তাহার নয়নযুগল অশ্রুধারায় পূর্ণ, বদনমণ্ডল আরক্তিম—উন্মাদিনী অবস্থাপন্না। সুমতি প্রিয়সখীর এরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া, তাঁহার নয়নাসারে আপনার অশ্রু মিশাইলেন। বহুক্ষণ রোদনের পর, সুমতি, অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থা হইয়া রাধামতিকে সান্ত্বন করিতে সযত্না হইলেন। তিনি বলিলেন—"সংসার অনিত্য। পিতা মাতা কাহারও চিরস্থায়ী নহে। জন্মের সহিত মৃত্যু অবধারিত। শোকতাপ বৃথা, মাতার সহিত ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না। আত্মীয়স্বজন লইয়া লোক, সংসারে আমোদপ্রমোদে কালক্ষেপ করে সত্য বটে, কিন্তু তাহা কয় দিনের জন্য? কঠোর কালশাসনে পীড়িত হয় নাই, সংসারে এমন কে আছে?" এইরূপ বিবিধ প্রবোধবাক্যে রাধামতির শোকাবেগসংবরণার্থ সুমতি চেষ্টা পাইলেন। রাধামতি জননীর বিরহশোকে নিমগ্না; যতই মাতার বিষয়ে চিন্তা করেন, উত্তরোত্তর তাঁহার শোকাবেগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

সুমতির পুনঃ পুনঃ আশ্বাসবাক্যে রাধামতি পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থির হইল; কিন্তু নবীন শোকোচ্ছ্বাস এককালে বিদূরিত হইবার নহে। রাধা-

মতি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। যে সুমতি, রাধামতির জীবন-সঙ্গিনী, একের অদর্শনে অন্যে উৎকণ্ঠিতা; বাল্যাবধি যে উভয়ের একত্র আহার বিহার; মনোগত ভাব যে দুইজনার পরস্পর অজ্ঞাত নহে, আজ সেই সুমতি, রাধামতির সান্ত্বনায় চেষ্টিতা—তথাপি তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিতে পারিতেছেন না! বিষম শোক-সাগরে নিমগ্না রাধামতি, সুমতির নিকটে বসিয়া আছেন, কোন কথা নাই, বার্ত্তা নাই; নয়নজলে ধরাতল সিক্ত হইতেছে। এমন সময়ে হরিধ্বনি করিয়া রায় মহাশয় ও বক্কেশ্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হেমেন্দ্র ও অন্যান্য ব্যক্তিগণও তথায় আসিয়া পৌঁছিল; তাহাদের আগমনে পুনরায় রোদনের রোল উঠিল। সকলেই কমলার শোকে অভিভূত, ম্রিয়মাণ;—কাহারও মুখে হা হতাশ ভিন্ন অন্য কথা নাই, সকলেই নিস্পন্দ ও সজল-নয়ন! অশ্রুধারা বিগলিত না হইলেও কমলার সচ্চরিত্রতা ও অন্যান্য সদ্-গুণের উল্লেখ করিয়া সকলেই আক্ষেপ করিল। নিরানন্দ যেন পূর্ণ মূর্ত্তিতে মিত্রজ মহাশয়ের বাটীতে বিরাজ করিতে লাগিল, সকলেই ক্ষুণ্ণমনে, অধো-মুখে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিল।

দ্বারকানাথ অন্যান্য লোকের মত কিছুক্ষণ বিলাপ করিয়া, সৎকার করিতে যাহারা গঙ্গাতীরে গিয়াছিল, তাহাদিগের জলযোগের উদ্যোগ জন্য ভৃত্য গোপালকে আদেশ করিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় সে, সকলের জলখাবা-রের ব্যবস্থা করিয়াছিল। পল্লীস্থ যে দুই তিন জন কমলার সৎকারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল, তাহারা মিষ্টমুখ করিয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিল। রায় মহাশয়, হেমেন্দ্রকেও বাটী পাঠাইয়া দিলেন। এক্ষণে তিনি, ললিত, গোপাল ও বক্কেশ্বর তথায় উপস্থিত। বক্কেশ্বর দক্ষিণপদে যে গুরুতর আঘাত পাইয়া-ছিলেন, এক্ষণে সেই ব্যথায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রিয়তমার বিরহ-শোকে যে বেদনা তাঁহার এতক্ষণ অনুভূত হয় নাই। যন্ত্রণায় অধীর হইয়াও

সেই কষ্ট সংগোপন করিয়া এতক্ষণ ছিলেন। দ্বারকানাথ, বক্কেশ্বরের অবস্থা বুঝিয়া ললিতকে জনৈক চিকিৎসক আনিতে বলিলেন। রাধামতি তখনও মধ্যে মধ্যে বিলাপ করিতেছেন, সুমতি পুনঃ পুনঃ আশ্বস্ত করিয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছেন না। রায় মহাশয়ের প্রবোধবাক্যে রাধামতি স্নান করিয়া এক বাটী চিনির সরবৎ গ্রহণ করিলেন, রাধামতিকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া দ্বারকানাথ বক্কেশ্বরকে জল খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তৎপরে উভয়ে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়া বহির্বাটীতে আসিলেন।

এ দিকে ললিতচন্দ্র জনৈক ডাক্তার সহ আসিয়া পৌঁছিল। চিকিৎসক, বক্কেশ্বরের আহত স্থান পরীক্ষা করিয়া, ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন ও দুই চারি দিবসেই বেদনার উপশম হইবে জানাইয়া—দর্শনী প্রাপ্তে বিদায় লইলেন। বক্কেশ্বরের মনে এতক্ষণে রাধামতির জন্য বিষম ভাবনার উদ্রেক হইল। দ্বারকানাথ তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কন্যার শ্বশুরালয়ে এই শোচনীয় সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তদনুসারে বক্কেশ্বর, চন্দ্রনাথকে একখানি পত্র পাঠাইলেন।

সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। যে কমলা বক্কেশ্বরের সংসারে একমাত্র অবলম্বন, যাঁহার সদাচারে দুঃখকষ্টে মিত্রজ মহাশয়ের গৃহে একদিনও কষ্ট হয় নাই, সেই গৃহলক্ষ্মী পতিপুত্রীকে অনন্ত বিষাদ-সমুদ্রে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। সংসারের মূলবন্ধন ছিন্ন হইলেও মিত্রজ কি উপায়ে রাধামতির কোন কষ্ট না হয়, সংসারধর্ম্ম বজায় থাকে, সহধর্ম্মিণীর শোকতাপ ভুলিয়া এক্ষণে সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইলেন। রায় মহাশয়, রাধামতি ও বক্কেশ্বরের আহারাদির যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গোপালকে তথায় থাকিতে বলিয়া, দাসীসহ সুমতিকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। বক্কেশ্বর ও রাধামতি একত্র বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কামিনী রাধামতির শ্বশুরালয়ে শোক-

সংবাদ লইয়া গিয়াছে। ললিত, ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কেশ্বরের বাটী হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যতক্ষণ দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ, ততক্ষণ শরীরীর সংসার সম্বন্ধ। পিতামাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা ভাই ভগিনী, প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন মিলিয়া সুখ দুঃখে দিনাতিপাত হয়, কিন্তু চিরনিদ্রায় নিমগ্নের সঙ্গে সঙ্গে আর কাহারও সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। মৃত্যুর সময়ে পরিজনবর্গ বন্ধু-বান্ধব একবার শোকধ্বনি করিয়া উঠিল, স্নেহমমতায় বিচলিত হইয়া দুই একজনমাত্র ম্লানভাবে বিষণ্ণ বদনে কালক্ষেপ করিল; কিন্তু কালের অন্ত-রালে সে শোকের হ্রাস হইয়া যায়। কালক্রমে যদিও প্রিয়জনের বিরহ-জনিত শোকে হৃদয় উদ্বেলিত হয় বটে, কিন্তু তাহা কয় দিনের জন্য? যদি প্রিয়জনবিরহে কাতর হইয়া সুদীর্ঘকাল লোক শোকাচ্ছন্নাবস্থায় যাপন করিত, তাহা হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার এ মায়াপুরী কেন? জীবের হৃদয়কন্দরে ভগবান্ যে মায়ামোহের সঞ্চার করিয়াছেন, সেই মোহিনী মায়ায় অভিভূত হইয়া সাধের সামগ্রীকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া সকলেই পুনরায় সংসার পাতিতে প্রবৃত্ত কেন?

পতিগতপ্রাণা কমলা পতির মনে যাহাতে কোন প্রকার কষ্টের উদ্রেক না হয়, সাধ্বী, একাগ্রচিত্তে সেই বিষয়ে যত্নবতী ছিলেন। এক্ষণে বঙ্কে-শ্বরের সেই জীবনসর্ব্বস্ব সংসারে ধিক্কার দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মিত্রজ আপনার অবস্থা সবিশেষ জানিয়াও মোহিনী মায়ায় দিনে দিনে সাধ্বীর কথা বিস্মৃত হইতেছেন। রাধামতি, কমলার আদরের নিধি, মাতৃস্নেহে সুখস্বচ্ছন্দে তাঁহার এতাবৎকাল কাটিয়াছে—সে স্নেহ ভুলিতে বসিয়াছে।

রাধামতিকে গৃহস্থালীশিক্ষা দেওয়া স্নেহপরায়ণা কমলার ধর্ম্ম। নয়নপুত্তলী হইয়া সাংসারিক কাজ কর্ম্মে রাধামতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই। সংসার-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া মাতা কন্যার সুখ সম্পাদন করিয়াছিলেন। কেহ রাধামতির নিন্দা করিলে, কমলার হৃদয়ে শক্তিশেল বিদ্ধ হইত। দুহিতা মনক্ষুণ্ণ হইবে—ভাবিয়া তিনি রাধামতিকে কখনও তিরস্কার করেন নাই। সংসারের সেই শান্তিময়ী—স্নেহের জননীকে জন্মের মত বিদায় দিয়া রাধামতি সকল সাধাহ্লাদে বঞ্চিতা হইয়াছেন, জানিয়াছেন—সে আদরযত্ন ইহজীবনে আর পাইবেন না, তথাচ মানুষের প্রাণ বড়ই কঠিন, শোকতাপ সকলই সহ্য হয়। তাই রাধামতি এখনও জীবিতা!

দুই দিবস গত হইল, কমলার মৃত্যু হইয়াছে। পিতা ও পুত্রী শোকাচ্ছন্ন থাকিয়াই কার্য্য করিতেছেন; তথাপি নিত্যপ্রয়োজনীয় সংসারচিন্তায় উভয়কেই জড়িত হইতে হইতেছে। দেহের সহিত প্রাণের যতক্ষণ সংযোগ, সংসারী মাত্রকেই অহোরাত্র আহার বিহার ও সংসার সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। মাতা, অন্ধের নয়নমণি প্রাণসর্ব্বস্ব পুত্ররত্নকে কালের কঠোর হস্তে দিয়া, সংসারের পুনঃ পুনঃ পীড়নে অব্যাহতি পায় না! যে গেল, সেই গেল। বিলাপ, আক্ষেপ, পরিতাপ, হা হুতাশ কতক্ষণের জন্য? এক যায়, আর আসে—এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই সংসার চলিতেছে। রাধামতি গৃহস্থালীতে অকর্ম্মণ্যা হইয়াও বর্ত্তমানে নিঃসহায় অবস্থায় যথাসাধ্য রন্ধনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বক্রেশ্বর, কন্যার কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন।

পিতা ও কন্যা উভয়ে মিলিয়া গৃহিণীর শ্রাদ্ধশান্তিবিষয়ে পরামর্শ করিতেছেন। কয়েকটী ব্রাহ্মণভোজন না করাইলে রাধামতি শুদ্ধা হইতে পারেন না, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতিবর্গকেও নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। দ্বারকানাথের পরামর্শানুসারে অবশ্য কার্য্য হইবে, স্থির হইল। খলাসিনী হইতে

কামিনী যথাকালে ফিরিয়াছে। তাহার মুখে মিত্রজ মহাশয়, জামাতা ও বৈবাহিকের শুভ সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। রাধামতি, কামিনীর সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

দ্বারকানাথ আদালতগৃহের কার্য্যাদি সমাপন করিয়া পূর্ব্ব দিবসমত অদ্যও অপরাহ্নে বক্কেশ্বরের বাটীতে আসিলেন। মিত্রজ তাঁহার সাক্ষাতে অন্যান্য দুই একটা কথা কহিয়াই শ্রাদ্ধের কথা উত্থাপন করিলেন। রায় মহাশয় অবস্থামত খরচপত্রের পরামর্শ দিয়া, পল্লীস্থ অপর দুই একজনকে তথায় ডাকাইয়া কি করা কর্ত্তব্য—যুক্তি করিলেন। তৎপরে মিত্রজ ও রায় মহাশয় উভয়ে পরামর্শ করিতেছেন, অপর আর কেহই নাই। এই সুযোগে দ্বারকানাথ পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া, বক্কেশ্বরের হস্তে দিলেন। বক্কেশ্বর দশ টাকা হিসাবে পনর খানি নোট পাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ টাকা কেন?" তদুত্তরে দ্বারকানাথ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "এই টাকাগুলিতেই শ্রাদ্ধকার্য্যাদি শেষ করিবেন।" রায় মহাশয়ের এরূপ বদান্যতায় মোহিত হইয়া মিত্রজ বিস্মিতমুখে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দ্বারকানাথ, বন্ধুর এই দৃশ্য দর্শনে বলিলেন, "ভাই বক্কেশ্বর! তুমি ইহার জন্য কুণ্ঠিত হইও না, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি। তোমাতে আমাতে তো প্রভেদ নাই। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, রাধামতি তোমার দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া পতিপুত্র লইয়া সুখে সংসার করে। আমাদিগের সখ্যতা যেন চিরকাল এই ভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তোমার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী ইহসংসার ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গিয়াছেন, তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত এই টাকা।" বক্কেশ্বর, রায় মহাশয়ের কথা শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া আত্মীয়স্বজনের নিকট সাহায্যপ্রার্থনায় তিনি এক সময়ে নিষ্ফল হইয়াছিলেন, দ্বারকানাথের আনুকূল্যেই সেই

বিপদ্‌কাল হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন, অদ্য সেই দ্বারকানাথই তাঁহাকে পুনরায় সাহায্য করিলেন! এই ভাবিয়া তিনি মনে মনে ভগবানের নিকট দ্বারকানাথ ও তদীয় সন্তানসন্ততির মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ, মিত্রজের এরূপ স্বগত স্তুতিবাদে বিরক্তি বোধ করিলেন এবং তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছেন, ইহাতে প্রশংসার কি আছে? এইরূপ বাক্যে আশ্বস্ত করিলেন।

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে পল্লীস্থ অন্য এক প্রবীণ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন। মিত্রজ তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণানন্তর উপস্থিত বিপদের কথা জানাইয়া তৎসম্বন্ধে অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে পরামর্শ স্থির হইল—“তিলকাঞ্চন” করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করা হইবে, তদুপলক্ষ্যে পল্লীস্থ ব্রাহ্মণ, স্বজাতিবর্গ ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হইবেন। পর দিবস প্রাতেঃ বক্রেশ্বর স্বয়ং জনৈক ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে সর্ব্বাগ্রে রাধামতির শ্বশুরালয়ে যাইলেন। তথা হইতে আসিয়া আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও পল্লীস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করা হইল।

সময় কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, নিত্য নিয়মিত আসে, যায়। যখন যাহা ঘটে, তাহাই পরে কালগর্ভে বিলীন হয়। কমলা, বক্রেশ্বর ও রাধামতির একমাত্র অবলম্বন হইলেও, আজ তিন দিবস ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। একের উপর যতক্ষণ না কোন কার্য্যের দায়িত্ব অর্পিত হয়, ততক্ষণ সে ব্যক্তি তৎসাধনে মনোযোগী হয় না। যখন বুঝে যে, সে কার্য্য তাহাকেই করিতে হইবে, অন্য কাহারও সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই; তখন একাগ্রভাবে তৎসাধনে অগ্রসর হয়। চেষ্টায় ও উদ্যমে জগতে কোন কার্য্যই দুরূহ বিবেচিত হয় না। উদ্যমশীল ব্যক্তি সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবশ্যই জয়লাভ করে। রাধামতি ও বক্রেশ্বরের তাদৃশ উদ্যম ও চেষ্টা না থাকিলেও, দায়ে পড়িয়া কতক কতক কার্য্যে উভয়েই সমর্থ হইয়াছেন। যে বক্রেশ্বর

রাধামতি কখনও সাংসারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আজি তাঁহারা সংসারী; শ্রাদ্ধক্রিয়া উদ্দেশে উভয়েই ব্যস্ত। সাংসারিক অভাবের প্রতি এক্ষণে তাঁহাদের লক্ষ্য পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালীও বুঝিয়াছেন। এক্ষণে রাধামতি পিতার সহিত মিলিয়া গৃহকার্য্যে সংযতা হইয়াছেন।

রায় মহাশয়ের আদেশমত এই কয়েক দিন ললিত, মিত্রজ মহাশয়ের বাটীতেই রহিয়াছে, সে বাজারের দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া দিতেছে। দিন সংকীর্ণ, তাহাতে দ্বারকানাথ বিচক্ষণ ব্যক্তি, যাহা প্রয়োজনীয়, তৎসমুদয়ই পশ্চাতে তিনি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেছেন। আত্মীয় কুটুম্ব দুই চারি জন বঙ্কেশ্বরের গৃহে আসীন হইয়াছেন, লোকজনের সমাগমে সে বাটীতে কোলাহল বৃদ্ধি হইয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আজ রাধামতির মাতৃশ্রাদ্ধজনিত চতুর্থীর দিন। চন্দ্রনাথ পুত্র সহ বৈবাহিকের বাটীতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি গৃহলক্ষ্মীশূন্য, সেই ভাগ্যহীন। অন্যের তাহাতে আসে যায় কি? প্রভাতের সূর্য্য, গগনভাগে উদয়ক্ষণে অগ্রদানি, ভাট, রেও প্রভৃতি অনাহুত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের আগমনে বঙ্কেশ্বরের বহির্ব্বাটী পূরিয়া গেল। লোকের সর্ব্বনাশে তাহাদিগেরই—আশা, ভরসা ও আনন্দ!

যথাসময়ে তিলকাঞ্চনব্যবস্থানুসারে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইল; উপস্থিত ভাট ফকীরগণ যথাযথ বিদায় পাইল। পর দিবসে ব্রাহ্মণভোজন ও জ্ঞাতিকুটুম্বের জলপানাদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের আহারাদির পর, রায় মহাশয়, বঙ্কেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে বসিলেন। চন্দ্রনাথ ইতঃপূর্ব্বে আহারাদি করিয়া বৈঠকখানাগৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন।

ফণীন্দ্র বিদ্যানুরাগী যুবক, বাল্যকালাবধি পাঠাধ্যয়নেই তাঁহার সময় কাটিয়াছে। তিনি নিরীহপ্রকৃতি, কাহারও সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা বা বাদবিসংবাদ বাধাইবার লোক নহেন।

ফণীন্দ্র আহারাদি করিয়া পিতার নিকটে বসিয়াছিলেন। ললিত, হেমেন্দ্র ও পল্লীর কয়েকজন যুবক একত্র মিলিয়া সেই গৃহের অন্যস্থানে বসিয়া আমোদপ্রমোদ করিতেছিল; গল্পেসল্পে বা কথাচ্ছলে এক একবার বিকট হাস্যে গৃহটী প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ফণীন্দ্রের সে সকল বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। তিনি শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন, গ্রামসম্পর্কে জামাতা; পূর্ব্বে দুই একবার মাত্র আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্য যাহারা গল্পাদি করিতেছে, তাহাদিগের সহিত তাঁহার আলাপপরিচয় হয় নাই। যদিও কখন তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও দেখিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহার স্মরণ হয় না।

অন্তঃপুরে নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদিগের আহারাদি হইয়া গিয়াছে। দুই একজন বিশেষ আত্মীয়স্বজন ব্যতিরেকে আর সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছেন। সুমতি, রাধামতির সহিত আহার করিতে বসিয়া, ফণীন্দ্রনাথের কথা লইয়া হাস্যপরিহাস করিতেছিলেন। বর্ত্তমানে বক্রেশ্বরের বাটীতে শোকচিহ্ন লোপ পাইয়াছে, সকলেই যেন আমোদ উৎসবে ব্যস্ত!

দুষ্ট লোকের প্রকৃতি স্বতন্ত্র; তাহারা অপরকে বিপজ্জালে নিক্ষিপ্ত করিতে, সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকে! হেমেন্দ্র, রাধামতির বাল্য-রূপলাবণ্যে মোহিত; এক্ষণে পূর্ণযুবতী রাধামতির রূপমাধুরী অধিকতর বিকাশ পাইয়াছে, ইত্যবসরে রাধামতির স্বামী ফণীন্দ্রনাথকে বিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সমাগত বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শ করিতে বসিয়াছেন। হেমেন্দ্র, দ্বারকানাথের পুত্র, সুকৃতি পিতার বংশধর—সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান —বংশের উজ্জ্বল রত্ন হইবার কথা! তাঁহার খ্যাতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়াই

সম্ভব; কিন্তু কুলাঙ্গার হেমেন্দ্রনাথ অসৎসংসর্গে সংশ্লিষ্ট! এ অবস্থায় তাহার সঙ্গীর অভাব হয় না। যেহেতু স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে বহু লোক তাহার পরিচিত, উপস্থিত আশা না থাকিলেও,পরিণামে কিছু হস্তগত করিবার আশায়, তাহারা হেমেন্দ্রের মন যোগাইয়া চলে। বক্কেশ্বরের বাটীতে হেমেন্দ্রের সহিত যাহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তাহারাই সেই চাটুকার শ্রেণীভুক্ত; হেমেন্দ্রের চিত্ত-বিনোদনই তাহাদিগের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

মূর্খের অশেষ দোষ! হেমেন্দ্র পিতৃদত্ত গ্রাসাচ্ছাদনে শৈশবাবধি আমোদ প্রমোদে কাটাইতেছেন, লেখাপড়া শিখেন নাই। অন্য পক্ষে কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি মাতার সর্ব্বাধিক স্নেহ প্রদর্শীত হইয়া থাকে, এজন্য পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমীপে গর্হিত কার্য্যের জন্য ভৎর্সিত হইয়াও,হেমেন্দ্র মাতার আদৃত—অত্যস্নেহই তাহার অধঃপতনের মূল। লেখাপড়া না শিখিলে—জ্ঞানের উন্নতি হয় না, হিতাহিত বিবেচনাশক্তি ব্যতিরেকে বিবেকশক্তি বিকীর্ণ হয় না। মানুষ জ্ঞানলাভের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, জ্ঞান সাহায্যে দিনে দিনে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। মূঢ় ব্যক্তির পরিণামের প্রতি আদৌ দৃষ্টি হয় না। তাহাতে হীনবুদ্ধির হৃদয়ে কু-প্রবৃত্তি সতত বলবতী! প্রবল রিপু—সুযোগ বুঝিয়া হীনচেতার উপর আধিপত্য করিতে থাকে।

মূর্খের নিকট শঠ প্রবঞ্চক বন্ধু নামে গণ্য! অসৎ সঙ্গে দিনে দিনে অজ্ঞের প্রকৃতি কলূষিত হইতে থাকে, ভদ্রাভদ্রের ভেদান্তর ভুলিয়া যান। হেমেন্দ্র রাধামতির সতীত্বে একান্ত লক্ষ্য রাখিয়াছে, আত্মীয় স্বজনের গঞ্জনা ও তিরস্কারে এতদিন তাহার মনের আশা মনেই মিলিয়াছে, উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তথাচ রাধামতি, ফণীন্দ্রনাথের উপভোগ্যা—অঙ্কলক্ষ্মী, সে সংযোগ —দুষ্টমতির প্রাণে অসহ্য। শাস্ত্রানুসারে ফণীন্দ্রনাথ রাধামতির স্বামী; স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনুরাগ—শাস্ত্রসঙ্গত, কিন্তু, সে দৃশ্য হেমেন্দ্রের নয়নশূল, এ কারণ তাঁহাকে দেখিয়া হেমেন্দ্র বিষণ্ণ! নিরানন্দে তাহার কালক্ষেপ হই-

তেছে ; নষ্টবুদ্ধি লোকের চিত্তস্থিরত্ব কোথায় ? তাহার মনে যখন যাহা উদয় হয়, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, তৎ অনুসরণে যত্ন করে। ফণীন্দ্রনাথকে পিতৃ-সমীপে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেখিয়া, হেমেন্দ্র মনে মনে বিরক্ত হইল। ফণীন্দ্রের সচ্চরিত্র—হেমেন্দ্রের মনস্তুষ্টিকর নহে,তাঁহার সদাচার—তাহার চক্ষে কখনও প্রীতিজনক হইতে পারে না, সে তাঁহাকে কোন উপায়ে আপনার দলভুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতে লাগিল। ফণীন্দ্র সাক্ষাতে হেমেন্দ্রের হৃদয় ঈর্ষানলে দগ্ধবিদগ্ধ, একারণ বন্ধুগণ সহ সে ফণীন্দ্রের অনিষ্টসাধনে এতক্ষণ স্থানান্তরে বসিয়া পরামর্শ করিতেছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

এক্ষণে হেমেন্দ্র ফণীন্দ্রকে দুর্ব্বিপাক-জালে জড়িত করিবার উপায় উদ্ভাবনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। যে কোন উপায়েই হউক ফণীন্দ্রের সহাস্য বদন নিরানন্দময় করিতে না পারিলে,হেমেন্দ্রের মন যেন পরিতৃপ্ত হইতেছে না। যুবক বন্ধুবর্গ সহ পরামর্শ করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিল যে, আমোদিনী নাম্নী তাহার যে উপপত্নী আছে, কৌশল করিয়া ফণীন্দ্রকে তথায় লইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ ; কিন্তু ফণীন্দ্রের সহিত হেমেন্দ্রের দলভুক্ত কাহারও আলাপ পরিচয় নাই। ভদ্রলোক অপরিচিতের সহিত অকস্মাৎ কোন কথাবার্ত্তার সূত্রপাতে মনে মনে কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ ও কুণ্ঠিত হয়। কেহ কাহারও সহিত আলাপ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাঁহার কথায় উত্তর দিবেন কি না, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা চিরকাল লোকের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছে,সভাসমাজে স্থান পায় না ; তাহারা কলহ বিবাদই ভাল জানে,তাহাদের পক্ষে এরূপ কার্য্য ধর্ত্তব্যই নহে। ফণীন্দ্রের সহিত কোন সুযোগে

আলাপ করিতে হইবে, এই কথার সূত্রপাত হইবামাত্র, কৃষ্ণ নামক যুবক তৎক্ষণাৎ যে স্থানে ফণীন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া বসিল এবং অনতিবিলম্বে ফণীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের বিষয় কর্ম্ম কি ?"

ফণীন্দ্র বলিলেন, "বিঃ এ, পড়িতেছি। মহাশয়ের নাম ?"

কৃষ্ণ। আমার নাম কৃষ্ণলাল শীল, পৈত্রিকসম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকি।

এইরূপ দুই চারিটী কথাবার্ত্তায় পরস্পর আলাপ পরিচয় হইল। উভয়েই উভয়ের সম্বন্ধে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হেমেন্দ্র অন্যান্য বন্ধুবর্গ সহ উহাদের কথোপকথনে দৃষ্টি রাখিয়াছিল।

ফণীন্দ্রনাথ বিদ্বান্, সরল মতি, বদান্য ও শান্ত। সংসারের জটিলতা এখনও তাঁহার সরল হৃদয়ে প্রাধান্য পায় নাই ; পার্থিব সকল বস্তুই তাঁহার নয়নতৃপ্তিকর। নরনারীর চরিত্রাঙ্কণে এখনও তিনি অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই। সংসারে সকলকেই তিনি আপনার বলিয়া জানেন, অন্য পক্ষে সকলের সহিত তাঁহার সরল ব্যবহার, অধিকন্তু অপরের ব্যবহার তিনি সরল বলিয়াই গ্রহণ করেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কের লেশমাত্র স্পর্শ করে নাই, এতাবৎকাল পিতা মাতার উপদেশানুসারে চলিয়া আসিতেছেন, লেখাপড়াই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যশোলাভ হয়, পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশংসাভাজন হইতে পারেন, সেই চিন্তায় তিনি সদাই চিন্তিত। পার্থিব ভোগবিলাসে তিনি এখনও বিমুখ।

তন্তুবায়-পুত্র কৃষ্ণ, জাতীয় ব্যবসা শিক্ষা করিলেও, তাহাকে লোকের গলগ্রহ হইয়া দিনাতিপাত করিতে হইত না। পিতা মৃত্যুকালে দুই এক খানি ভাড়াটিয়া বাটী রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই ভাড়ায় কৃষ্ণের মাতা ও পরিবারবর্গের দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত হয়। টাকা কড়ি যাহা কিছু নগদ ছিল, তাহা পিতার অবর্ত্তমানে কৃষ্ণ স্বভাবদোষে সমস্ত নষ্ট করিয়াছে, অপ-

ব্যয়ে তাহার স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। হাতে পয়সা নাই, কিন্তু অধো-গতিপ্রযুক্ত যোগেযাগে আমোদপ্রিয় ধনশালী যুবক সহ আলাপ করিয়া তাহার বিলাসভোগ সম্পন্ন হয়। এক সময়ে নিজ ব্যয়ে যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, এক্ষণে অন্যের তোষামোদে তাহা সে নিষ্পন্ন করিতে বাধ্য। কৃষ্ণ এক্ষণে ফণীন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিয়াছে, কিন্তু নিজ চরিত্র তাঁহার নিকট ব্যক্ত করে নাই। সরলপ্রকৃতি ফণীন্দ্র কৃষ্ণলালকে সজ্জন ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন।

তাহাদিগের কথোপকথনে রাত্রি নয় ঘটিকা অতিবাহিত। চন্দ্রনাথ পুত্রের পার্শ্বস্থ একটী তাকিয়ায় মস্তক ন্যস্ত করিয়া, বিরামভোগে নিদ্রিত হইয়াছেন। গ্রীষ্মকাল—বৈঠকখানার দক্ষিণ দিকের জানালা গুলি উন্মুক্ত। সে দিকে বেল, যূঁই, মল্লিকা প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষপুঞ্জ শোভিত এক বিস্তৃত ভূখণ্ড। মৃদুমন্দ সমীরণ সেই প্রফুল্লকুসুমদামের সুবাস বহনে গৃহস্থিত ব্যক্তিবর্গের ঘ্রাণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেছে। আকাশে তারকা দল বেষ্টিত সুধাকর দেদীপ্যমান, বিমল জ্যোৎস্না রাশি জানালা, দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছে। কৃষ্ণলাল, ফণীন্দ্রনাথের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় বিদেশী পুরুষ, যদি অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিয়াছেন, একবার আমাদের পথ ঘাট দেখিবেন না কি ?"

ফণীন্দ্র শ্বশুরালয়ে আসিয়া এতক্ষণ বাটীর বাহির হন নাই। মধ্যে দুই একবার পরিবেশনাদি পর্য্যবেক্ষণ মাত্র করিয়াছিলেন, পুস্তক পাঠেই তাঁহার সময় কাটে. এখানে অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকায়, তিনি কতক পরিমাণে আপনাকে অসুস্থ বিবেচনা করিয়াছিলেন। শুক্ল পক্ষের চন্দ্র কিরণে—ধরাতল আলোকিত, পথ ঘাট সমুদায়ই যেন দিবা সদৃশ দীপ্তিমান ; ঘন বৃক্ষরাজি ভিন্ন অন্ধকার অন্য কোথাও নাই। বেড়াইবার ইহাই সুযোগ ভাবিয়া, তিনি কৃষ্ণলালের কথায় স্বীকৃত হইলেন ; কিন্তু পিতা তখনও

নিদ্রিত, তাঁহার অনুমতি না লইয়া এ রাত্রিকালে বাটীর বাহির হইতে তাঁহার মন সরিল না। তজ্জন্য ফণীন্দ্র কৃষ্ণলালকে বলিলেন, "কৃষ্ণ বাবু! আমার বেড়াইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু পিতা জাগ্রত না হইলে, যাওয়া হইবে না।" এই কথা শুনিবামাত্র হেমেন্দ্রনাথ তৎসমীপে আসিয়া তাঁহাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। দ্বারকানাথ যে শ্বশুরের প্রধান সহায়, ফণীন্দ্রনাথ তাহা পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন। প্রভাতে তাঁহার সহিত রায় মহাশয়ের দেখা সাক্ষাৎও হইয়াছিল। এক্ষণে তদীয় পুত্র হেমেন্দ্র তাঁহাকে বেড়াইতে যাইতে আকিঞ্চন করিতেছেন; তাঁহার কথা না রক্ষা করিলে, শ্বশুর মহাশয় বিরক্ত হইতে পারেন, পিতাও হয়তো তাঁহাকে ভৎসনা করিতে পারেন, এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া পরিশেষে ফণীন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সুরবংশীয় সেবসার রাজত্বকালে যে সুদীর্ঘ পথ নির্ম্মিত হয়, তাহারই নাম গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোড্, ইহা বঙ্গদেশ হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এক্ষণে রেলওয়ের বিস্তারে লোকের গতিবিধি তাহাতেই হইয়া থাকে; একারণ ইদানী এই পথটীর স্থানে স্থানে অপরিষ্কার হইয়াছে। হুগলির মধ্যভাগ দিয়া এই পথ প্রসারিত। এই পথের স্থান বিশেষে যে কত শাখা, প্রশাখা প্রসারিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। হুগলির অন্তর্গত এই পথের এক চৌমাথায় একখানি পর্ণকুটীর। নয়ন-গোচর হইলেই সে গৃহ খানিকে দরিদ্রের বাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বহির্দ্দেশ হইতে শয়ন-গৃহে দৃষ্টিপাত হইলে, সহসা দরিদ্রের আবাস বলিয়া অনুমান হয় না। বহি-র্দ্বার রাত্রি কালে উন্মুক্ত, লোকজন দেখিতে না পাইলেও সহসা এই দৃশ্যে

মনের ভাব বিকৃত হয়। এখানে কি কোন ধনাঢ্য পুরুষ সংসারের প্রতি বীতানুরাগী হইয়া বাস করিতেছেন? এইরূপ মনে মনে তর্কবিতর্কের সঞ্চার হয়, কিন্তু সেই গৃহের পথ-পার্শ্বস্থ জানালায় দাঁড়াইয়া একটী রমণী পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, এরূপ বীভৎস দৃশ্যে মনে সন্দেহ হয়; রমণী জন সাধারণের গতিবিধির পথে এরূপ ভাবে চাহিয়া কেন? হিন্দুললনা অন্তঃ-পুরশোভিনী—বহির্ব্বাটীতে কি নিমিত্ত উপস্থিত! সহসা তাঁহাকে দেখিয়া উদ্বেগে ও সংশয়ে হৃদয় পূর্ণ হয়। কুলকামিনী কি কোন বিপদে পড়িয়া আত্মীয়স্বজনের আগমন প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন! এ দৃশ্যে মন বিচলিত হয়, কিন্তু তাঁহার প্রতি তাকাইয়া দেখিতে চিত্তসঙ্কুচিত হইতে থাকে, তথাপি দুই একবার দৃষ্টিপাতে গৃহস্থের গৃহে যে সকল দেখা যায়, এখানে সে দৃশ্যের যে অভাব—স্পষ্টই জানিতে পারা যায়। গৃহস্থিত আলোকরেখা কামিনীর গণ্ডস্থলে পতিত হওয়াতে তাঁহার বদনমণ্ডল গোলাপি গুঁড়ায় রঞ্জিত অনুভূত হইল; বয়সোচিত বেশভূষায় সজ্জিতা থাকিলে, তাঁহার সম্বন্ধে সহসা কোন সন্দেহই হইত না। গৃহস্থের কন্যা বা বধূ সাধারণতঃ দুই একখানা মাত্র অলঙ্কারে ভূষিতা থাকেন, পরিধানে সামান্য বস্ত্র; এই রমণীর পরিধানে যে রঞ্জিত সুচারু সূক্ষ্মবাস, তাহাতে স্ত্রীলোকটী যে সকল অলঙ্কারে বিভূষিতা, দেখিলেই অনুমান হয় সে যেন কোন ঐশ্বর্য্যাধিকারিণী এখানে ছদ্মভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, নতুবা এ কি ভীষণ দৃশ্য! রত্নেশ্বরী কেন পর্ণকুটীরে বাস করিবেন? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিবা মনে মনে সন্দেহের বৃদ্ধি হইতে থাকে।

স্ত্রীলোকটী দেখিতে তাদৃশ রূপবতী নহেন। কৃত্রিম বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া, পথিকের মনোরঞ্জন কারণ সে যে এ ভাবে অধিষ্ঠিতা, সহজেই মনে হয়। রমণী এই ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে বন্ধুবর্গ পরিবেষ্টিত হেমেন্দ্র ফণীন্দ্র সহ তথায় উপনীত হইলেন। ফণীন্দ্রনাথ স্বভাবের সৌন্দর্য্যে

কথাবার্ত্তায় বিহ্বল হইয়া আসিতেছিলেন; অকস্মাৎ এখানে সকলের গতি রহিত হইলে, তিনি সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইখানেই কি আমাদিগের বেড়ান শেষ হইল?" ফণীন্দ্রের কথা শুনিয়া, হেমেন্দ্র স্মিতমুখে সেই রমণীর প্রতি চাহিল। অসতীর কুটিল অভিসন্ধি, লোকের মনমুগ্ধ করাই তাহার উদ্দেশ্য, তাই সে রূপের ডালি বিকাশে পথের দিকে চাহিয়াছিল। হেমেন্দ্রের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে, সে মধুর কণ্ঠে বলিল, "কেন মহাশয়, জলে পড়িলেন না কি? আসুন, পান তামাক খান; অধিনীর প্রতি কি অনুগ্রহ হইবে না?" ফণীন্দ্রনাথ সে কথায় যেন শিহরিয়া উঠিলেন, তিনি কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ফণীন্দ্র রমণীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, ভাবিলেন, পরপুরুষ দর্শনে হিন্দুরমণী লজ্জায় কুণ্ঠিতা হন, এস্ত্রীলোকটী বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া, কেন এ ভাবে? আমরা ইহার সম্মুখীন হইলাম দেখিয়াও, তিনি কিছুমাত্র লজ্জিতা হইলেন না— অথচ অম্লান বদনে আমাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। এ কি বিচিত্র লীলা! এইরূপ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইল।

এ দিকে আমোদপ্রিয় হেমেন্দ্র সেই রমণীকে প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া হাস্ত পরিহাসাদি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হেমেন্দ্রের বন্ধুবর্গ সেই রমণীর গৃহে প্রবেশ করিল। হেমেন্দ্র ফণীন্দ্রনাথের নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, এক্ষণে সে তাঁহাকে সেই বাটীতে যাইবার জন্য আকিঞ্চন করিল। ফণীন্দ্র দুই একবার আপত্তি করিলেও, অবশেষে হেমেন্দ্রের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আমোদিনীর গৃহটীর আভ্যন্তরিক শোভাসন্দর্শনে নয়ন মোহিত হয়। এক পার্শ্বে একখানি পালঙ্ক, তাহাতে দুগ্ধফেণ-নিভ পরিচ্ছন্ন শয্যা, বিছানার

পার্শ্বে আনালায় নানাবিধ রঞ্জিত বস্ত্রাদি সজ্জিত, দেউলে কয়েকখানি হিন্দুদেব দেবীর মূর্ত্তি, অবশিষ্টগুলি অশ্লীলভাবোদ্দীপক; ঘরের মেজের একটা সুন্দর শয্যা সজ্জিত। ফণীন্দ্রকে লইয়া হেমেন্দ্র পারিষদ সহ নিম্নতলের বিছানায় উপবেশন করিল। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে এক প্রাচীনা পরিচারিকা তামাক দিয়া গেল। গৃহাধিকারিণী হেমেন্দ্রকে ধূমপানের জন্য বলিল। হেমেন্দ্র তামাক সেবনের জন্য তাহাকে আকিঞ্চন করায়, সে ধূমপান করিল। সে কামিনীর লজ্জা সম্ভ্রম কিছুই নাই, অম্লান বদনে নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে সকলের সম্মুখে ধূমপান করিতে লাগিল। তাহার ধূমপান শেষ হইলে, হুঁকাটী হেমেন্দ্রের হস্তে না দিয়া এককালে ফণীন্দ্রনাথের দিকে ধরিল। ফণীন্দ্রনাথ তামকূট সেবন করেন না, তথাচ ভদ্রতার অনুরোধে হুঁকাটী হস্তে লইয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ কৃষ্ণলালের হস্তে দিলেন। ফণীন্দ্র ব্যতীত আর সকলেই একে একে ধূমপান করিল। ইতোমধ্যে সেই কামিনী কয়েকটী পান লইয়া এক একটী করিয়া সকলকে বিতরণ করিল।

হেমেন্দ্র পিরাণের জেব হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া সুরা ও তদুপযোগী খাদ্য পরিচারিকাকে আনিতে বলিলেন। বেশ্যালয়ের ঈদৃশ পরিচারিকা রঙ্গরসের ত্রুটি করে না, বাবুর নিকট হইতে টাকা লইবার সময়ে সে অভ্যস্ত রসিকতা যথেষ্ট দেখাইল! বৃদ্ধাকে বাজারে পাঠাইয়া হেমেন্দ্র সকলের সহিত রসালাপ করিতে লাগিল। ধীরপ্রকৃতি ফণীন্দ্রনাথ এতক্ষণ নীরিহ ভাবে একপার্শ্বে বসিয়া তাহাদিগের আমোদপ্রমোদ দেখিতেছিলেন। অসৎ সংসর্গে কোন কথাবার্ত্তা না কহিলেও ঠাট্টা বিদ্রূপ অনেক সময়ে সহ্য করিতে হয়। তিনি এই ভাবে বসিয়া আছেন দেখিয়া, হেমেন্দ্র সেই রমণীকে বলিলেন, "আমোদ! আমরা তোমার আদর নিত্য উপভোগ করি; কিন্তু আজ আমাদের সঙ্গে এই যে নূতন বাবুটী আসিয়াছেন, ইনি কাঠের পুতুলের মত এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন, উঁহাকে লইয়া দুই একটা আমোদ-

আহ্লাদ কর। লোকটা বড় পণ্ডিত, গুণীপুরুষ। ইহার সহিত আলাপ করিলে, তোমার সুখের সীমা থাকিবে না। পুরাতনের প্রতি আদর যত্নে তোমাদের আর নূতনত্ব কি, নূতনের প্রতি নবীন সোহাগ দেখাইতে বিলম্ব কেন?"

রমণী হেমেন্দ্রের কথায় ঈষৎ হাসিয়া ফণীন্দ্রের নিকটে যাইয়া নানা প্রকার রসালাপে তাঁহাকে মোহিত করিতে চেষ্টা পাইল। ফণীন্দ্র উপস্থিত যুবকবৃন্দ ও আমোদিনীর ভাব ভঙ্গি দর্শনে ইতোপূর্ব্বেই মনে মনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অসঙ্গত আলাপে হাস্যাস্পদ হইবেন ভাবিয়া এতক্ষণ মৌনভাবেই ছিলেন। এক্ষণে স্ত্রীলোকটীর অনুনয় ও আকিঞ্চনে আপনাকে সমধিক বিপন্ন ভাবিলেন,অথচ কি বলিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না; অথচ কোন উত্তর না দিলে, কুহকিনীর কবল হইতে মুক্তি লাভের উপায় নাই—বুঝিলেন। অধিকক্ষণ নীরবে থাকিলে, অধিকতর হাস্য পরিহাসাদি সহিতে হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি অগত্যা উত্তর করিলেন, "আমার বড় মাথা ধরিয়াছে, তাই আপনার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে সাহসী হইতেছি না, ক্ষমা করিবেন। সময়ে একদিন দেখা সাক্ষাতে পরস্পর কথাবার্ত্তায় পরিতৃপ্ত হইব।" ফণীন্দ্রনাথের উত্তর প্রতীক্ষায় সকলেই উৎকণ্ঠিত ছিল, তাঁহার কথায় বিকট হাস্যের রোলে গৃহটী প্রতিধ্বনিত হইল।

এদিকে বৃদ্ধা জলীয় পদার্থ-পূর্ণ এক কাচের পাত্র ও কিছু খাবার আনিয়া দিল। হেমেন্দ্র সোৎসাহে তাক হইতে একটী কাচের গেলাস পাড়িয়া, বোতলটীর ছিপি উদ্ঘাটন করিল এবং সেই দ্রবপদার্থ গেলাসে ঢালিয়া পাত্রের প্রায় অর্দ্ধভাগ ফণীন্দ্রকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আকিঞ্চন করিল। ফণীন্দ্র কখন মদিরা দেখেন নাই, তাহার আস্বাদও অবগত নহেন। হেমেন্দ্র তাঁহাকে ইহা পান করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায়, তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন, "এ পাত্রে কি আছে? আমাকে খাইবার নিমিত্ত আপনি কেন এত অনুরোধ করিতেছেন?"

হেমেন্দ্র। ফণীন্দ্র বাবু, আপনি নিস্তেজ ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, মনে স্ফূর্তি নাই; আপনাকে আনন্দিত ও উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে এই পানীয় আনাইয়াছি, গ্রহণ করুন; কোন কষ্ট হইবে না। এই ক্ষণেই সকল জড়তা ঘুচিবে, আমাদের মত আমোদ প্রমোদ করিতে পারিবেন। দেখুন—মানুষ সংসারে কয় দিনের জন্য! যদি আমোদ আহ্লাদে দিন না কাটিবে, তবে পৃথিবীতে জন্ম ধারণ কেন? লোকে কথায় বলে, 'হেসে খেলে লওরে যাদু—কবে যাবে সিঙ্গে ফুঁকে।' লও ভাই—খাও—ধর, আর বিলম্ব কর না।"

ফণীন্দ্র। হেমেন্দ্র বাবু! আপনি যাহা আমাকে পান করিতে বলিতে-ছেন, ইহা আমি গ্রহণ করিব না, ক্ষমা করিবেন। মদে আমার চির বিদ্বেষ। শুনিয়াছি—লোকে মদ খাইয়া জ্ঞান হারায়, উৎপাত করে। সুস্থ দেহ ইচ্ছা করিয়া ব্যস্ত করা কর্ত্তব্য নহে। আপনারা আমোদ আহ্লাদ করুন, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু আমাকে সুরাপানের জন্য অনুরোধ করিবেন না। আপনি যাহা সেবন করিতে বলিতেছেন, যদি ইহা সত্যই সুরা হয়, তাহা হইলে আমাকে বিদায় দিন, আমি বাটী যাই।

হেমেন্দ্র। ফণীন্দ্র বাবু, এ কেমন কথা! আমরা কি মাতাল? আপনাকে মদ খাইবার জন্য অনুরোধ করিব কেন? আপনি এই ঔষধ অল্প মাত্রায় গ্রহণ করুন। যদি কষ্টবোধ করেন, আপনাকে ইহা খাইতে দ্বিতীয় বার আকিঞ্চন করিব না; আপনার ভালর জন্যই বলিতেছি, একবার খাইয়া দেখুন! কোন কষ্ট হয়, আর গ্রহণ করিবেন না।

ফণীন্দ্রনাথ সেই জলীয় সামগ্রী কোন মতে সেবন করিবেন না, হেমেন্দ্র কিন্তু তাঁহাকে তাহা অবশ্য পান করাইবে, উভয়েরই মনে এই সঙ্কল্প! যে

স্থলে দুর্বৃত্তের প্রতাপ অপেক্ষাকৃত অধিক, সেখানে সাধুর তর্কযুক্তি কোন ফলপ্রদ হইতে পারে না। ফণীন্দ্র অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও পাপাচারী হেমেন্দ্রের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। ফণীন্দ্র সুরার আস্বাদন কিরূপ —কিছুই জানেন না, হেমেন্দ্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ফণীন্দ্র মনে মনে তখনও ভাবিলেন যে, ইহাদিগের সহিত আমার কোন শত্রুতা নাই; অদ্য মাত্র আলাপ পরিচয় হইয়াছে, সকলকেই ভদ্রবংশজাত জানিতেছি, ইহারা কি আমাকে কোন বিপদগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়েই এরূপ করিতেছে? তিনি আপন মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, ওদিকে হেমেন্দ্র বারবিলাসিনী ও বন্ধুবর্গ সহ সুরাপানে বিহ্বল। তাহাদিগের বিকট চীৎকারে গৃহ পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইতে লাগিল। লোকে ক্ষণিক আমোদ উপভোগে সুরাবিষ সেবনে স্বাস্থ্য ও চরিত্র চিরদিনের জন্য কলুষিত করে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরালয়ে আমোদ উপভোগে ফণীন্দ্র নিমন্ত্রণ রক্ষায় আসিয়া, কি গুরুতর অন্যায় করিয়াছেন! দুরাত্মা হেমেন্দ্র তাঁহার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে। নিরপরাধী, সরলমতি ফণীন্দ্র—সেই অসৎ কৃষ্ণলালের অনুরোধ সরল ভাবে গ্রহণ করিয়া সান্ধ্যসমীরণ সেবনে ও সুশীতল চন্দ্রকিরণসিক্ত পথ ঘাট ভ্রমণে স্বীকৃত হইয়া, আজ কি দুর্বিপাকেই জড়িত হইয়াছেন! সুরা ও বেশ্যায় তাঁহার চিরবিদ্বেষ, উভয়ের মোহনশক্তির প্রভাব তাঁহার অবিদিত, কিন্তু হেমেন্দ্রের কৌশলে—তিনি আজ বারবিলাসিনী গৃহে সুধা-ভ্রমে সুরাপান করিয়াছেন। ফণীন্দ্রের মুখে কোন কথা নাই, তিনি এককালে সংজ্ঞাহীন। ফণীন্দ্রের দেহ অবসন্ন, যন্ত্রণায় হৃদয় ছিন্ন-ভিন্ন, এক একবার বমনে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করিতেছেন, কিন্তু সে শান্তি ক্ষণস্থায়ী— মুহূর্ত্তে মাথার যন্ত্র-

নায় অস্থির হইতেছেন! তিনি কে এবং কোথায় আছেন, কোন সংস্রবে মিলিয়া তাহার এ দুর্দ্দশা, ফণীন্দ্রের সে জ্ঞান নাই। সংসার তাঁহার পক্ষে শূন্য—জ্ঞান হইতেছে, কখন উঠিয়া বাহিরে যাইতে চেষ্টা—কখন বা বসিয়া থাকা অসহ্য বোধে শয়ন করিয়াও সে কষ্টে ফণীন্দ্রের উপশম হইতেছে না। এক ভাবে ক্ষণকাল যাপন করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছে, এক এক বার আপন মনে উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছেন, পরক্ষণে তাঁহার চৈতন্য লোপ পাইতেছে।

রাত্রি সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময়ে হেমেন্দ্র ফণীন্দ্রকে লইয়া সেই নরককুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিল, এক্ষণে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে; পথ-ঘাট লোক শূন্য, নির্জ্জন। শান্তিময়ী নিদ্রাদেবী ধরাতলে একাধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। জীবজন্তু সকলেই নিস্পন্দ ও নীরব, গগনমণ্ডলে তারকাপুঞ্জসহ শশধর বিমল কিরণ-ধারায় দীপ্তি পাইয়া, লম্পট নিশাচরদিগের গতাগতির পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। রজনীই দুশ্চরিত্রের মন্তব্য-সাধনের উপযুক্ত সময়। লোকের অগোচরে দুষ্টমতি দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করনে, এদিক্ ওদিক্ যাতায়াত করে, সে গতিবিধি লক্ষ্য করিতে কেহ জাগ্রত নাই। পাপমতি হেমেন্দ্র সুরাপানে ও বরাঙ্গনা সহবাসে যে শরীরনষ্ট ও স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতেছে, তাহাতে দুঃখ কি, কিন্তু নিরপরাধী নিষ্কলঙ্ক ফণীন্দ্রের আজ কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। হেমেন্দ্র কোন সুযোগে ফণীন্দ্রনাথকে অপদস্থ করিবে, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াই তাঁহাকে বেশ্যালয়ে আনিয়া মদ্যপান করাইয়াছে। এক্ষণে ফণীন্দ্রকে বিকৃত অবস্থা দেখিয়া হেমেন্দ্র আনন্দে বিহ্বল। অন্য পক্ষে ফণীন্দ্র জ্ঞানশূন্য, অচৈতন্য অবস্থায় ভূতলের এক পার্শ্বে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছেন।

এ দিকে চন্দ্রনাথ নিদ্রাভঙ্গে পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া, মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইলেন। ভাবিলেন, অন্তঃপুরে ফণীন্দ্রনাথ শয়ন করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে কল্পনা অবিলম্বে দূর হইল, যেহেতু তদ্দণ্ডে বক্কেশ্বর তাঁহার,

সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফণীন্দ্রনাথ কোথায় ?" চন্দ্রনাথ বৈবাহিকের প্রশ্ন শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, ভয় ও বিস্ময়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "বক্কেশ্বর বাবু! এ কেমন কথা ? আমার পার্শ্বে যে ফণীন্দ্র বসিয়াছিল, সে কোথায় যাইল ?"

বক্কেশ্বর। চন্দ্রবাবু! আমিও তো তাই আশ্চর্য্য হইয়াছি।

চন্দ্রনাথ বক্কেশ্বরের কথায় উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, আমি যখন বিশ্রাম করি, সেই সময়ে কয়েকজন যুবা এই গৃহের স্থানান্তরে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এখন তাহারা কোথায় ? তাহাদের সঙ্গে কি ফণীন্দ্র গিয়াছে ? সে সুবোধ, ধীর—আমার অনুমতি না লইয়া সে কোথাও যায় না! আমি দেখিতেছি, বড় বিপদেই পড়িলাম—এখন উপায় ?"

বক্কেশ্বর ও চন্দ্রনাথ ফণীন্দ্রের জন্য উভয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে গোপাল আসিয়া উপস্থিত হইল। মিত্রজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফণীন্দ্রের সন্ধান জন্য আদেশ করিলেন। গোপাল অবিলম্বে তৎসন্ধানে গৃহত্যাগ করিল। বৈবাহিকদ্বয় ফণীন্দ্রের আগমনপ্রতীক্ষায় বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাধারাণীও আত্মীয় স্ত্রীলোক সহ অন্তঃপুরে স্বামীর অপেক্ষায় জাগ্রত থাকিল। মিত্রজ মহাশয়ের গৃহে সে রাত্রি কাহারও নিদ্রা হইল না; ভাবনা চিন্তাতেই সারা রজনী কাটিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সংসারে সুখী কে ? দরিদ্র গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়সঙ্কুলনে দিবারাত্রি চিন্তাকুল; মধ্যবিত্ত, অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতিসাধনে ভাবিত; ধনশালী বিলাসভোগ-বাসনায় চিত্তশান্তি বিসর্জ্জন দিয়া সদাই উৎকণ্ঠিত! বাস্তবিকই প্রকৃত সুখ সংসারে দুর্লভ। মনুষ্যের অভাব যতক্ষণ না পূরণ হয়, ততক্ষণ

শান্তি নাই। মায়ামরিচীকাময়ী আশাদেবী নরনারীর জীবনসঙ্গিনী; অসার আশায় আশ্বাসিত হইয়া, সাংসারিক ঘাতপ্রতিঘাতেও লোকে কার্য্যক্ষেত্রে অকুতোসাহসে অগ্রসর। সুখ-দুঃখ-বিজড়িত সংসারে একে অন্যের মুখাপেক্ষী! অপত্যস্নেহে সে ভাবের ভাবান্তর, সে স্নেহ—নিঃস্বার্থ, পুত্র-কন্যা সময়ে যে সহায়তা করিবে, সে আশায় তাঁহাদের নির্ভর নহে! ভগবৎ প্রেম পিতামাতার হৃদয়ে বাৎসল্যভাবে বিকাশ, সে জন্য তাঁহাদের প্রাণপণে সন্তানসন্ততির লালনপালন ও মঙ্গলকামনা। তাই ভগ্নী, পুত্র কন্যা, বন্ধু কলত্র আর যে কেহ আপনার ভাবে গ্রহণ করে, সে ভালবাসার প্রতিদান লক্ষিত হয়; কিন্তু পিতামাতা প্রত্যুপকারপ্রার্থী নহেন। সংসারীর আসক্তি—আশা, সে আশার নৈরাশ্যে সংসারীর জীবন মরণ একই কথা। আজ যে ভাবে দিন কাটিতেছে, সময়ে ইহাপেক্ষা উন্নত হইলে, জন-সমাজে গণ্য মান্য ও আদর পাইবে, এই আশায় ভিত্তিস্থাপন করিয়া জীবন চলিয়াছে। উপস্থিতে কোন অভাব না থাকিলেও, আশার কল্পিত অভাবে আমরা হৃদয়কে ব্যাকুল করি। ভগবান্ তুলাদণ্ডের পরিমাণে নরনারীর সুখদুঃখ বিধান করেন। ভরণ-পোষণের অভাব ঘুচিলে, বিলাসভোগ জনিত দুঃখ আসিয়া চিত্তসুখের লোপ করে। লোকাচার, সমাজরক্ষা প্রভৃতি বন্ধন-প্রবাহে জীবন ভাসমান, তৎপ্রতি সম্যক্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অভাবে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা! আসক্তি বশে মানুষ সংসার আশ্রমে বদ্ধ। একের কারণ তাই অন্যে চিন্তাকুল। প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রিয়জনের মনস্তুষ্টি উদ্দেশ্য! কিরূপে সে আমার সুখে থাকিবে, কি করিলে তাহার সাংসারিক অভাব ঘুচিবে, এই ভাবনায় অহোরাত্র ভাবিত। একের সহাস্য বদন দেখিয়া, তাই অপরের হৃদয় আনন্দরসে অভিভূত। সে ভালবাসায় পার্থিব সকল সুখই তুচ্ছ বিবেচিত হয়, তখন সংসারের ভালমন্দে লক্ষ্য থাকে না। হৃদয়-মন্দিরে যাহার প্রিয়মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারই সুখ বিধানে তন্ময়; প্রণয়ের

এ কি বিচিত্র গতি! যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে অবশ্যই আপনার বলিয়া গ্রহণ করে; এই বদ্ধসংস্কারে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতেও নরনারী প্রফুল্লচিত্তে দিনযাপন করে।

হেমেন্দ্রনাথের কুমার বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। পিতা সঙ্গতিপন্ন; লেখাপড়ায় উন্নত না হইলেও, তাহার বিবাহের ভাবনা কি? কন্যা সুখস্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিবে, ভরণপোষণের কষ্ট পাইবে না, অনেকে এই দৃঢ় বিশ্বাসে ধনাঢ্যের পুত্রকে জামাতৃপদে বরণের কামনা করেন। বরকর্তার অপেক্ষা কন্যা পুত্রবধূ করিতে ইচ্ছা। এই অভিপ্রায়ে পিতা পুত্রের যৌবনপ্রারম্ভে বিবাহ দিতে উৎসুক হন। রায় মহাশয় সন্ধান লইয়া মনের মত সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী মনোরমা কন্যাকে কনিষ্ঠ পুত্রবধূ করিয়াছেন। তিনি মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কিছুদিন পরে, জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনাথের বিবাহ দিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার অবস্থারও তাদৃশ সচ্ছল ছিল না; পুত্রও মধ্যবাঙ্গালা-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে মাত্র অধ্যয়ন করিতেছিল। এ কারণ দ্বারকানাথ সে সময়ে গৃহস্থের কন্যা গৃহে আনিয়াছিলেন।

বিদ্যানুরাগী মহেন্দ্র দিনে দিনে উন্নতি লাভ করিয়াছেন; পিতার অবস্থার প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল। বিষয় চিরস্থায়ী নহে, জ্ঞানোপার্জ্জনই প্রধান কার্য্য—তিনি বুঝিয়াছিলেন। আপনার অকৃতিত্বের প্রতি দৃষ্টি থাকায়, কি উপায়ে মহেন্দ্রনাথ সংসার চালাইতে সক্ষম হইতে পারেন, নিরন্তর সেই চিন্তায় চিন্তিত থাকিতেন। তিনি পিতার দীনাবস্থায় যে ভাবে কালক্ষেপ করিয়াছেন, এখনও সেই ভাবে কাটাইতেছেন। অন্যপক্ষে জ্ঞানালোকে তাঁহার হৃদয় আলোকিত।

পিতার উন্নতির সূত্রপাতে হেমেন্দ্রের জন্ম। আজ্ঞাবাহী দাসদাসী তাহাকে লালন পালন করিয়াছে, অধ্যয়নকালে বাটীতে শিক্ষক নিযুক্ত,

যাহাতে তাহার কোন বিষয়ে অভাব না হয়, দ্বারকানাথ ও মহেন্দ্র তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। অভাগা হেমেন্দ্র লেখাপড়ায় মনোযোগী হইলে, অবশ্য সময়ে মহেন্দ্র অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিতে পারিত। কেহ কেহ দুঃখে কষ্টে, পরের মুখাপেক্ষী হইয়া পুস্তকাদির সংগ্রহ করিয়া একাগ্রচিত্তে বিদ্যোপার্জ্জন করে; আর কেহ বা সঙ্গতি সত্ত্বেও অবিমৃষ্যকারিতাদোষে অসার আমোদে মত্ত হইয়া, আপনার উন্নতির পথে কণ্টকারোপ করে। হেমেন্দ্রের অদৃষ্টে সেই অধোগতিই ঘটিয়াছিল।

সংসারে গুণেরই আদর। গুণবান্ লোকের প্রতি সকলেই স্নেহ-নয়নে দৃষ্টিপাত করে। যাহার গুণ নাই, পিতার মান-সম্ভ্রম বশতঃ অনুগত ব্যক্তি তাহার যথাযথ সমাদর করিলেও, সমাজে তাহার নাম হয় না। মহেন্দ্রনাথ ধনাঢ্যের সন্তান, তাহাতে সুপণ্ডিত; দিনে দিনে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে। হেমেন্দ্রনাথ যৌবনাবস্থায় আমোদ-প্রমোদে সংসর্গ-দোষে কলুষিত, সকল লোকেই তাহাকে ঘৃণা করে। মৃণালে কণ্টক, কুসুমে কীট, ফণীর মণি, এই বিষম বৈচিত্র্যে ভাবুকের হৃদয় যেমন মথিত, হেমেন্দ্রের কারণ সেইরূপ রায় পরিবার সকলে ব্যথিত। জনসমাজে মহেন্দ্রনাথের সুখ্যাতি। পুত্রের পরিচয়ে পিতামাতার চিত্ত প্রফুল্ল; কিন্তু সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হইলেও মহেন্দ্র মনের সুখ লাভ করিতে পারেন নাই; সহধর্ম্মিণীর কুৎসিত প্রকৃতির জন্ম তিনি মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন। মহেন্দ্রপত্নী চপলা একান্ত মুখরা ও গর্ব্বিতা, মহেন্দ্র তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাকে ত্যাগ করিলে, সমাজে নিন্দনীয় হইবেন। তাহাতে চপলার গর্ভে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছে। মহেন্দ্র সকলকেই ভাই ভগ্নী জ্ঞান করিতেন, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রযুক্ত, সেই মুখরা স্ত্রীকেই আদরিণী ভাবিয়া, যথেষ্ট স্নেহ যত্ন করিতেন ও ভালবাসিতেন।

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র-বধূ আপনাকে নির্দ্দোষী জানিয়া অন্যকে স্বার্থ-

পর সিদ্ধান্ত করিতেন, শ্বশুর শাশুড়ী সরলহৃদয় হইলেও, তাঁহাদিগের প্রতিও চপলার শ্রদ্ধাভক্তি বা বিশ্বাস ছিল না, তিনি সংসারে স্বীয় পুত্র-কন্যাকেই কেবলমাত্র আপনার বলিয়া জানিতেন। স্বামী তাঁহার কথামত সকল কার্য্য করিতেন না, এ কারণ তিনি কখন চিত্তশান্তি লাভ করিতেন না। মহেন্দ্র-নাথ স্ত্রীকে উপদেশ বাক্যে সান্ত্বনা করিতেন, আদর যত্নে রাখিতেন, কিন্তু চপলার সে বিকৃত চরিত্রের কিছুতেই সংস্কৃত হয় নাই। গৃহিণী হইতে পরি-চারিকা পর্য্যন্ত সকলের সহিত তাঁহার বাদবিসম্বাদ ; স্বামী সারাদিন পরি-শ্রম করিয়া রজনীযোগে যে সুখে নিদ্রা যাইবেন, চপলার জন্য মহেন্দ্রের সে সুবিধা ও ঘটিত না। মহেন্দ্র স্ত্রীর প্রতি একান্ত আসক্ত, কখন স্ত্রীর প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করেন নাই। আদর সোহাগেই মহেন্দ্রের পত্নী এক্ষণে মুখরা ও গর্ব্বিতা হইয়াছেন, এখন প্রতিকারের আর উপায় কি? মহেন্দ্রনাথ ভার্য্যার চরিত্র সবিশেষ বুঝিয়াছেন, কিন্তু স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষের ফল আস্বা-দনে কটু হইলেও, এক্ষণে উচ্ছেদ সাধনে অশক্ত! সর্ব্বগুণে গুণান্বিত লোক জগতে বিরল। মহেন্দ্রনাথের চরিত্রে দোষ নাই, সমাজে সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রৈণতা প্রযুক্ত গৃহে তাঁহার ভিন্ন মূর্ত্তি। স্ত্রীর মনস্তুষ্টি সম্পাদনে পরমারাধ্য জনক জননীও সময়ে সময়ে মহেন্দ্রের নয়নশূল হইতেন। চপলার কারণ তিনি পিতৃমাতৃভক্তিদানে রহিত।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

হেমেন্দ্র লেখাপড়ায় অজ্ঞ ও চরিত্রহীন হইলেও, পিতামাতার আজ্ঞানু-বর্ত্তী। তাঁহারা চরিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলে, সে কোন কথায় দ্বিরুক্তি করিত না, তবে স্বভাব দোষে পুনরায় অপ-রাধী হইত। পিতার উন্নতির সূত্রপাতেই তাহার জন্ম, সাংসারিক অভাব

হেমেন্দ্র কখন হৃদয়ঙ্গম করে নাই। বাল্যাবধি বিলাসভোগে থাকায়, এই ভাবে দিন অতিবাহিত হইবে, হেমেন্দ্র স্থির জানিয়াছে। অবস্থার যে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন, সে ধারণা তাহার মনে হয় নাই। তাহাতে অসৎ সহবাসে স্বভাব চরিত্র কলুষিত হইয়াছে। চরিত্র অধোমুখী হইলে, সে গতিরোধ বিজ্ঞের পক্ষেও দুর্লভ। মূর্খ হেমেন্দ্র সে ভাবের কি প্রতিকার করিবে? যে সময় হেমেন্দ্র একাকী গৃহে থাকিত, সে আপনাকে মৃতপ্রায় জ্ঞান করিত। হেমেন্দ্র গুরুজনের লাঞ্ছনা ও লোকনিন্দা কিছুই গ্রাহ্য করিত না। সর্ব্বদা সঙ্গীগণের সহিত বিলাস-ভোগে মত্ত থাকিতেই তাহার অনুরাগ।

রায়পত্নী স্বামীর অজ্ঞাতসারে হেমেন্দ্রনাথকে আবশ্যক মত দুই দশ টাকা প্রদান করিতেন। রমণী কোমল প্রকৃতি, তাহাতে হেমেন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র! ছোট ছেলের প্রতিই মাতার অপেক্ষাকৃত অধিক স্নেহ, হেমেন্দ্রনাথ আবশ্যকমতে মাতার নিকট অভাব জানাইলে, রায়পত্নী মঙ্গলা পুত্রের প্রয়োজন পূরণ করিতেন। ভাগ্যদোষে পুত্র দুশ্চরিত্র হইলেও দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ বধূ-সরলা সাতিশয় গুণবতী। তিনি শ্বশুর শাশুড়ীকে পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। গৃহে দাস দাসী সত্বেও তিনি গৃহিণীর মত গৃহকার্য্যে একান্ত অনুরক্তা! সামান্য ভৃত্য হইতে পরিবারভুক্ত সকলের সহিত এরূপ ভাবে সরলা ব্যবহার করিতেন যে, সংসারে তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কখনও কোন কথার উত্থাপন করিত না। সংসারে তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—একে পরম রূপবতী, তাহাতে যে সকল গুণ থাকিলে, নারী-সমাজে রমণীর আদর হইয়া থাকে, তৎসমস্তই সরলায় বিদ্যমান ছিল। কাহাকে কিরূপ সম্মান করিতে হয়, কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রয়োজন, তৎ-সম্বন্ধে তিনি সম্যক্ বিদিতা ছিলেন। কখন কেহ তাঁহার নিন্দা বা কুৎসা করে নাই। তিনি লজ্জাশীলা, পতিপ্রাণা, কর্ম্মিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রা রমণী। ভাশুরকে যথাবথ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তৎজায়াকে বয়োধিকা ভগ্নীর ন্যায়

তাহার আদর যত্ন। মহেন্দ্রের স্ত্রী চপলার পৈত্রিক বিষয়াদি কিছুই ছিল না; স্বামীর বিশ্বাস ও শ্বশুরের ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিতা হইয়া, চপলা দীন দুঃখী দূরে থাকুক, আত্মীয়স্বজনদিগেরও সহিত সদ্ব্যবহার করিত না। হেমেন্দ্র-জায়ার পৈত্রিক সম্পত্তির অভাব ছিল না, পিতার নিকট হইতে ২০।২৫ টাকা মাসোহারা পাইতেন। অন্যায় করিয়া ভাশুরপত্নী মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া কটূক্তি প্রয়োগ করিলেও, সরলার মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইত না। তিনি সাতিশয় শান্ত ও ধীরস্বভাবা ছিলেন, স্বামী-গৃহে গুরুজনবর্গের আহারাদি সমাপ্ত না হইলে, তিনি আপনি আহার করিতেন না; কিন্তু হেমেন্দ্রনাথের জন্য স্নেহময়ী সরলা একান্ত মর্ম্মাহতা, তথাচ পতির মঙ্গলকামনায় তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা! যাহাতে স্বামীর সুমতি হয়, তাঁহার চরিত্র সংশোধিত হইয়া সংসারধর্ম্মে মতিগতি ফিরে, সতত তাঁহার সেই চিন্তা—সেই চেষ্টা।

হিন্দু-ললনার স্বামী উপাস্য। রমণী স্বামীর ভালবাসা ও আদর স্বর্গীয় সুখাপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া জানেন। যাহাতে স্বামী স্বচ্ছন্দে মনের সুখে থাকেন, তাহাই সাধ্বীর কামনা! সংসারের ভালমন্দজনিত চিত্তবিকারে সতী পতি সকাশে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের সান্ত্বনা লাভ করে। স্বামী সতীর সর্ব্বস্ব, স্ত্রী পুরুষে ছায়া কায়া সদৃশ অনুগামী! পতিপ্রাণা সরলা স্বামীসঙ্গিনী। স্বদেশ বিদেশ, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ্ সকল অবস্থাতেই সাধ্বীসতী স্বামী সকাশে সুখভোগ করেন। পতির প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া পতি-প্রাণা যে আনন্দিতা, পার্থিব কোন সুখই তাহার তুল্য নহে। পতিসহ এক সন্ধ্যা আহার, দুঃখ কষ্টে সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ, তাহাতেও সতীর মনে আনন্দ। পতির কি প্রকারে সুমতি হইবে, হেমেন্দ্র লোকসমাজে গণ্য মান্য, সকলের নিকট আদৃত, স্বভাব চরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সৎ ও সাধু পুরুষ হইতে পারে, বিষয়কার্য্যে সংযত থাকিয়া তাহার খ্যাতি লাভ হয়, এই

বাসনাই সরলার হৃদয়ে নিরন্তর জাগ্রত। সরলা স্বামীর স্বভাব সংশোধনে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছে, অনুনয় বিনয়ে পতির চরণে কত অশ্রুপাত করিয়াছে, কিন্তু অভাগিনী সরলার এ সাধ্যসাধনায় নিষ্ঠুর হেমেন্দ্রের কঠিন হৃদয়ে ভাবান্তর হয় নাই।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

হেমেন্দ্রের কুহকে পড়িয়া যে রজনী ফণীন্দ্রনাথের দুর্গতি হয়, সে রাত্রি মিত্রজের গৃহে সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে জাগ্রতাবস্থায় ক্ষেপণ করিয়াছিল। নিদ্রাদেবী জীবের বিরামদায়িনী হইয়াও, সে গৃহে প্রবেশের অধিকার লাভে বঞ্চিতা! ফণীন্দ্রের অদর্শন কারণ কাহারও নিদ্রা হয় নাই। বহু সন্ধানের পর, গোপাল প্রমুখাৎ যদিও ফণীন্দ্রের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল; তথাচ তাহাদের উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কিছুমাত্র শান্তি হয় নাই। জামাতার সাক্ষাৎ কারণ বাটীর সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে রাত্রিযাপন করিয়াছিল। নিশাবসানে ফণীন্দ্রকে লইয়া গোপাল মিত্রজের গৃহে উপস্থিত হয়। তাহার কিছুক্ষণ পরে পশু পক্ষীগণের প্রভাতীকীর্ত্তনে ধরণী প্রতিধ্বনিতা হইল, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার লোকালয় ত্যাগে নির্জ্জন নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় লইল। চন্দ্রনাথ পুত্রের অদর্শনে এতাবৎকাল কাতর ছিলেন, ফণীন্দ্রের সাক্ষাতে তাঁহার সে উদ্বেগ দূর হইল; কিন্তু অরুণদেব আকাশে বিকাশ মাত্র তিনি বৈবাহিকের নিকট বিদায় লইয়া পুত্র সহ স্বগৃহে ফিরিলেন। বক্রেশ্বর তাঁহাদিগকে আর এক দিন থাকিবার জন্য বিশেষ আকিঞ্চন করিলেন, কিন্তু চন্দ্রনাথ বৈবাহিকের কথায় স্বীকৃত হইলেন না।

দ্বারকানাথ প্রভাতে হেমেন্দ্রের কীর্ত্তির পরিচয় পাইয়া একান্ত অনুতাপিত হইলেন ও মনে মনে আপনাকে যথেষ্ট ধিক্কার দিলেন। মহেন্দ্রনাথ

নির্ব্বিরোধী, কাহারও মনে কষ্ট দিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন। কনিষ্ঠের ঈদৃশ গর্হিত পরিচয় পাইয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। হেমেন্দ্র লজ্জাসম্ভ্রমহীন, সামাজবন্ধনে তাহার শৈথিল্য। আপনি অধঃপাতের চরম সীমায় উপস্থিত, তাহাতে অকারণ ফণীন্দ্রের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়াছে, একারণ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া, সে প্রফুল্ল বদনে পিতৃ আজ্ঞায় সম্মুখীন হইল। রায় মহাশয় পুত্রের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অধোমুখ হইলেন। মহেন্দ্র ভ্রাতাকে সম্মুখে পাইয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। সে তিরস্কারে হেমেন্দ্রের ক্রোধের সঞ্চার হইল, তদুত্তরে হেমেন্দ্র জ্যেষ্ঠকে বিস্তর কটু কাটব্য প্রয়োগ করিল। রায় মহাশয় পুত্রের ঈদৃশ আচরণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহার গলা টিপিয়া বাটী হইতে বহির্গত করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। গোপাল বহু দিনের ভৃত্য, প্রভু-পুত্রের গায়ে হাত তুলিতে তাহার সাহস কুলাইল না। সে হেমেন্দ্রের নিকটে যাইয়া কর্ত্তার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরে যাইতে বলিল। হেমেন্দ্রকে লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িল। এক দিকে দ্বারকানাথ ও মহেন্দ্র, অন্য দিকে ক্রুদ্ধ হেমেন্দ্র ; কথায় কথায় উভয় পক্ষে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইল। এমন সময়ে বক্রেশ্বর আসিয়া হেমেন্দ্রের হাত ধরিয়া তাহাকে আপনার বাটীতে লইয়া গেলেন।

এদিকে মিত্রজ মহাশয়ের বাটীতে মহা গোল। বক্রেশ্বর হেমেন্দ্রকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিয়া বহির্ব্বাটীতে বসাইয়া,অন্তঃপুরে যাইলেন ও স্ত্রীলোকদিগকে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন, "দৈব দুর্ব্বিপাকে এরূপ ঘটিয়াছে, নতুবা কেন এমন হইল? বয়স্-সুলভ চাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়াই হেমেন্দ্র এরূপ করিয়াছে ; আমাকে সে যথাযথ সম্মান করে, তাহার দ্বারা ফণীন্দ্রের অনিষ্ট হইবে, কখনই সম্ভব নহে! যাহা হইবার হইয়াছে, অকারণ সে সকল কথার আন্দোলনে প্রয়োজন কি? রায় মহাশয়ের নিকট হেমেন্দ্রের যথেষ্ট তিরস্কার হইয়াছে, আর ওসকল কথা মুখে

আনিও না। এক দিন বৈবাহিক ও জামাতাকে আনাইয়া আমোদ আহ্লাদ করা যাইবে। চন্দ্র বাবুও সবিশেষ জ্ঞাত আছেন, তিনিতো ছেলে মানুষ নহেন যে, ইহার জন্য আমাদের উপর অভিমান করিবেন? তিনি অবশ্যই সময়ে এ সকল কথা ভুলিয়া যাইবেন। এ কথার আন্দোলনে আবশ্যক নাই।" এইরূপ প্রবোধ বাক্যে তিনি অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণকে বুঝাইলেন; আরও বলিলেন যে, রায় মহাশয় তাঁহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন। যখন যে দায় উপস্থিত হয়, রায় মহাশয় তৎসমুদয় আপন স্কন্ধে বহন করিয়া থাকেন, তদীয় পুত্র হেমেন্দ্র সম্বন্ধে এ সব কথার উত্থাপনে প্রয়োজন নাই। বহির্ব্বাটীতে মনঃক্ষুণ্ণ হেমেন্দ্র একাকী বসিয়া আছে, তাহার সহিত দুই চারিটী কথা না কহিলে, মনে মনে সে বিরক্ত হইতে পারে—এই ভাবিয়া বক্কেশ্বর অবিলম্বে হেমেন্দ্র সমীপে আসিলেন।

এদিকে রায় মহাশয় হেমেন্দ্রকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া বিশ্রামলাভ করিতেছিলেন, কিন্তু সে শান্তি তাঁহাকে অধিকক্ষণ ভোগ করিতে হইল না। বন্ধুর জামাতা ও বৈবাহিকের অপমান হইয়াছে, কুলাঙ্গার হেমেন্দ্র সকল অনিষ্টের মূল। বক্কেশ্বর চক্ষুলজ্জায় কিছু না বলিলেও, অবশ্য তিনি মনে মনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। এইরূপ পাঁচ সাত ভাবিয়া তিনি মিত্রজ মহাশয়ের বাটীতে আসিলেন। হেমেন্দ্র বক্কেশ্বরের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল, পিতাকে দেখিয়া তদ্দণ্ডে চলিয়া গেল। এক্ষণে কি উপায়ে চন্দ্রনাথ বাবু সন্তুষ্ট হইবেন, গত রজনীর বৃত্তান্তে অবশ্যই তিনি বৈবাহিকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন—উভয়ে এই কথা লইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তায় অভিভূত থাকিলেন।

হিন্দুগৃহে কন্যা লইয়া আজীবন কষ্ট ভোগ করিতে হয়, দশম বর্ষে পিতা মাতা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত থাকেন; তনয়ার বিবাহ দিয়াও তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। জামাতাকে সন্তুষ্ট রাখিতে, কন্যাকে শ্বশুরালয়ে

যাহাতে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ না করিতে হয়, এই সকল ভাবনা চিন্তায় তাঁহাদিগকে উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়। মোট কথায় কন্যার চরিত্রের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টির প্রয়োজন। হেমেন্দ্র সংক্রান্ত চন্দ্রনাথের সহিত বক্কেশ্বরের মনোমালিন্য নিবারণ অভিপ্রায়ে, উভয়ের আত্মীয়তা-বন্ধন রক্ষায় দুইজনেই চিন্তিত হইলেন। ফলতঃ মিত্রজ মহাশয়ের ইহাতে অপরাধ নাই, তাঁহার অজ্ঞাতসারেই হেমেন্দ্র এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু জামাতার পিতা কোন সূত্রে বৈবাহিকের ত্রুটি দেখিলেই, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হন! চন্দ্রনাথ অবশ্যই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, সেই ক্রোধে রাধামতিকে লইয়া যাইয়া হয়তো আর পিত্রালয়ে পাঠাইবেন না। মিত্রজ মহাশয়ের সংসারে রাধামতিই এক মাত্র অবলম্বন! তাঁহার আহার বিহারের পরিচর্য্যা করিতে এক মাত্র কন্যা রাধামতি! দ্বারকানাথ ও বক্কেশ্বর এই বিষয়ের মিমাংসা করণে প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

অবশেষে রায় মহাশয় মিত্রজকে চন্দ্রনাথ সমীপে একখানি পত্র পাঠাইতে বলিলেন। বক্কেশ্বর সাংসার সম্বন্ধে সকল বৃত্তান্ত এক্ষণে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, রায় মহাশয়ের অনুষ্ঠানের প্রতি এতাবৎ কাল তাঁহার লক্ষ্য, কিন্তু অদৃষ্ট দোষে নিজের উন্নতি সাধনে সচেষ্টিত হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে দ্বারকানাথই তাঁহার পরামর্শদাতা এবং বিপদ্ আপদে রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহারই উপদেশ মতে তিনি অনুনয় বিনয় পূর্ণ একখানি পত্র বৈবাহিক মহাশয়কে লিখিলেন।

কামিনী পুরাতন দাসী, কার্য্যে চতুরা; কিন্তু সকল সময়ে রমণী সংসারের কূটাভিসন্ধি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, সম্যক্ বুঝিয়া রায় মহাশয়ের কথামত সে পত্র খানি তাঁহারই ভৃত্য গোপালের দ্বারা চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট পাঠান হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

এক দিবস জামাতাকে লইয়া সাধ আহ্লাদ করিতে হইবে, ফণীন্দ্র শ্বশুরালয়ে আসিলে, বৈবাহিক মহাশয়ের মনোমালিন্য ঘুচিবে, বক্কেশ্বর ও দ্বারকানাথের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে। এমন সময়ে খলসিনী হইতে পতের মা এক খানি পত্র লইয়া বক্কেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইল। মিত্রজ মহাশয় বৈবাহিকের দাসীকে দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, নিশ্চয়ই চন্দ্রনাথ বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া এই পত্র লিখিয়াছেন। মনোকষ্টে গত শোকো-দ্দীপনে তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু মনোগত ভাব অপ্রকাশ রাখিয়া বৈবাহিকের পারিবারিক কুশল সমাচার জ্ঞাত হইয়া প্রীতি সম্ভাষণে পতের মাকে অন্তঃপুরে যাইতে বলিলেন। বৈবাহিক প্রদত্ত পত্রখানি বক্কে-শ্বর রায় মহাশয় সমীপে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন ও তৎমর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া উভয়েই মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। গৃহলক্ষ্মী কমলা ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আজ রাধামতিকে পতিগৃহে পাঠাইলে, তাঁহার সংসার শূন্য হইবে! তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া স্ত্রীলোকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। সুবিজ্ঞ রায় মহাশয় গতঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া বন্ধুকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনাথ পত্রে বৈবাহিককে গত দুর্ঘটনার মূল কারণ বলিয়া অপরাধী করিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞাতসারেই হেমেন্দ্র বন্ধুবর্গ সহ ফণীন্দ্রনাথকে বিপন্ন করিয়াছিল, স্পষ্ট লিখিয়াছেন; অধিকন্তু জানাইয়াছেন যে, তিনি বধূমাতাকে পিত্রালয়ে রাখিতে ইচ্ছা করেন না। বক্কেশ্বর নিরপরাধী হইয়াও চন্দ্রনাথের সকল লাঞ্ছনা গঞ্জনা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। রায় মহাশয় চন্দ্র-নাথকে বিজ্ঞ বলিয়া জানিতেন, সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তিনি বক্কে-শ্বরকে অপরাধী করিয়াছেন, জ্ঞাত হইয়া—আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলেন।

অধুনা অনেক সংসারেই হিন্দু-ললনার দুরবস্থা! একদিনও তাহা-

দিগের মনের সুখে যায় না! যতদিন না বধূ গৃহ-ধর্ম্মে দীক্ষিতা হয়, আপনার ঘর সংসার আপনি বুঝিয়া লইতে পারে, তদবধি শ্বশুর শাশুড়ী গুরুজন-বর্গের অধীনে তাহাদিগকে শঙ্কিতভাবে দিনাতিপাত করিতে হয়; অধিকন্তু পদে পদে গুরুজনের লাঞ্ছনা গঞ্জনা তাহারা উদ্বিগ্ন চিত্তে সহ্য করিতে বাধ্য! কিন্তু দুঃখে কষ্টে কালক্ষেপ করিয়াও তাহারা সাংসারিক কার্য্যে শৈথিল্য দেখাইতে পারে না। হিন্দু-ললনা পতিপ্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া, সংসারের সুখ দুঃখেও প্রফুল্ল চিত্তে কালক্ষেপ করে। ভাগ্যদোষে সতীর শান্তি সদন—পতি যাহার প্রতি বিরূপ, তাহাতে যদি তাহাকে শাশুড়ী ননদিনীর বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে সংসার তাহার পক্ষে বিষময় হইয়া উঠে! সে রমণী প্রতি মুহূর্ত্তেই নিজের মৃত্যু কামনা করে এবং উত্তরোত্তর শোকতাপে ব্যথিতা হইয়া বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়।

দ্বারকানাথ কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বক্কেশ্বরের আসন্ন বিপদ হৃদয়-ঙ্গমে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। বক্কেশ্বর একা, তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষক দ্বারকানাথ চলিয়া গেলেন! কি করিবেন—স্থির করিতে না পারিয়া, —আকাশ পাতাল ভাবিতে বসিলেন। ভাবুকের সহায়—ভগবান্, তিনিই বিপদে পতিত করিয়া, পুনরায় উদ্ধার করেন! কিয়ৎক্ষণের পর অকারণ ভাবিয়া চিন্তিয়া হৃদয়কে ব্যথিত করা অনর্থক জানিয়া, মিত্রজ অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব ধারণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাধামতি একাকিনী—রন্ধন কার্য্যে নিযুক্তা, কামিনী গৃহকার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। পতের মা তাহার বধূ দিদির নিকটে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। এমনসময়ে বক্কেশ্বর রাধামতিকে বলিলেন, "মা! তোমার শ্বশুর তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠা-ইয়াছেন।" রাধামতি ক্ষুণ্ণভাবে পিতার মুখের প্রতি অনিমেষনয়নে চাহিয়া দেখিল। ক্ষণকাল পিতা পুত্রী কাহারও মুখ হইতে কোন কথা বহির্গত হইল না, উভয়েই উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন! কিন্তু শোকোচ্ছ্বাসের

তরঙ্গ উথলিয়া উভয়েরই বক্ষঃস্থল অশ্রুধারায় ভাসাইল। কিছুক্ষণ এই ভাবে গত হইলে, "মা গো!" "কোথায় গো!" বলিয়া রাধামতি রোদন করিল। কন্যার শোকোচ্ছ্বাসে তনয়াগতপ্রাণ ব্রজেশ্বর রাধামতিকে সাদর সম্ভাষণ ও সান্ত্বনা বাক্যে শান্তি প্রদানে সযত্ন হইলেন। সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্ কাহারও মুখাপেক্ষা করে না—যথানিয়মে আসে যায়। সে গতির বিরাম নাই! কন্যা পতিগৃহে যাইবে—আনন্দের দিন হইলেও, ব্রজেশ্বরের পক্ষে আজ দুঃখের দিন। পিতা কন্যাকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার ইচ্ছানতে তাহাকে আপনার নিকটে রাখিতে পারেন না।

রাধামতি শ্বশুর বাটীতে দুইবার মাত্র গিয়াছিল। একবার বিবাহের পর, সে সময়ে নববধূ শাশুড়ী ননদিনীর ভাব ভক্তি, আদর যত্ন বুঝে নাই; দ্বিতীয় বারে এক মাস কাল তথায় তাহাকে থাকিতে হয়, এই সময়ে রাধামতি তাঁহাদিগের প্রকৃতি বুঝিয়াছিল। গৃহস্থের বধূ যে ভাবে পতিগৃহে কালক্ষেপ করে, রাধামতি সে রীতি নীতি কিছুমাত্র জানিত না, একারণ দুই এক কথা তাহাকে শুনিতেও হইয়াছিল; অন্যপক্ষে সে পিতার সর্ব্বস্ব-ধন, আদরিণী। শ্বশুরালয়ে সে আদর যত্ন তাহাকে কে করিবে? তাহাতে কাজ কর্ম্মে রাধামতি অপটু—কেহ কোন কাজের কথা বলিলে, সে মনে মনে বিরক্তা হইত! অধিকন্তু লাঞ্ছনা ভয়ে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, অসাবধানতা বশতঃ তাহা সম্পন্ন করিতে পারিত না। শাশুড়ী দুই এক দফা দেখাইয়া দিতেন, পরক্ষেপে না পারিলে—তিরস্কার করিতেন।

শ্বশুর শাশুড়ীর লাঞ্ছনা গঞ্জনা নব বধূদিগের পক্ষে পরিণামে হিতকর, তাহাতে আর সন্দেহ কি?' পিতামাতা পুত্রের লেখাপড়ায় যেমন দৃষ্টি রাখেন, কিরূপে তাহার স্বভাব চরিত্র ভাল থাকিবে, এই বিষয়ে সর্ব্বদা মনোযোগী! বধূকে গৃহকার্য্যে সুদক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই শ্বশুর শাশুড়ী সেইরূপ নববধূর প্রতি সময়ে সময়ে তিরস্কার করিয়া থাকেন। পুত্র বাল্যকালাবধি

মা বাপকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া তাঁহাদিগের আদেশ পালনে, কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। যে বধূ, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের উপদেশানুসারে কাজ কর্ম্মে সযত্নে মনযোগ দেয়, পরিণামে তাহারই সুখ্যাতি হইয়া থাকে। পিঞ্জরাবদ্ধপক্ষী সদৃশ হিন্দু কুলবধূ শ্বশুরগৃহে, তাহার কোন কার্য্য করিতে অধিকার নাই! গুরুজন যখন যাহা করিতে বলিবেন, তদ্দণ্ডে তাহা করিতে হইবে, সুখ অসুখেও শঙ্কিতভাবে তাহাকে থাকিতে হয়। রাধামতিকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইয়া বক্কেশ্বরই বা কি প্রকারে নিশ্চিন্তচিত্তে থাকিতে পারেন? তাহাতে রাধামতি বক্কেশ্বরের নয়নানন্দ, এ সময়ে রাধামতি স্থানান্তরিত হইলে, তাহার সংসারবন্ধন সকল দিকেই শিথিল হইবে! এই চিন্তায় তিনি মনে মনে কতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

আহারাদির পর বক্কেশ্বর রায় মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ অভিপ্রায়ে বাটী হইতে বাহির হইলেন। অনেক কথা বার্ত্তার পর, উভয়ে পরামর্শ স্থির করিলেন যে, আপাততঃ রাধামতিকে পাঠান যুক্তিযুক্ত নহে। তদনুসারে মিত্রজ বৈবাহিকের দাসীর হস্তে বিনয় ও নম্রতা পূর্ণ একখানি পত্র দিলেন। দাসী পর দিবস পলাসিনী যাত্রা করিল। গোপালও ইতোমধ্যে চন্দ্রনাথকে পত্র দিয়া ফিরিয়া আসিল। মিত্রজ এতাবৎকাল সংশয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন, এক্ষণে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন।

মিত্রজ গোপালের নিকট চন্দ্রনাথের মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, ক্রোধবশতঃই যে তিনি রাধামতিকে লইয়া যাইবার কথা লিখিয়াছিলেন, বুঝিলেন। পিতা ও কন্যার আপাততঃ কিছুকাল মনের আনন্দে যাপিত হইল।

কমলার মৃত্যু দিবসে বক্কেশ্বরের পাদদেশে যে আঘাত লাগিয়াছিল, সে বেদনা সম্পূর্ণ সারে নাই, যষ্ঠি ব্যতিরেকে তিনি কোথাও যাইতে পারেন না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

পতিপ্রাণা রমণী স্বামীর সুখ দুঃখের সমাধিকারিণী। হিন্দুনারীর সুখ দুঃখের পতিই মূল। পতি সংসারে যে পরিচর্য্যা করিয়া থাকে, পত্নীকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। স্বামীই স্ত্রীর আশ্রয়। পতি সহধর্ম্মিণীকে যে ভাবে চলিতে উপদিষ্ট করিবেন, ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া, সেই ভাবেই তাঁহাকে চলিতে হইবে! আহার বিহার, সুখস্বচ্ছন্দ সকল বিষয়েই স্ত্রী—স্বামীর মুখাপেক্ষী। পতির সন্তোষসাধনে হিন্দুসাধ্বীর যে আদর যত্ন, সে দৃশ্য কোথাও দৃষ্ট হয় না; কিন্তু স্বভাবতঃ নারী—অভিমানিনী! যে সতী পতির মঙ্গলে প্রাণপাত করিয়া অহোরাত্র, পরিশ্রমে ও চিন্তায় বিরতা হয় না, স্বামীর অনাদরে সেই সাধ্বীর দুঃখের সাগর উথলিয়া উঠে! পতি প্রেম-ভিখারিণী হিন্দুরমণী আজীবন স্বামী-সেবায় সংরতা! সে প্রতিদানে পতির স্নেহ মমতায় পত্নী বঞ্চিতা হইলে, কিরূপে সে শান্তিলাভ করিতে পারে? স্ত্রী যদি স্বামীর অনুরাগিণী, সম্পদে বিপদে যদি সে তাহার সমাধিকারিণী, তবে সে পতিব্রতা পতির অনাস্থায় বিচলিত না হইবে কেন? উত্তরোত্তর শোকে তাপে তাহার হৃদয় মলিন হইতে থাকে, সে উদ্বেগে পতিপ্রেম একমাত্র স্ত্রীর শান্তিবারি! সতী পতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, সে ভাব স্বর্গীয়; স্বামী-সোহাগে সুখ-দুঃখজড়িত সাংসারিক বৈষম্যে স্ত্রীর কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না! স্বামী সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও, সে স্ত্রীর যত্নের নিধি! রূপ, গুণ, ধন জনিত তারতম্যে সতী পতিসেবায় কদাচ বিমুখ নহেন! সতীর দেবতা—সেই পতির নিন্দা শুনিলে, পতিপ্রাণার প্রাণ কত মলিন, কত বিষণ্ণ—সতী ভিন্ন সে বেদনা অন্যে কখন বুঝে না পতি-নিন্দা সতীর প্রাণে কখনই সহ্য হয় না! বিশ্ব-জননী মহামায়া পিতৃদেব প্রমুখাৎ পতি-নিন্দা শ্রবণে যজ্ঞস্থলে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন! তাপস-

তদ্দ সত্যবান্ রাজনন্দিনী সাবিত্রীর অযোগ্য হইলেও, সতী তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন! সত্যবান্ ঘটনাস্রোতে কঠোর কালের করগত হইলেও, পতিপ্রাণা সাবিত্রী সত্যবানে অনুরক্তা! স্বামী-সেবাই সংসারের সার জানিয়া, কঠোর নিয়তিকে আয়ত্তাধীনে আনিয়া সাবিত্রী, মৃতপতির পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিলেন! মোট কথায় সতী-চরিত্র অলৌকিক, অপূর্ব্ব! সতীর আদর চিরদিনই সমভাবে থাকিবে।

রায় মহাশয়ের সংসার এক্ষণে নিরুদ্বেগ ও উন্নত্যুন্মুখ! অভাব নাই, অনটন নাই, সদানন্দে দিনাতিপাত হইতেছে। ভরণপোষণ, লোকলৌকিকতা সকলই নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। বাহ্যিক দৃশ্যে দ্বারকানাথের পরিজনবর্গ মনের সুখে কাল যাপন করিতেছে, সহজেই অনুভূত হয়! কিন্তু অর্থের সচ্ছলতায় মনের শান্তি লাভ হয় না! সে অশান্তি কিছুতেই দূর হইবার নহে। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনাথের চরিত্র নির্ম্মল, সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা, কিন্তু জ্যেষ্ঠ বধূ চপলা ভিন্নরুচিবিশিষ্টা! মহেন্দ্রনাথ অমায়িক, সরল চিত্ত; চপলা বিষয়-গর্ব্বে গর্ব্বিতা সকল কার্য্যে অসন্তুষ্টা। এদিকে, হেমেন্দ্রনাথ লম্পট ও মদ্য-পায়ী; তাঁহার স্ত্রী সরলা—লজ্জাশীলা, হিন্দুরমণীর আদর্শ স্বরূপিণী! গৃহিণী মঙ্গলা—কর্ত্তার মত উদার ও সরলহৃদয়া; কিন্তু তদীয় পুত্র ও বধূদিগের পরস্পর ভিন্ন ভাবাপন্ন প্রযুক্ত রায় মহাশয়ের সাধের সংসারে বিষাদের ছায়া পাত হইয়াছে। এরূপ অমঙ্গলের প্রতিবিধান কোথায়?

মুখরার নিকট লজ্জাশীলার চিরকালই পরাভব। কোন কারণ বশতঃ হেমেন্দ্র-পত্নী সরলার সহিত মহেন্দ্র-সহধর্ম্মিণীর কথান্তর হইলে, চপলার নিকটে কনিষ্ঠ বধূর গঞ্জনার শেষ থাকে না। সরলাকে শত সহস্র ভৎসনা করিয়াও চপলা নিবৃত্তা হয় না। প্রকৃতপক্ষে কলহপ্রিয়া স্ত্রীলোক বিবাদ বিসম্বাদে সমধিক তৃপ্তি বোধ করে, তাহাতেই তাহার প্রাধান্য দেখায়। সামান্য কারণে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার প্রতি অনর্থক কটূক্তি প্রয়োগ করে!

উভয়েই এক শ্বশুরের অন্নে প্রতিপালিতা, গৃহস্থালীর অভাবে তাহাদিগকে ভাবিতে বা কষ্টভোগ করিতে হয় না; তথাপি উভয়ের নিত্যই মনোমালিন্য। সরলা চপলার কথায় দ্বিরুক্তি করেন না, কিন্তু মনে মনে ক্ষুণ্ণা হইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠা—আপনার স্বামী—সক্ষম, কৃতী; দেবর—অলস ও অকর্ম্মণ্য—এই বিশ্বাসে কনিষ্ঠাকে সময়ে সময়ে শ্লেষসূচক উক্তি প্রয়োগ করে; কিন্তু, সরলা তাহার মান্যপ্রদানে কখন ত্রুটি করেন না। স্ত্রীলোক স্বামীর নিকটেই মনের কথা জানাইয়া সুখ দুঃখে সহানুভূতি লাভ করিয়া থাকে! অভাগিনী সরলা সে সুখে বঞ্চিতা, কালবশে শ্বশুর শাশুড়ী বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন. গৃহস্থালী রক্ষায় গৃহিণীর এক্ষণে পূর্ব্ব সামর্থ নাই. বড় ছোট বধূকে সে সমুদায় দেখিতে হয়। একারণ সরলাকে চপলাপেক্ষা সাংসারিক কাজ কর্ম্মে সমধিক যত্নবতী ও কর্ম্মিষ্ঠা হইতে হইয়াছে।

স্ত্রীর প্রীতি সম্পাদন স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য—সে বিবেচনা হেমেন্দ্রের হৃদয়ে ঠাঁই পায় না! সময়ে সময়ে সহধর্ম্মিণীকে হেমেন্দ্র আপনার বিপদের কথা জানাইয়া দুই একখানি অলঙ্কারও আত্মসাৎ করিয়াছে। সতী স্বামীর মনস্তুষ্টি সাধনই মুখ্য বলিয়া জানেন, এরূপ অবস্থায় পতির বিপদ্ শুনিয়া কখনই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না! হেমেন্দ্রের প্রয়োজন মত টাকাকড়ি চাহিবামাত্র, পতিপ্রাণা সরলা প্রফুল্লচিত্তে স্বামীকে অর্থসাহায্য করিতেন এবং যাহাতে এরূপ বিপত্তি আর না উপস্থিত হয় ও চরিত্রের সংশোধন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তিনি সাধ্যমত পরামর্শ দিতেন। কাজকর্ম্মে ছোট বধূর দিন কাটিয়া যায়, গুরুজন সমক্ষে, স্বামীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হিন্দু-ললনার পক্ষে লজ্জার বিষয়। নিভৃতে, রজনীযোগেই স্বামী স্ত্রী উভয়ে একত্র মিলিবার উপযুক্ত সময়; কিন্তু সরলার অদৃষ্টে সে সুখ ঘটে না। হেমেন্দ্র রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে, একদিনও বাটীতে আইসে না। তাহাতে সুরাপানে এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়ে যে, তাহার সহিত সরলার কোন কথাবার্ত্তা হয়

না, অধিকন্তু তাহারই সেবা শুশ্রূষায় সরলাকে জাগ্রত থাকিয়া বহুক্ষণ কালক্ষেপ করিতে হয়।

কোন রাত্রে হেমেন্দ্রকে প্রকৃতিস্থ দেখিলে, সরলার আনন্দের সীমা থাকিত না। তিনি স্বামীকে কত উপদেশ, কত হিতকথাই শুনাইতেন: কিন্তু নিষ্ঠুর হেমেন্দ্র এরূপ পতিপরায়ণার কথায় আদৌ কর্ণপাত করিত না। পরমুখে পতি নিন্দা, যাঁহার হৃদয়ে শক্তিশেল বিদ্ধ করে, সে রমণী স্বামীর কুৎসা কি অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন? এমন কি, কোন স্থানে বসিয়া কথাচ্ছলে হেমেন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে কলঙ্কের কথা শুনিলে, মনের দুঃখে ও আশঙ্কায় সরলা সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

হেমেন্দ্রের অর্থের প্রয়োজন হইলে পিতার নিকট জানাইয়া পূরণ হইত, কিন্তু রায় মহাশয় এখন তাহাকে এক কপর্দ্দকও সাহায্য করেন না। মাতা ছোট ছেলেকে সমধিক ভালবাসেন, স্নেহ করেন, এজন্য মঙ্গলার নিকট টাকা চাহিলেই হেমেন্দ্র পাইত। দ্বারকানাথ পুত্রের চরিত্র সংশোধন অভি-প্রায়ে হেমেন্দ্রকে নগদ এক পয়সাও দিতেন না; কিন্তু উত্তরোত্তর তাহার চরিত্রের সমধিক অধোগতি হইল! হেমেন্দ্র সময়ে সময়ে গৃহিণীর নিকট হইতে কিছু কিছু খরচের টাকা আদায় করে শুনিয়া, দ্বারকানাথ একদিন মঙ্গলাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না হয়, সাবধান করিয়া দিলেন। হেমেন্দ্র পিতা মাতার কাছে হাত পাতিয়া যখন দেখিল—অভাব থাকিয়া যায়, সে তখন অধিকতর অসচ্চরিত্র হইয়া পড়িল।

রায় মহাশয় বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি, কিন্তু বেশ্যাগমন বা সুরাপানে যে খরচপত্রের অভাব ঘটে না—তাঁহার সে জ্ঞান ছিল না। পুত্রের সংস্কার উদ্দেশে তিনি হাত গুটাইয়া ছিলেন এবং গৃহিণীকে হেমেন্দ্র কোন রূপ

রক্ষা করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রের চরিত্র সংশোধনে দ্বারকানাথের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। যে সময়ে বঙ্কেশ্বরের জামাতাকে লইয়া হেমেন্দ্র বেশ্যাগৃহে আমোদআহ্লাদে লিপ্ত হয়, সে সময়ে হেমেন্দ্র কোন উপায়ে একটীও পয়সা হস্তগত করিবার সুবিধা পায় নাই। পুত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াও তাহার চরিত্রের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেছেন না বুঝিয়া দ্বারকানাথ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে সকলেই হেমেন্দ্রের শত্রু। কোন কর্ম্মচারী হেমেন্দ্রকে একটীমাত্র টাকা দিলেও, তাহার প্রতি রায় মহাশয় বিরক্ত হইতেন। অগত্যা দ্বারকানাথের কর্ম্মচারী কেহই হেমেন্দ্রকে একটী পয়সাও কর্জ্জ দিত না, সকলেই প্রভুর আদেশ রক্ষা করিত। এরূপ অর্থকৃচ্ছ্রতায় হেমেন্দ্র যে উপপত্নী গৃহে আমোদপ্রমোদ করিত—এ সংবাদে রায় মহাশয় সাতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও কোন কথা না জানাইয়া, স্বয়ং এতৎ সম্বন্ধে সবিশেষ সন্ধান লইতেছিলেন।

এক দিবস ভোজনান্তে রায়পত্নী মঙ্গলা বধূদ্বয় ও কন্যা সহ একত্র বসিয়া আছেন, পরস্পর সুখদুঃখের কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক অলঙ্কার-বিক্রেতা রমণী একছড়া দায়মণ্ড কাটা চিক্ লইয়া রায়-অন্তঃপুরে দেখা দিল। এই স্ত্রীলোকটী মধ্যে মধ্যে সেই বাটীতে গহনাপত্র বিক্রয় করিতে আসিয়া থাকে। গৃহিণী, বধূদ্বয় ও কন্যা সকলেরই জলপানি হিসাবে মাসিক কিছু কিছু বন্দোবস্ত ছিল। স্ত্রীলোক মিতাচারিণী, যাহাতে দশ টাকার সংস্থান হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবতী। সময়ে সময়ে দুই দশ টাকা সংস্থান হইলেই, তাঁহারা কেহ অলঙ্কার, কেহবা মূল্যবান্ বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া, পরিণামের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন; এ কারণ রায় মহাশয়ের বাটীতে মধ্যে মধ্যে অলঙ্কারাদি ক্রয় হইত।

মঙ্গলা ও আর আর সকলে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে গহনা-

ওয়ালীকে দেখিয়া, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা স্থগিত হইল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, আছ ভাল! অনেক কালের পর যে তোমার দেখা?"

"আজ্ঞা মা ঠাকরুণ! দুঃখে সুখে—দিন যায়, মধ্যে এখানে ছিলুম না। এই পাঁচ সাত দিন মাত্র এখানে এয়েছি। আপনারা সব ভাল আছেন তো? কর্ত্তা ম'শায় আছেন ভাল?"

"হাঁ! উপস্থিত সব মঙ্গল। তবে, ছোট ছেলেটার জন্য জ্বলে পুড়ে ম'লাম। হতভাগাকে এত করে বোঝাই, তবু তো সে কথা শোনে না। আর সে সব কথা কি শুনবে বল? আজ আমাদের বাড়ী কি মনে করে?"

"একছড়া চিক আছে, নেবেন কি? ওপাড়ার ঘোষেদের বাড়ীর বড় বউ বেচতে দিয়েছেন, সোনাটা আছে ভাল। যদি দরকার হয়, নিয়ে রাখুন—দরেও সুবিধা আছে।"

গৃহিণী "দেখি" বলিয়া চিকছড়া সেই স্ত্রীলোকটীর হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নির্ম্মাণ কৌশল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া, "মা, এখন আবশ্যক নাই" বলিয়া ফেরত দিলেন। সম্প্রতি মঙ্গলা কনিষ্ঠা বধূকে যে চিক একছড়া গড়াইয়া দিয়াছিলেন, গহনাওয়ালীকে দেখাইবার অভিপ্রায়ে সরলাকে সেই ছড়া লইয়া আসিতে বলিলেন। সুমতি মাতার পার্শ্বে বসিয়া কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলেন এবং মঙ্গলার হাত হইতে চিক ছড়াটী লইয়া দেখিতেছিলেন। শ্বশ্রূঠাকুরাণী চিক লইয়া আসিতে বলায়, অকস্মাৎ সরলার মুখ আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—মুখে কথা নাই, কিন্তু অশ্রুধারায় তাঁহার চক্ষুদ্বয় পূর্ণ হইল! তিনি অধোমুখী হইয়া বসিয়া রহিলেন। গৃহিণী বধূমাতাকে এরূপ ম্লান ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বৌমা! আমি যে তোমাকে চিক আনিতে বলিলাম, শুনিতে পাও নাই কি? কেন, অমন করে র'য়েছ মা, আমার কথায় তুমিতো অবহেলা কর না—তবে, ব্যাপারখানা কি?"

সরলা। মা! সে চিক আমার বাক্সে নাই। কাল যখন সন্ধ্যাবেলা জল খাবারের পয়সা বাহির করিতে বাক্স খুলি; দেখি—গহনাপত্র লণ্ড-ভণ্ড। সব মিলিয়ে পেয়েছি, কিন্তু চিকছড়া দেখিতে পাই নাই।”

গৃহিণী বধূর এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, “সে কি কথা? বাক্স থেকে গহনা গেল? কে নিলে? যাও, মা! এখনই ভাল করে খুঁজে দেখ গে; পাওয়া যাবে, ভয় নাই!”

তাঁহাদিগের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। গহনাওয়ালী উপস্থিত গোলযোগ দেখিয়া, “তবে আজ চল্লুম,আর এক দিন দেখা করিব” এই কথা বলিয়া অবিলম্বে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

সুমতি সরলার প্রিয়সঙ্গিনী—উভয়ে পরস্পর বিশেষ সদ্ভাব; দুই জনেরই পরস্পর সুখদুঃখের কথাবার্ত্তা সর্ব্বদা হইয়া থাকে। ভাইজ ননদে সহোদরার মত প্রণয়; যখন যে বিষয়ে পরামর্শ করিতে হয়, উভয়ে যুক্তি না করিয়া কেহ কোন কার্য্য করেন না। গত রাত্রিতে যখন সরলা বাক্স খুলিয়া পয়সা বাহির করিয়াছিলেন, সে সময়ে সুমতি তথায় ছিলেন এবং চিকছড়া বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায় নাই—জানিতেন, এক্ষণে মাতা সে চিকের তত্ত্ব লইতেছেন বুঝিয়া, তিনি গৃহিণীকে বলিলেন, “না, মা! ছোট বয়ের বাক্সে চিক নাই, সে চিক নিশ্চয়ই খোয়া গিয়াছে। আমরা কাল অনেক অনুসন্ধান করিছি—কিন্তু দেখ্‌তে পাই নাই।” গৃহিণী তনয়া ও বধূমাতার কথায় আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন; এক্ষণে অধিক গোলযোগ না করিয়া, সুমতি ও সরলাকে পুনরায় ভাল করিয়া বাক্সটী অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। সরলা শাশুড়ীর আজ্ঞা মত সুমতি সহ আপনার গৃহে যাইলেন।

এ দুঃখময় সংসারেও পতিপ্রেমবঞ্চিতা সরলা মনের কথা প্রকাশ করিবার লোক পাইয়াছিলেন! সুমতি সরল-হৃদয়া, পরোপকারিণী; ভ্রাতৃ-জায়ার সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য! হেমেন্দ্রের ব্যবহারে সুমতিও মর্ম্ম-

পীড়িতা, কিন্তু বয়সে কনিষ্ঠা বশতঃ ভগ্নী ভ্রাতাকে কোন কথাই বলেন না এবং তাঁহার সে সাহসও হয় না।

সুমতিকে নির্জ্জনে পাইয়া, সরলা কতই আক্ষেপ করিলেন। সুমতি বিচক্ষণা ও বুদ্ধিমতী; প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যত্নবতী হইলেন। ননদ ভাইজে এই ভাবে অনেকক্ষণ ক্ষেপণ করিয়া, পুনরায় যে যাহার গৃহ কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। গৃহিণী ছোট বধূ মাতার চিকচড়া খোয়া গিয়াছে স্থির জানিয়া, মনে মনে আক্ষেপ করিলেন এবং ভবিষ্যতে অলঙ্কারাদি বিশেষ সতর্কের সহিত রাখিতে বলিলেন।

কোন জিনিষ নষ্ট হইলে, লোকে কিয়ৎক্ষণ উৎকণ্ঠিত হয়; পরে সাংসারিক ঘটনা-স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া সে কথা ভুলিয়া যায়। রায় মহাশয়ের অন্তঃপুরবাসিনীগণ সকলেই সেই অলঙ্কার অপহরণের সংবাদে বিচলিত হইয়াছিল; সাংসারিক কাজ কর্ম্মে এখন সে কথা চাপা পড়িয়াছে।

সন্ধ্যা হইল, রায় মহাশয় আদালত হইতে বাটী আসিলেন। মহেন্দ্রনাথও গৃহে উপস্থিত। দিনে হেমেন্দ্রের কাজ কর্ম্ম কিছুই থাকে না; প্রত্যহ রাত্রি জাগরণ কারণ আহারাদির পর দিবানিদ্রায় তাহার সুদীর্ঘ সময় কাটিয়া যায়। স্বাস্থ্যানিবন্ধন নিদ্রার প্রয়োজন—রজনীই নিদ্রার প্রকৃত সময়! নিশাচর নিশাগমে যে যাহার কার্য্যে নিযুক্ত হয়; একারণ অন্যান্য সকলে যে সময়ে শান্তি লাভ করে, সেই রজনীতে কার্য্যে সংযুক্ত হইবার নিশাচরদিগের গমনাগমন পক্ষে উপযুক্ত সুযোগ। হেমেন্দ্র পিতা ও ভ্রাতাকে গৃহে প্রত্যাগত দেখিয়া পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইল। অন্যপক্ষে পতিপ্রাণা সতী সরলা যে বিরহ-যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালাতিপাত করিবেন, সে দিকে তাহার দৃষ্টিপাত হইল না।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

সংসারের কাজকর্ম্মান্তে যে যাহার গৃহে শয়ন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। রজনী বিরামদায়িনী—সকলেই নিদ্রাদেবীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে থাকে। একমাত্র সুমতি ও সরলা এই গভীর রাত্রিতে—সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তায় জাগিয়া আছেন। সরলা স্বামীর চরিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া—এ ছার জীবনধারণে আর প্রয়োজন নাই, মৃত্যু হইলেই মুক্তি—জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা—এইরূপ আক্ষেপপূর্ণ উক্তিতে ননদিনী সমীপে কতই মনোবেদনা জানাইতেছেন। সুমতি সাধ্যমত তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। এইরূপ উভয়ের কথাবার্ত্তায় উভয়েরই বক্ষঃস্থল নয়নাসারে ভাসিতেছে!

রাত্রির আধিক্যে জগতের কোলাহল শূন্য হইয়া আসিল, আর লোক জনের কথাবার্ত্তা কর্ণগোচর হইতেছে না। রায় মহাশয়ের বাটীর দাস দাসী-গণও নিদ্রামগ্ন! নিদ্রার কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই! আলস্য সঞ্চারে অজ্ঞাতসারে নিদ্রাদেবী দেহে প্রবেশে, দেহীকে অভিভূত করে। সুমতি ও সরলা সুদীর্ঘ রাত্রি একত্র কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, সময়ে উভয়েরই নিদ্রাকর্ষণ হইল; উভয়েই শয্যায় শায়িতা; কিন্তু, সে নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মিল! যেহেতু সুমতির গৃহে দাসীর নিকটে দুগ্ধপোষ্য শিশু শায়িত ছিল, তাহাতে হেমেন্দ্র-নাথের আগমনে তাঁহাকে নিজ গৃহে যাইতে হইবে। অন্যপক্ষে খোকার কান্নায় সুমতির নিদ্রা ভাঙ্গিল, তিনি নিজ গৃহে যাইলেন।

প্রত্যহ দিন হেমেন্দ্র যতক্ষণ না বাড়ী আইসে, একজন পরিচারিকা সর-লার গৃহে শয়ন করিয়া থাকে। আজ সে দাসী স্থানান্তরে গিয়াছে, সুমতি ভ্রাতৃজায়া সরলাকে একাকিনী রাখিয়া, অন্যমনস্কে আপনার গৃহে চলিয়া আসিলেন; ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার দাসীকে সরলার গৃহে পাঠাইয়া দিবেন;

কিন্তু গৃহে আসিয়া পরিচারিকার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারেন নাই। অন্তপক্ষে তন্দ্রাগতাবস্থায় উঠিয়া আসিয়াছেন, বাসাকে ছোট বোয়ের ঘরে পাঠাইতে বিস্মৃতা হইলেন। সরলা—একাকিনী, আপন কক্ষে শায়িতা রহিলেন। মানুষ—কথাবার্ত্তায় তন্দ্রাভিভূত হইলেও, নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট সময়াপেক্ষা সুদীর্ঘক্ষণ জাগ্রত থাকে; কিন্তু পরস্পরের মুখবন্ধে, বাক্য রহিতে—নিদ্রাক্রোড়ে অভিভূত হয়। সুমতি শয্যাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই গাঢ়নিদ্রায় নিমগ্না হইলেন।

এ দিকে সরলার চিত্ত শোকতাপে জর্জ্জরিত। বাহ্যিক সুখসম্ভোগে অভাব না থাকিলেও, মানসিক দুঃখে তাঁহার হৃদয় মর্ম্মাহত, স্বামীর চরিত্র সংশোধিত করিতে তাঁহার একান্ত কামনা। সরলা স্বপ্নেও পতির অশুভ কামনা করেন নাই। সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও হেমেন্দ্র সরলার পূজ্য! স্বামীর চিত্তবিনোদনে, অসচ্চরিত্রের পরিবর্ত্তন করণআশায়—সরলা সর্ব্বদা ভাবিতা! আহার বিহার কিছুতেই তাঁহার সুখ ছিল না; নিরন্ত পতির জন্যই সরলা ক্ষুণ্ণমনা; যুবতীর দিব্যকান্তি পতির ভাবনায় বিবর্ণ; আমোদপ্রমোদ তাঁহার পক্ষে নয়নের শূল; পতিকে সৎপথে আনিতে তিনি বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কত মন্ত্রতন্ত্র ও দৈবের অবলম্বন করিয়াছেন, গ্রহপূজা ও শান্তির আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু কিছুতেই সে চরিত্রের সংশোধন হয় নাই! হেমেন্দ্র সরলার পরামর্শ মতে কখন কোন কার্য্য করে নাই; উত্তরোত্তর স্বামীর অধোগতি দেখিয়া সতী মনে মনে মর্ম্মপীড়িতা, কোন সুযোগে মৃত্যু হইলেই পার্থিব সকল জ্বালা যন্ত্রণার অব্যাহতি পাইবেন, পর জীবনে আর তাঁহাকে পতির এরূপ অসৎ ব্যবহারে এমন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না; মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া সরলা আপনার প্রাণবিনাশই স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সুযোগ তাঁহার পক্ষে সহজে ঘটে না! যেহেতু দিবাভাগে সাংসারিক কাজ কর্ম্মে নিযুক্তা থাকেন; শাশুড়ী, ননদিনী, ভাশুর-পত্নী সকলের সহবাসে তাঁহার সে সময় কাটিয়া

যায়। রাত্রিতে যে বালার গৃহে সকলে নিদ্রিতা থাকিলেও, সরলার গৃহে এক পরিচারিকা শুইয়া থাকে. হেমেন্দ্র যতক্ষণ না গৃহে প্রবেশ করে, সে দাসী তথায় নিদ্রা যায়, এরূপ অবস্থায় সরলা আত্মঘাতিনী হইবে—এ দুঃসাহসিকতায় তাঁহার সাহস কুলাইত না!

সুমতি গৃহান্তরে গমনের পরক্ষণে সরলার তন্দ্রা ভাঙ্গিল, তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, হেমেন্দ্রের কথা লইয়া তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

আজ সরলা একাকিনী. নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন দিবার ইহাই উপস্থিত সময়। মৃত্যু যন্ত্রণা ভয়াবহ, সে বিভীষিকা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, যুবতী নীরবে কিছুক্ষণ রোদন করিলেন। পিতা মাতার উদ্দেশে নমস্কার করিয়া জন্মের মত বিদায় লইলেন। কি উপায়ে প্রাণত্যাগ করিবেন—দেহ হইতে আত্মা বিযুক্ত করিতে না পারিলে, লোকাপবাদে তাঁহাকে অধিকতর লজ্জা পাইতে হইবে! সাত পাঁচ ভাবিয়া সংসারের সকল স্নেহমমতা ভুলিয়া, স্বেচ্ছায় জীবন বলিদান দিতেছেন, এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি? মনে মনে চিন্তা করিয়া সরলার সর্ব্বশরীর কাঁপিল, অশ্রুধারায় সতীর বক্ষস্থল ভাসিল; শোকোচ্ছ্বাসে হৃদয় উদ্বেলিত হইল! কিন্তু, প্রকাশ্যে সে দুঃখ প্রকাশ করিবার নহে, কেহ জাগিয়া উঠিলে, তাঁহার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে, অধিকন্তু স্বামীর কারণ তিনি যে প্রাণ উৎসর্গে—মনে মনে স্থির করিয়াছেন; সে সঙ্কল্পও ব্যর্থ হইবে। সতী মনের উদ্বেগ মনেই সংবরণ করিলেন। অনতিবিলম্বে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগই যুক্তিসঙ্গত স্থির করিয়া, ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন।. কড়িকাষ্ঠের কড়ায় সংলগ্ন শিকের লণ্ঠনে আলো জ্বলিতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি পতিত হইল। টুল লইয়া ধীরে ধীরে লণ্ঠনটী নামাইয়া, পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাবয়ব সুচারুরূপে আচ্ছাদন করিয়া আনালা হইতে গাত্রমার্জ্জনী লইয়া তাহার একপ্রান্তে গ্রীবাদেশ সজোরে বাঁধিলেন, সেই টুল খানিতে উঠিয়া গামছার অপর প্রান্ত আলম্বিত সেই শিকে বাঁধিলেন। পদ-

ক্ষণে টুলের উপর হইতে ঝুলিয়া পড়িলেন; তদন্তে তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, হস্তপদাদির সঞ্চালন করায়, সেই কাষ্ঠাসনখানি স্থানান্তরিত হইল। স্বল্পক্ষণে সরলার উদ্দেশ্য সফল হইল—তাঁহার কোমল প্রাণ দেহ-বিমুক্ত হইয়া গেল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত, গভীর নিশায় সকলেই নিদ্রা মগ্ন, সরলার এ দুঃসাহসিক কাণ্ড নয়নগোচর করিয়া সাক্ষী প্রদান করিতে রায় মহাশয়ের পরিজনবর্গের কেহ জানিতে পারিল না। হতভাগ্য হেমেন্দ্র প্রতিদিন যেরূপ শেষ রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করে, আজিও যথাসময়ে শয়ন-কক্ষের দ্বারে উপনীত হইল। পুনঃ পুনঃ দাসীকে ডাকিয়া কোন উত্তর না পাইয়া, হেমেন্দ্র সজোরে আহ্বান করিতে লাগিল। কিন্তু সরলা তাহার আর আয়ত্তাধীন নহেন, সতীর পবিত্র আত্মা ভগবানের শ্রীচরণে লীন হইয়াছে! বারম্বার ডাকিয়া—কাহারও কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া, হেমেন্দ্র সজোরে দ্বারদেশে পুনঃপুনঃ পদাঘাত করিল। গৃহে শরীরী কেহ নাই, কে তাহারা কথায় সাড়া দিয়া দ্বারোদঘাটন করিবে? দুর্ভাগা অবশেষে নিরুপায় হইয়া গোপাল ও দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া আনিল। তাহাদিগের এইরূপ যাতায়াতে ও গোলমালে সুমতির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি হেমেন্দ্রনাথকে গৃহের বাহিরে দেখিয়া সচকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, এখনও কি দরজা খোলা পাও নাই? রাত যে অনেক হয়েছে!"

হেমেন্দ্র। না, বড় গোলমালেই পড়িয়াছি! আজ ঝি মাগী পর্য্যন্ত এমনি ঘুমিয়ে পড়েছে যে, কা'রও সাড়া শব্দও নাই। ব্যাপারখানা কি?

"ছোট দাদা, আজ যে ছোট বৌ একা শুয়েছে!" এই কথা বলিয়া সুমতি সত্বর ভ্রাতা সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগের কথাবার্ত্তায় রায় মহাশয়, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাটীর সকলেই জাগ্রত হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া দ্বারদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই দ্বার উদঘাটিত

হইল না। অনন্যোপায় হইয়া রায় মহাশয় গোপালকে অনেক কর্ম্মকারকে ডাকিতে বলিলেন এবং এরূপ অধিক রাত্রিতে বাটী আসিবার কারণ তিনি হেমেন্দ্রকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্র কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া, মৌনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিল। রায় পরিবার সকলেই জাগ্রত, তাহারা মনে করিতেছে যে, ছোটবধূ গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিতা, তাই এরূপ ডাকাডাকিতেও তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। মধ্যে মধ্যে কবাটে ঘা দেওয়া হইতেছে ও এরূপ নিদ্রার কারণ ছোট বধূর উদ্দেশে কত তিরস্কার করা হইতেছে। ইতোমধ্যে কর্ম্মকার আসিল। দ্বারকানাথের আদেশ মত সে দরজা খুলিয়া দিল, তৎক্ষণে সরলার দোদুল্যমান বিকট মূর্ত্তি সকলের নেত্রপথে পতিত হইল। রায় মহাশয় ছোট বধূমাতাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। সরলা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন দেখিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাগণ রোদন করিয়া উঠিল। এরূপ বীভৎস দৃশ্যে হেমেন্দ্রের পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইল; অভাগার নয়নযুগল হইতে অবিরত ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইল। রায় মহাশয় অবিলম্বে পুলিশে সংবাদ পাঠাইলেন।

রজনী আর অধিক নাই, গগনভাগে শুকতারা দেখা দিয়াছে, সে নক্ষত্রের সুবিমল কর-ধারা বর্ষিত হইতেছে! নিষ্প্রভ সুধাকর অস্তাচলাভিমুখী! নিদ্রাঘোরে নীরব থাকিলেও, নিশাবসানে পিককুলের কূজনধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রায় মহাশয়ের বাটী অবিলম্বে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। প্রতিবেশীগণ সকলেই দ্বারকানাথের অনুগত, তাঁহার বাটীতে অকস্মাৎ এরূপ শোকোচ্ছ্বাস শ্রবণে একে একে সকলেই শশব্যস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল; বক্কেশ্বরও আসিলেন। এক্ষণে বর্ত্তমান বিপদে উদ্ধার লাভের উপায় চিন্তায় রায় মহাশয় বন্ধুবর্গসহ পরামর্শ করিতে বসিলেন।

স[illegible] পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বৈবাহিকের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ আকিঞ্চনে দুই মাস কাল বধূমাতাকে পিতৃগৃহেই রাখিয়াছিলেন; যথাকালে রাধামতিকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি লোক পাঠাইলেন। বর্ত্তমানে রত্নেশ্বরের সংসারে রাধামতি একা; কন্যা ভিন্ন তাঁহাকে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল দিবার অন্য কেহ নাই। স্ত্রী-বিয়োগ জনিত শোকে অধীর হইয়াই তিনি তৎকালে বৈবাহিক সমীপে অনুনয় বিনয় করিয়া, কন্যাকে গৃহে রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে চন্দ্রনাথ লোক পাঠাইয়াছেন, কোন ওজর আপত্তি না করিয়া, শুভ দিনে শুভক্ষণে কন্যাকে জামাতৃগৃহে পাঠাইলেন। সাংসারিক কাজ কর্ম্ম সমুদয়ই কামিনী দ্বারা সম্পাদিত হইতে লাগিল, রত্নেশ্বর নিজ হস্তেই রন্ধনাদি করেন।

এদিকে রাধামতি ভর্তৃগৃহে যাইয়া, পিতার অদর্শনে বিষণ্ণা; কিন্তু সে মনোকষ্ট কিরূপে নিবারিত হইতে পারে? নারীজাতি চির পরাধীনা! রাধামতি শ্বশুরালয়ে দিনাতিপাত করিবেন, ইহাই তাহার আত্মীয় স্বজনের একমাত্র কামনা। শ্বশুরালয়ে কন্যার ভরণ পোষণ, সীমন্তিনীনিদর্শন সিঁথির সিন্দূর ও বামহস্তের লৌহবলয়—তাঁহার আত্মীয় সকলেরই প্রার্থনীয়। বাল্যাবধি রাধামতি সুখ-সম্ভোগে দিন যাপন করিয়াছে, পতিগৃহে স্বেচ্ছায় কোন কার্য্যই হইতে পারে না; তাহাকে শাশুড়ী, ননদিনীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিতে হইবে, একারণ রাধামতি মনে মনে সদাই অসুখী। গুরু লোকের অধীনে থাকিয়া তিনি অবশ্য আজ্ঞাবাহিনী। স্বামীগৃহে বিলাস-ভোগ—তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে। রাধামতির শ্বশুরালয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের কোন কষ্ট ছিল না; কিন্তু শাশুড়ী ননদিনীর বাক্যগঞ্জনায় তিনি মর্ম্ম-পীড়িতা হইতেন। অভ্যাস বশতঃ আলস্যপ্রিয়তায় তিনি সদাই অসুখী, একারণ গুরুজন কর্ত্তৃক ভৎসিত হইয়া রাধামতি স্বামী সকাশে বিলাপ করিত। ফণীন্দ্রনাথ সুধীর সুমতি, লেখাপড়ায় পণ্ডিত—আত্মীয় স্বজন

সকলেই তাঁহার সৌজন্যে মোহিত! তিনি রাধামতিকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন, প্রিয়তমার চিত্তবিনোদনে সযত্ন। যাহাতে স্ত্রীর কোন দুঃখ বা মনস্তাপ না হয়, ফণীন্দ্রনাথ বিদ্যালাভ অপেক্ষা তাহাই জীবনের সার জানিতেন। কিন্তু অভাগিনী রাধামতি ভাগ্যদোষে ঈদৃশ কর্ত্তব্যপরায়ণ পতির প্রেম লাভে বঞ্চিতা; যুবতী স্বামীর সহিত সৎ ব্যবহার করিত না, ফণীন্দ্রকে দেখিলেই তাহার ক্রোধ হইত। ফণীন্দ্র প্রাণপণে সহধর্ম্মিণীর অনুরাগভাজন হইবার চেষ্টা করিয়াও তাহার প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই।

ফণীন্দ্রনাথ পত্নীকে অহোরহ হিতোপদেশ দিতেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, সহধর্ম্মিণী লেখাপড়া শিখিয়া স্বামীভক্তির মহিমা বুঝেন, তিনি রাধামতিকে মনের মত শিক্ষিতা করিতে—সযত্ন হইলেন। স্ত্রীকে গুণবতী করিবার অভিপ্রায়ে যথাসাধ্য ফণীন্দ্রের চেষ্টা; মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণাদি পৌরাণিক ঘটনাবলী হইতে সতী-চরিত্র উল্লেখ করিয়া পত্নীকে গল্পচ্ছলে ফণীন্দ্রনাথ কত উপদেশ দিতেন; কিন্তু স্বামীর এরূপ কথায় রাধামতি আদৌ আস্থা প্রদান করিত না। পতির এরূপ অনুরাগ সত্ত্বেও তাঁহার মনক্ষুণ্ণ করিতে যুবতী সচেষ্টিতা। এমন কি তাহার উৎপীড়নে ফণীন্দ্রনাথের কোন কোন রাত্রি আদৌ নিদ্রা হইত না, সারা রজনী জাগরিতাবস্থায় কাটিত। এরূপ পীড়ন সত্ত্বেও রাধামতি ফণীন্দ্রের হৃদয়-মন্দিরের উপাস্য দেবী। সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও, ফণীন্দ্র স্ত্রীর প্রতি কদাচ বিরক্ত হইতেন না; প্রিয়ার মনোরঞ্জন করিতে, অনুরাগ ভাজন হইতে— ফণীন্দ্রের কোন ত্রুটি ছিল না। তাহাতে ফণীন্দ্র বাল্যাবধি পিতামাতার আজ্ঞাকারী। বিলাস বিভোগে তাঁহার আদৌ স্পৃহা ছিল না, সর্ব্বদাই জ্ঞানচর্চ্চায় তিনি দিনপাত করিতেন। অথচ ভার্য্যার অপরূপ রূপলাবণ্যে তিনি বিহ্বল; প্রাণ তুচ্ছ জানিয়া রাধামতির মনস্তুষ্টি সাধনে ফণীন্দ্র পরাঙ্মুখ নহেন। উত্তরোত্তর স্ত্রীর অনুরাগভাজনে, তাঁহার লেখাপড়ারও ক্ষতি হইতে লাগিল। বিবাহের

গতবর্ষে তিনি এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে বি, এ পড়িতে-ছেন; কিন্তু প্রণয়িনীর রূপসাগরে ভাসিয়া, তিনি নিজ উন্নতির পথ রোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—সে দৃষ্টি এক্ষণে তিনি হারাইয়াছেন।

পূর্ব্বে ফণীন্দ্র যেরূপ যত্ন সহ পাঠাভ্যাস করিতেন, এক্ষণে তৎ সাধনে বিস্তর ত্রুটি ঘটিল, অন্য মনস্ক ভাবেই তাঁহার সময় যাইতে লাগিল। সহ-পাঠিগণ তাঁহার এবম্বিধ চিত্ত বৈকল্যের লক্ষণ দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া, অন্য কথার উত্থাপনে তাহাদিগের কৌতূহল নিবারণ করিতেন। অথচ দিনে দিনে ভার্য্যাজনিত চিন্তায় তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল, বিবেচনা সহ কার্য্য করিলে, তাঁহাকে সাংসার-ধর্ম্ম পালনে এরূপ বিচলিত হইতে হইত না!

সরল চিত্ত হইলেও, রাধামতির গৃহস্থালী সম্বন্ধে বিজ্ঞতা না থাকায়, সামান্য কারণে যুবতী মনক্ষুণ্ণা হইত। সংসারের প্রিয়বন্ধু স্বামী—তাঁহার বিশ্বাসের স্থল, সেই স্বামী তাঁহাকে যখন স্নেহ করেন—যাঁহার ধারণা যে, আমি যাহাকে ভালবাসি, যাহার অদর্শনে জগৎ অন্ধকারময় দেখি, সে প্রণয়-মূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীভাবে নিত্য বিরাজিতা—অবশ্যই সে আমায় অনুরক্তা; তবে, লোকাচার বা বালস্বভাবপ্রযুক্তই সে আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করে। সময়ে সে আমার আদরের প্রতিশোধ করিলে, তাহার সহিত প্রাণে প্রাণে মিলিয়া অবশ্য একদিন স্বর্গীয় সুখভোগ করিব। আমার রাধামতি—সরলা। তাহার সরল হৃদয়ে চাতুরী নাই—ছলনা নাই। ফণীন্দ্রনাথ মনে মনে এই সকল ধারণা করিয়া, প্রিয়তমার দোষের প্রতি কোন লক্ষ্যপাত করিতেন না; কিন্তু কোন বিষয়ে সংযত হইলে, বিষয়ান্তরে অনুরাগ জন্মে না, এরূপ অবস্থায় রাধামতির অনুরাগভাজন হইতে ফণী-ন্দ্রের একান্ত আগ্রহ। সাংসারিক বিষয় উপেক্ষা করিয়া সহধর্ম্মিণীর মঙ্গল চিন্তাই ফণীন্দ্রনাথ এক্ষণে জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য জানিয়াছেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

একদিন চন্দ্রনাথ-পত্নী বধূমাতাকে কোন এক কার্য্যের ভার প্রদান করেন। আলস্যপ্রিয় রাধামতি তাহাতে মনোযোগী না হওয়ায়, শাশুড়ী ঠাকুরাণীর তিনি অপ্রিয়ভাজন হইলেন। বধূ বা কন্যার পরিণামে উন্নতির চিন্তায় তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখ্যাতির আশায় শাশুড়ী জননী তাঁহাদিগকে এরূপ কার্য্য ভার দিয়া থাকেন, তৎপালনে প্রথমে কোন দোষ হইলে, পুনর্ব্বার সেই কার্য্য সম্পন্ন কালে যাহাতে সেরূপ ত্রুটি না হয়, এই অভিপ্রায়ে দুই একবার তিরস্কার করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমতি কন্যা বা বধূ সেই অনুষ্ঠিত কার্য্যে ত্রুটি লক্ষ্য রাখিলে, ভবিষ্যতে সতর্ক হইয়া থাকে; কিন্তু যাহাদের চরিত্র অপেক্ষাকৃত হীনভাবাপন্ন, তাহারাই গুরুজনের ঈদৃশ হিতকথায় বিরক্ত ও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। শ্বশ্রূঠাকুরাণী বা ননদিনী রাধামতির কার্য্য সংক্রান্ত কোন দোষের কথা উল্লেখ করিলে, সে মনে মনে বিরক্তা হয়। এরূপ ইতর প্রকৃতির লোক নিজ যুক্তি সার জানিয়া—অপরে ভাল করিলেও, তাহার পছন্দমত হয় না। যে দিন রাধামতি গুরুজন আদিষ্ট কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইয়া তিরস্কৃতা হইত, সেই রাত্রে ফণীন্দ্র শয়নাগারে যাইয়া স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া জানিতে পারিতেন যে, রাধামতি রোদন করিতেছে। যুবক রাধামতিকে কাঁদিতে দেখিলেই, সাগ্রহে কারণ জানিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুনয় করিতেন।

একদিন তিনি পত্নীকে এইরূপ বিমর্ষা দেখিয়া কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু রাধামতির মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। যুবতী নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল। সে ব্যথায় ফণীন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত—কখন বা পরিধেয় বস্ত্রে প্রাণেশ্বরীর মুখ মুছাইয়া দিলেন, কখন বা তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ম্রিয়মাণ অবস্থায় বসিয়া থাকিলেন; কারণ জিজ্ঞাসু,

হইয়া ফণীন্দ্র কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। যুবক ভাবিলেন, যিনি প্রিয়ার এই মনোকষ্টের মূল হইয়াছেন, তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিবেন, ইহার প্রতিশোধ লইবেন। কোন মতে প্রিয়াকে তুষ্ট করিতে পারিলে, রাধামতির নয়নাসার নিবারিত হইলে, ফণীন্দ্রনাথ আপনাকে সুখী জ্ঞান করিবেন। অবিরত আরাধনায় দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, উপাসকের কামনা পূর্ণ করেন ! স্বামীর এরূপ সাধ্যসাধনায় রাধামতি উত্তর করিল, "আমার দুঃখের সীমা নাই, সে কথা শুনিয়া—তুমি কি করিবে ?"

রাধামতির এই কয়েকটী কথা শুনিয়া ফণীন্দ্রনাথ যেন আনন্দসলিলে আপ্লুত হইলেন। প্রত্যুত্তর অপ্রিয় হইলেও, যুবক, উৎসুকচিত্তে সবিশেষ, বিবরণ জানিবার অভিপ্রায়ে, বলিলেন, "কেন, আমি যে তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি ! তোমার যদি দুঃখভার লাঘব করিতে না পারিব, তাহা হইলে আমার এ ছার প্রাণধারণে প্রয়োজন কি ? প্রাণেশ্বরি ! কেন কাঁদিতেছ—আমাকে বল !"

তদুত্তরে রাধামতি বলিলেন, "সংসারে যেন কেহ আমার মত দুঃখ ভোগ না করে। আমি অভাগিনী—চিরকাল দুঃখভোগ করিতেই জন্মিয়াছিলাম। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না, এই দণ্ডে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

ফণীন্দ্র। বিনোদিনি ! তুমি আমার ইহজীবনের অবলম্বন ! তোমাকে অসুখী দেখিলে, আমিও যে অসুখী ! কিন্তু, কি জন্য যে মনোকষ্ট পাইতেছ —সে কথাতো কিছুই বলিলে না ?"

রাধামতি। তোমার মত যদি সকলে হইত, তাহা হইলে সংসার চলিত না। এত যে লেখাপড়া শিখিয়াছ, সে কেবল ভস্মে ঘি ঢালিয়াছ ! একটা কথা উঠিলে, যদি তুমি বুঝিতেই না পারিবে, তবে তোমার লেখাপড়ায় প্রয়োজন কি ? আমি কি তোমারই জন্য অসুখী ? সংসারে তোমার যে

মা বোন আছেন, তাঁহাদের কথায় কথায় লাঞ্ছনা আর আমার সহ্য হয় না।

ফণীন্দ্রনাথ এতক্ষণে বুঝিলেন যে, মাতা ঠাকুরাণী সময়ে সময়ে রাধামতিকে সাংসারিক রীতি নীতি শিখাইতে যে তিরস্কার করিয়া থাকেন, তাহাতেই তাহার মনোভার হইয়াছে। কিন্তু, পূজনীয়া জননীকে স্ত্রী সম্বন্ধে তিনি কি বলিতে পারেন? মাতা তাঁহার পরমারাধ্যা! সন্তানের রূঢ় কথায় মায়ের প্রাণ অনুতপ্ত হইবে—ফণীন্দ্র সে কুলাঙ্গার নহেন! ভাবিয়া চিন্তিয়া যুবক কিছু দিনের জন্য স্ত্রীকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন এবং যাহাতে প্রিয়তমার মনোকষ্ট আপাততঃ বিদূরীত হয়, তাহার যথাযথ প্রতিকার হইবে, রাধামতি সমীপে এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। রাধামতিও স্বামীকে প্রতিশ্রুত করাইয়া মনে মনে সন্তুষ্টা হইলেন।

পর দিবস প্রভাতে ফণীন্দ্র কথায় কথায় মাতার নিকট স্ত্রীকে পিতৃগৃহে পাঠাইবার জন্য আকিঞ্চন করিলেন। রাধামতির শ্বশুরালয়ে আগমনাবধি, ফণীন্দ্রের সকল বিষয়েই ঔদাস্য দাঁড়াইয়াছে। যৌবন প্রাবল্যে তিনি প্রণয়িণীর রূপমাধুরীতে মোহিত, সে মোহে বিদ্যালাভে তাঁহার অযত্ন দাঁড়াইয়াছে! পিতামাতা পুত্রের চরিত্র সবিশেষ অবগত; ফণীন্দ্রের ঈদৃশ চিত্তবিকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রনাথ ও গৃহিণী মাতঙ্গিনী পুত্রের মনোগত ভাব ও অবস্থা সম্যক্ বুঝিয়া, বধূমাতাকে সত্বর পিতৃগৃহে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। সে সংবাদে ফণীন্দ্র মনে মনে তুষ্ট হইলেন।

ঊনত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

সরলার আত্মহত্যা হইতেই হেমেন্দ্রের মনে তাদৃশ স্ফূর্ত্তি নাই, সে যেন সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক! বাহ্যিক আমোদ প্রমোদে যে যুবক অহোরাত্র অতি-

বাহিত করিয়াও পরিতুষ্ট হইত না, এক্ষণে সে সকল সুখসম্ভোগে তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। অকস্মাৎ হেমেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তাহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আহার বিহার সংসারীর নিত্য প্রয়োজনীয়; পানভোজনে বিরত হইয়া কেহ দুই দশ দিন থাকিতে পারে না। হেমেন্দ্র পূর্ব্বে প্রচুর আহার করিত, কিন্তু স্ত্রীবিরহে বৎসামান্য খাদ্য সামগ্রী গ্রহণেও তাহার ইচ্ছা হয় না। তদীয় বন্ধুবান্ধব উৎসুকচিত্তে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানে সযত্ন হইলেও, কোন ফল দর্শিল না! সরলার জীবদ্দশায় যাহার পাষাণ হৃদয় একদিনও সহধর্ম্মিণীর কারণ বিচলিত হয় নাই, এক্ষণে সে স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে হেমেন্দ্রের দারুণ মনোবিকার! পরিজনবর্গের কাহারও সহিত হেমেন্দ্রের এক্ষণে কথাবার্ত্তা নাই, যুবক যেন মনোদুঃখে কতই ম্রিয়মাণ! হেমেন্দ্রের পিতামাতা ভাবিলেন যে, পুত্র ভার্য্যা শোকেই এরূপ কাতর; দারপরিগ্রহ করিলে, অন্ততঃ হেমেন্দ্রের এ মনস্তাপ দূর হইবে, অধিকন্তু তাহার চরিত্রের সংশোধন হইতে পারে, তাহাকে আর ইতর সংসর্গে মিলিতে হইবে না। কিন্তু, লম্পট হেমেন্দ্রের হৃদয় ভাব কে বুঝিবে? যুবক একবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে, পরক্ষণে সংসার আশ্রমে থাকিবেনা, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে নিরালয়ে কালক্ষেপ করিবে, কখন বা সে আত্মহত্যা করিতে উদ্যোগী—এই ভাবে হেমেন্দ্রের দিনাতিপাত হইতেছে! দুই একজন বন্ধুর সহিত হেমেন্দ্রের সদ্ভাব ছিল, তাহারা তাহার মনোগত অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে, অকস্মাৎ স্ত্রী-বিয়োগ শোকে তাহার এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য হইয়াছে, এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

দিনে দিনে হেমেন্দ্রের শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল, সাজ সজ্জায় বেশ-ভূষায় আর তাহার সে পূর্ব্ব যত্ন নাই। ললিত রায় মহাশয়ের পরিবার-বর্গের স্বভাব চরিত্র সবিশেষ জানিত। প্রভুপুত্রের চরিত্র-দোষে সে নিজে দুঃখিত, এ কারণ হেমেন্দ্রকে অনুষ্ঠিত কার্য্যে বিরত করিতে, তাহার ক্ষমতায়

কুণায় না। পিতামাতা, ভাইভগ্নী, আত্মীয়স্বজন সকলে মিলিয়া, হেমেন্দ্রের উত্তরোত্তর শোচনার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, যারপরনাই অনুতপ্ত হইলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক দিবস পরেই হেমেন্দ্র ললিত সহ রাত্রিযোগে বাটীর বাহির হইতে আরম্ভ করিল, সুদীর্ঘকাল স্থানান্তরে কাটাইতে লাগিল; এ সংবাদ ললিত ব্যতিরেকে রায় পরিবারের অন্য কেহ জানিতে পারিল না।

ললিত লোকের সহিত সৌজন্য ব্যবহার করে, এ নিমিত্ত সকলেই তাহাকে ভালবাসে। সুরাপানে বিহ্বল হইলে, লোকের চৈতন্য থাকে না। এক দিবস ললিত সুরাপান করিয়া, বিহ্বলাবস্থায় হেমেন্দ্রের বৈঠকখানায় উপস্থিত! মহেন্দ্র তাহার এরূপ বিকৃত ভাব দেখিয়া, উপস্থিতে হেমেন্দ্র যে শোকাচ্ছন্ন ভাব দেখাইতেছে, ইহার সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। ললিত অকপট চিত্তে হেমেন্দ্র সম্বন্ধে সকল কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিল। হেমেন্দ্র যে কোন বারবিলাসিনীর প্রতি একান্ত আসক্ত এবং সেই গণিকা একণে অন্য কোন ভদ্রসন্তানের প্রেমে আসক্তা হইয়াছে, একে একে সকল কথাই প্রকাশ পাইল। অধিকন্তু, সেই গণিকা-প্রেমে বঞ্চিত হইয়া হেমেন্দ্রের যে এরূপ মনক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কথায় কথায় ললিত তাহা স্পষ্ট জানাইল। মহেন্দ্রনাথ ললিতকে পুনর্ব্বার বলিলেন, "তবে এখনও হেমেন্দ্র কি অভিপ্রায়ে বাটী হইতে বহির্গত হয়?" তদুত্তরে ললিত তাঁহাকে বলিল, "সেই বেশ্যা মধ্যে মধ্যে ছোট বাবুর সহিত দেখা করিতে আসে। সে অন্যের রক্ষিতা হইলেও সুযোগমতে তাঁহার সহিত এখনও সাক্ষাৎ করে।"

ললিত প্রমুখাৎ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সবিশেষ পরিচয় পাইলেন, তাহার প্রতি তাঁহার সমধিক ঘৃণা সঞ্চার হইল। হেমেন্দ্রের মনোকষ্টের আরও এক কারণ এই যে, আমোদপ্রমোদে অবশ্য অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু বর্ত্তমানে অভাগার সে পথে কণ্টক পড়িয়াছে। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন

কাহারও নিকট তাহার এক্ষণে এক কপর্দ্দকেরও প্রত্যাশা নাই। বিনাব্যয়ে যে আমোদ লাভ হয়, অগত্যা হেমেন্দ্র তাহাতেই স্বীকৃত!

মহেন্দ্রনাথ ভ্রাতার চরিত্র সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া, মনে মনে ক্ষুণ্ণ; কিন্তু অকস্মাৎ কোন প্রকার প্রতীকার করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত নহে ও সাধ্যাতীত! সংসারের প্রতি বাল্যাবধি হেমেন্দ্রের ঔদাস্যভাব, সর্ব্বদাই সে স্থানান্তরে যাইয়া আমোদপ্রমোদে কালযাপন করিতে ভালবাসে। হেমেন্দ্র ভার্য্যার প্রতি আসক্ত না থাকিলেও, সরলা যে তাহাকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন, সে পতিপ্রাণা যে সংসারে লক্ষ্মী ছিলেন—এ সংবাদ দ্বারকানাথের পরিবারবর্গের কাহারও অবিদিত ছিল না। হেমেন্দ্রের স্ত্রী, সাধ্বীসতী সরলা ইহসংসারে ধিক্কার দিয়া চলিয়া গিয়াছেন! পাষাণহৃদয় দুর্বৃত্ত হেমেন্দ্র অবশ্যই তাঁহার শোকে অভিভূত; স্বভাব দোষে গণিকাপ্রেমে অনুরক্ত থাকিলেও, তাহার হৃদয়ে সে পতিপ্রাণার দিব্যমূর্ত্তি অবশ্য অঙ্কিত! এ সময়ে তাহাকে চরিত্র সম্বন্ধে কোন রূঢ় কথা বলিলে, তাহার বৈরাগ্য সম্ভাবনায়, বিচক্ষণ মহেন্দ্র ভ্রাতাকে কোন কথাই বলিলেন না। অধিকন্তু, যাহাতে তাহার শরীর সুস্থ থাকে, মনোবিকার বিদূরিত হয়, সেই ব্যবস্থায় তিনি সতত হইলেন। রায় মহাশয় বিষয় কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, পারিবারিক ব্যাপারে সংসৃষ্ট থাকিতে তাঁহার অবকাশ হয় না, এক্ষণে তদ্বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ স্পৃহাও নাই। হেমেন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হইলেও, উপস্থিত যাহাতে তাহার দৈহিক কোন প্রকার কষ্ট না হয়, সুখস্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারে, রায় মহাশয় সে বন্দোবস্তের কোন অংশে ত্রুটি করেন নাই।

ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

ফণীন্দ্রনাথ রাধামতিকে হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়াও তাহার ভালবাসা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। কত শতবার পত্নী তাঁহার প্রতি অন্যায়

ব্যবহার করিয়াছে, তথাপি সরলমতি ফণীন্দ্র রাধামতির প্রতি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নাই। বিবাহ বাসরে ফণীন্দ্র রাধামতিকে যে শুভ চক্ষে দেখিয়াছেন, সেই ভাবেই এতাবৎ কাল দেখিয়া আসিতেছেন। ভার্য্যার সহস্র দোষও তাঁহার পক্ষে মার্জ্জনীয়! তিনি এক দিনের জন্য রাধামতিকে কোন কটূক্তি প্রয়োগ করেন নাই। রমণী—আদরের সামগ্রী, যত্নের নিধি ও কোমল হৃদয়া; পুরুষের পরুষ বাণী কামিনীর অসহ্য!—মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, ফণীন্দ্র যাহাতে রাধামতির হৃদয় বিচলিত হয়, কদাচ এরূপ কথার উত্থাপন করিতেন না। কিন্তু সংসারে এক পক্ষ সরলতাপূর্ণ, অপর পক্ষ কপটতার ভীষণ চিত্র। এ উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন বড়ই সুকঠিন, তাহাতে ফণীন্দ্র ভার্য্যা প্রমুখাৎ অবগত যে, তাঁহার পূজনীয়া জননীই এ মনোমালিন্যের কারণ! সুবোধ সন্তান সহধর্ম্মিণীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইলেও, স্ত্রীর আনুকূল্যে গর্ভধারিণীকে কোন কথা কহিতে সাহস করিতে পারে না! বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহাতে সেরূপ ঘটনা পুনরায় সংঘটিত না হয়, তদ্বিষয়েই সবিশেষ দৃষ্টি রাখে।

রাধামতির শ্বশ্রূঠাকুরাণী বধূর পরিণামে মঙ্গল কামনায় কখন কখন সাংসারিক কার্য্যসূত্রে তাহাকে তিরস্কার করিয়া থাকেন; কিন্তু রাধামতি সে ভাব ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করে, সে ধারণায় আপনার অনিষ্ট সে আপনিই উপস্থিত করে! ফণীন্দ্রনাথের এক পক্ষে প্রাণাধিকা যুবতী ভার্য্যা, অন্য-পক্ষে জগদ্ধাত্রী স্বরূপিণী স্নেহময়ী মাতৃদেবী। পরস্পর বাদ বিবাদ ভঞ্জনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইলে, ফণীন্দ্র স্বার্থত্যাগ স্বীকারই মঙ্গল জানিয়া গৃহ পরিত্যাগে মনস্থ করিলেন। ইতোপূর্ব্বে মাতার সহিত স্ত্রীর যাহাতে মনোমালিন্য না হইতে পারে, এই বিবেচনায় বসুজ পুত্র কৌশলক্রমে জননীর অনুমতিক্রমে রাধামতিকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। তদবধি কয়েক মাস রাধামতি মিত্রজ মহাশয়ের বাটীতেই লালিতপালিত হইতেছিল, কিন্তু সমাজ

ধর্ম্মে শ্বশুরালয়ে না থাকিলে, রাধামতির চলিবে কেন? সংসারের শোভা বধূমাতাকে বাটীতে না আনিয়া, চন্দ্রনাথই বা কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? অগত্যা রাধামতি পুনরায় পতিগৃহে আসিয়াছিল, কিন্তু দুই দশ দিনের মধ্যেই শ্বশুর শাশুড়ীর সহিত তাহার পুনরায় মনান্তর ঘটে। এরূপ অবস্থায় ফণীন্দ্রনাথ চিত্ত স্থির রাখিতে না পারিয়া গৃহত্যাগী হইয়া যে, কোথায় যাইলেন, বহু স্থান অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন সন্ধান হইল না। রাধামতির পতির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলেও, ফণীন্দ্র বিরহে সমধিক শোক কাতরা হইয়া পড়িলেন। চন্দ্রনাথ গৃহিণী সহ পরামর্শ করিয়া কিছুদিনের পর বধূমাতাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

রাধামতি পিতৃগৃহে থাকিয়া স্বেচ্ছামত কাজকর্ম্ম করে। দোষের কথা উল্লেখ করিয়া, তাহাকে কোন কথা বলিতেও কেহ নাই! চন্দ্রনাথ পুত্রশোকে জর্জ্জরিত, উপযুক্ত সন্তান গৃহত্যাগী হইয়াছেন, কি সুখে তিনি আর সংসারে থাকিবেন? পুত্রের বিবাহই এই অনর্থের মূলকারণ—প্রতিকারের উপায় না পাইয়া, মনোদুঃখেই দম্পতি ও তদীয় পত্নীর কালাতিপাত হইতে লাগিল। বধূমাতাকে লইয়া স্ত্রী পুরুষে যে সাধ আহ্লাদ করিবেন, ফণীন্দ্রের অভাবে তাঁহার সে সুখ সম্ভোগে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। এক্ষণে রাধামতিকে দেখিলেই, তাঁহার শোকের উচ্ছ্বাস প্রবল বেগে বহিতে থাকে, সাত পাঁচ ভাবিয়া রাধামতিকে নিজ বাটীতে রাখেন নাই, পিত্রালয় হইতে বধূমাতাকে লইয়া আসিবার জন্য, আর কোন কথাও উত্থাপন করেন না। তথাচ স্নেহবশে সময়ে সময়ে বৈবাহিকের বাটীতে খাদ্য সামগ্রী পাঠাইয়া বধূমাতার তত্ত্বাদি গ্রহণ করেন।

এই ভাবেই দিনপাত হইতেছে। রাধামতি পিতৃগৃহে—কিন্তু, সময়ের ধর্ম্ম কে লঙ্ঘন করিবে? এক্ষণে রাধামতি—পূর্ণ যুবতী। আহার বিহারে শরীরের পুষ্টিসহ উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে! অন্যপক্ষে দুষ্টমতি কামিনী

তাহার সহচরী! সময়ে সময়ে তাহার সহিত রাধামতির নানাবিধ রসালাপও হইয়া থাকে। বঙ্কেশ্বর এ ব্যাপারের কোন সংবাদই রাখেন না। ভার্য্যা-বিরহে তিনি পবিত্র ভাবেই দিন যাপন করিতেছেন, দুঃখে কষ্টে দশ টাকা উপার্জ্জনে, তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। সংসারে একমাত্র দুহিতা, আপনি ও পরিচারিকা। পরিশ্রমান্তে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার সময়ের অধিকাংশ বাহিত হয়।

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

ইতোপূর্ব্বে হেমেন্দ্র কোন সুযোগে কামিনীর সাক্ষাতে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিল, অধিকন্তু সফল মনোরথ হইলে, তাহাকে উচিত মত পুরস্কৃত করিতে অঙ্গীকারও করিয়াছিল। এইরূপ কার্য্যে কামিনী সুপটু, সে বৃদ্ধা হেমেন্দ্র প্রমুখাৎ সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া, আনন্দিতা হইয়াছিল!

রাধামতির উপর কামিনীর সম্পূর্ণ আধিপত্য; বৃদ্ধা যুবতীকে যেভাবে চালাইতে ইচ্ছা করে, অগ্রপশ্চাৎ না চাহিয়া রাধামতি তাহাই করে। কামিনী হেমেন্দ্রের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া, কয়েক দিবস রাধামতির সহ সমধিক প্রেমরসালাপ করিতেছিল। রাধামতি পূর্ণযৌবনা হইলেও, কামিনীর অভিসন্ধি সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই। প্রতিদিন কামিনী রাধামতির সহিত এই ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে থাকে, যুবতী নির্ব্বাক্ হইয়া সেই সকল কথা আগ্রহে শুনে।

কথাপ্রসঙ্গে কামিনী একদিন রাধামতিকে ফণীন্দ্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। ফণীন্দ্রের গৃহত্যাগ কালে রাধামতি তাদৃশ অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই। পতি যে পত্নীর আদরের সামগ্রী—আরাধ্য দেবতা, স্বামী সোহাগই যে রমণীর সুখসম্ভোগের মূল কারণ—সে চিন্তা তৎকালে তাহার তরুণ

হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র অঙ্কিত হয় নাই। তাহাতে বিবাহকালাবধি রাধামতি স্বামীকে অযত্ন করিত; কিন্তু এক্ষণে তাহার সে পূর্ব্ব সংস্কার লোপ পাইয়াছে! ফণীন্দ্র তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন ও যত্ন করিতেন; অভাগিনী নিজ দোষেই সে স্বামীসোহাগে বঞ্চিতা হইয়াছে, স্বামী যে তাহার জন্য সংসারসুখ-বাসনায় উপেক্ষা করিয়া, নিরুদ্দেশ হইয়াছেন—বয়োবৃদ্ধি সহ রাধামতি-হৃদয়ে পতির সে প্রিয়মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথমে রাধামতি স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করে নাই, এক্ষণে কোন সুযোগে ফণীন্দ্রের সাক্ষাৎ হইলে, আর তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল হইতে দিবে না, পতি-প্রেম-বিধুরা যুবতী এক্ষণে উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেই পতির সাক্ষাৎ প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতেছে, পিতৃগৃহে স্বেচ্ছামত পান ভোজনেও তাহার মনে সে সুখ হয় না। পতি যে নারীর জীবন সর্ব্বস্ব, শান্তিসদন ও জীবনানন্দ—রাধামতি এক্ষণে সে মর্ম্ম, সে ধর্ম্ম সম্যক্ বুঝিয়াছে।

কামিনী ফণীন্দ্রের কথা লইয়া রাধামতির সহিত সময়ে সময়ে পরিহাস করে, কিন্তু যুবতীর হৃদয়ে সে কথা শক্তিশেল সম বিদ্ধ হয়। বৃদ্ধা রাধামতিকে প্রকৃতই পতিবিরহে মলিনা বুঝিয়া, কথায় কথায় বলিল, “আজ রাত্রিতে তোমার স্বামীর সহিত সাক্ষাত হইবে।” রাধামতি বহুকালাবধি পতি-প্রেমে-বঞ্চিতা, অকস্মাৎ দাসীর মুখে পতির কথা শুনিয়া, সে উত্তর করিল, “কামিনি! আমার সহিত এ পরিহাস কেন? তিনি আজ ছয় সাত বৎসর নিরুদ্দেশ—এতকাল তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না! আজ কেমন করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে?” তদুত্তরে কামিনী বলিল, “আচ্ছা, আজ রাত্রেই আমি তোমাকে ফণীন্দ্র বাবুর সহিত দেখা করাইয়া দিব, কোন কথার প্রয়োজন নাই। তুমি তখন জানিবে—আমার কথা সত্য কি মিথ্যা!

রাধা। কামিনি! তুমি দেখাইবে—তবে আমি দেখিব? তিনি কি আমায় দেখা দিবেন না? অধিনীর অপরাধ কি তিনি এখনও ভুলিতে

পারেন নাই! ভাল—তিনি কি আমাদের বাটীতে আসিবেন না? তুমি দেখাইবে শুনিয়া, আমার যে সন্দেহ হয়!

কামিনী। রাধা দিদি! ফণীন্দ্র বাবু অনেক দিনের পর দেশে ফিরিয়াছেন। এখন কি আগেভাগে তোমার সহিত—দেখা করিতে পারেন? কাল সন্ধ্যার সময় তাঁহার দেখা পাইয়াছিলাম; আজি রাত্রে তিনি তোমার সহিত দেখা করিয়াই, ঘরে যাইবেন।

রাধা। কামিনি! তিনি আমাকে দেখিতে আসিবেন না, তবে তাঁহাকে আমি কেমন করিয়া দেখিতে পাইব? তুমি বলিতেছ—তিনি দেখা দিয়াই চলিয়া যাইবেন! তোমার এসব কথা আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!

কামিনী। সে সকল কথায় তোমার প্রয়োজন কি? স্বামীর জন্য কাতরা হয়েছ, ফণীন্দ্র বাবুর দেখা পাইলে। তার পর, তোমার মনে যা আছে—করিও।

এই কথা শুনিয়া রাধামতি কামিনীকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। যুবতী পতির সহিত পুনরায় মিলিত হইবে, এই শুভ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া—বিবিধ বেশ ভূষায় সজ্জিতা হইল ও প্রতিমুহূর্ত্তে রজনীর অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে কামিনী গত রাত্রিতে হেমেন্দ্রের সহিত পরামর্শে স্থির করিয়াছিল যে, রাধামতিকে পতিদর্শন প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া, বাটী হইতে বাহিরে লইয়া যাইবে। তথায় হেমেন্দ্র, ললিতচন্দ্র সহ একখানি গাড়ী লইয়া অপেক্ষায় থাকিবে। রাধামতিকে লইয়া কামিনী সেখানে উপনীত হইবামাত্র, তাহারা তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে। দুশ্চারিণী কামিনীর পক্ষে অসাধ্য সাধন কিছুই নাই!

বহুকালের পর রাধামতি পতি সকাশে উপস্থিতা হইবে, ফণীন্দ্রনাথ,

সম্ভবতঃ লজ্জা ভয়ে তাহার সহিত কোন কথাই কহিবেন না। স্বামীর অধোমুখ দেখিয়া, রাধামতির যাহাতে মন বিচলিত না হয়, পতির অভিপ্রেত কার্য্যে তাহার কোন দ্বিধা না জন্মে—ইত্যাদি নানা বিষয়ে কামিনী রাধামতিকে শিখাইল। কামিনী প্রমুখাৎ গৃহিমধ্যে স্বামী সাক্ষাৎ—এই কথা শুনিয়া, রাধামতি কথঞ্চিৎ কুণ্ঠিতা হইল; অধিকন্তু পিতার আদেশ না লইয়া, সে এরূপ কার্য্যে কিরূপে সম্মতা হইতে পারে? কিন্তু যুবতী স্বামীর অদর্শনে পাগলিনীপ্রায় হইয়াছে, অকস্মাৎ তাহার মনোরথ পূর্ণ হইবে—এই সংবাদে এক্ষণে তাহার চিত্তবৈকল্য উপস্থিত! তাহাতে এ কার্য্যে যখন কামিনী সহায়তা করিতেছে, অবশ্যই রাধামতির মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। অধিকন্তু বিশ্বস্তা পরিচারিকা তাহাকে কখন বিপদ্‌গ্রস্ত করিবে না, এই ভাবিয়া স্বামী দর্শন লালসায় যুবতী এতৎ সম্বন্ধে আর কোন আন্দোলন করিল না, কতক্ষণে প্রাণকান্তের দেখা পাইবে, সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তাহার কালক্ষেপ হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল, জগৎ অন্ধকারে পূর্ণ হইল, পথ ঘাটে লোকের যাতায়াত অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইতে লাগিল। নিশাগমে রাধামতির হৃদয়ে অধিকতর আনন্দ সঞ্চার হইল; অবিলম্বে স্বামী সাক্ষাৎ হইবে, বিরহ-বিধুরা চিত্তশান্তি লাভ করিবে! এতক্ষণ রাধামতি পতিচিন্তায় কালাতিপাত করিতেছিল, পতি সহবাসে পরমানন্দ লাভ হইবে, রমণী মনে মনে এই জল্পনা কল্পনা কতই করিতেছিল।

সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালেই রাধামতির আহারাদি হইয়া গিয়াছে, হিতৈষিণী কামিনী কতক্ষণে তাহাকে স্বামীসকাশে উপস্থিত করিবে—সেই শুভক্ষণ অপেক্ষায় রহিয়াছে। এমন সময়ে কামিনী তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাধামতি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া, সমধিক ব্যগ্রতাসহ সাদর সম্ভাষণে

বাটীর বাহিরে যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার কথায় কামিনী যাই-বার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে শুনিয়া, রাধামতি সত্বর পদবিক্ষেপে তাহার অনুগামিনী হইল।

বক্কেশ্বর সন্ধ্যাকালে আহারাদি করিয়া বহির্ব্বাটীর দ্বারদেশে জনৈক বয়স্য সহ দ্যূত ক্রীড়ায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। রাধামতি কামিনী সহ বাটী হইতে যে বহির্গতা হইল, সে সংবাদ তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না।

দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্রনাথ, ললিতের মুখে ভ্রাতার পূর্ব্বাঘটিত বৃত্তান্ত সম্যক্ অবগত হইয়া কাহারও নিকট সে কথার উল্লেখ করিলেন না। তিনি মনে মনে সেই কথার আন্দোলন করিয়া দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলেন।

হেমেন্দ্র স্ত্রী-বিয়োগ-শোকে একান্ত অভিভূত, দিনে দিনে তাহার শরীর দুর্ব্বল হইতেছে, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে তাহার চিত্তশান্তি হইবে, অসৎসঙ্গে যে গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, এক্ষণে সম্ভবতঃ তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সে সব অসার আমোদ প্রমোদে হেমেন্দ্র এক্ষণে আসক্ত না হইতে পারে, দ্বারকানাথ এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ জন্য চেষ্টা পাইলেন। পুত্র অসৎ হইলেও, পৈত্রিক স্নেহে বঞ্চিত হয় না! রায় মহাশয় হেমেন্দ্রের নামে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন; কিন্তু পুত্রের উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া, তিনি স্ফূর্ত্তিহীন হইয়াছেন। হেমেন্দ্র এতাবৎকাল আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া স্ত্রী-বিয়োগের দিন হইতে অচৈতন্য, অকর্ম্মণ্য প্রায় গৃহেই থাকে। আহার বিহারে তাহার প্রীতি নাই, সে যেন সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ! পুত্রের অবস্থা দ্বারকানাথ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যাহাতে সে নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদে লিপ্ত থাকে, এই চেষ্টায় তাহার সমবয়স্ক ললিতচন্দ্রকে ডাকাইয়া সেইরূপ

বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মহেন্দ্রনাথ পিতার ঈদৃশ ব্যবহারে মনে মনে বিরক্ত হইলেন, কিন্তু ভ্রাতা সংক্রান্ত কোন কথার উত্থাপন করেন নাই।

এক্ষণে হেমেন্দ্রকে পয়সার জন্য বিশেষ ভাবিতে হয় না, প্রয়োজন মতে পিতৃসমীপে অর্থাভাব জানাইয়া, সময়ে সময়ে ললিতচন্দ্র সংযোগে ২০।২৫ টাকা হস্তগত করিয়া থাকে। কিন্তু, যে জন্য তাহার অর্থের প্রয়োজন, সে পক্ষে গোলযোগ বাধিয়াছে! পিতৃদত্ত অর্থের সামান্যমাত্র ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট এক্ষণে হেমেন্দ্র সঞ্চয় করিতেছে।

সর্ব্বসন্তাপ-হারিণী অর্থের কি মোহিনী শক্তি! টাকার জন্য লোকে অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া থাকে, সংসারে যত কিছু দুঃসাহসিক কার্য্য সাধিত হয়; অনেক স্থলে অর্থ সে অনর্থের মূল কারণ! জীবন ধারণে, সমাজ রক্ষায় অবশ্য অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু সেই টাকা সকল অনিষ্টের সূত্রপাত করে! শোক-ছলনায় স্নেহময় বৃদ্ধ পিতার নিকট হইতে হেমেন্দ্র অর্থ আত্মসাৎ করায়, এক্ষণে তাহার সাহস বাড়িয়াছে। রায় মহাশয় পুত্রকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া, কথঞ্চিৎ আনন্দিত হইয়াছেন। হেমেন্দ্র মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরে বেড়াইতে যায়, অসৎ সঙ্গে, কখন না কলুষিত আমোদে লিপ্ত হইয়া থাকে। রায় মহাশয় পুত্রানুষ্ঠিত কার্য্যে দৃষ্টি রাখিয়াও তৎসম্বন্ধে উপেক্ষা করেন। তিনি পুত্রকে সানন্দচিত্তে কালক্ষেপ ও আহার বিহার করিতে দেখিলেই সুখী!

যে দিবস কামিনীর সহিত হেমেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় এবং তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া, স্থানান্তরিত করিবার পরামর্শ হয়; সেইদিন হইতে হেমেন্দ্র বাটী প্রবেশ করে নাই। এক্ষণে পিতৃদত্ত অর্থও কিছু তাহার হস্তগত হইয়াছে; আপাততঃ কয়েক দিন আমোদ প্রমোদে চলিবে, তাহাতে রাধামণিকে হস্তগত করিতে পারিলে, তাহার বহুদিনের মনোসাধ পূর্ণ হইবে। সেই চিন্তায় হেমেন্দ্র এক্ষণে ব্যস্ত, আগামী রজনীতে তাহার মনস্কামনা পূরণ

হইবে। কামিনী রাধামতিকে হস্তগত করিতে যেরূপ পরামর্শ দিয়াছে, সেই মত হেমেন্দ্র প্রস্তুত হইতেছে। ললিতচন্দ্র হেমেন্দ্রের বিশ্বস্ত অনুচর, তাহার নিকটে হেমেন্দ্রের কোন কথাই অব্যক্ত থাকে না! সরলার মৃত্যু দিবস হইতে ললিত হেমেন্দ্রের একমাত্র বন্ধু, যখন যে কোন বিষয়ে পরামর্শ করিতে হইবে, ললিতের অভিপ্রায় সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইয়া থাকে। কামিনী হেমেন্দ্রের সহিত যখন সাক্ষাৎ করিয়াছিল, ললিত তখন তথায় উপস্থিত ছিল। হেমেন্দ্র ললিত চন্দ্র সহ রাধামতিকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইবার পরামর্শ স্থির করিয়াছে, ললিতও এ সকল কার্য্যে উদ্যোগী ও অগ্রণী হইয়াছে। যথা সময়ে হেমেন্দ্র ললিতচন্দ্র সহ একখানি ঘোড় গাড়ীতে চাপিয়া, বক্রেশ্বরের বাটীর কিঞ্চিৎ অন্তরালে অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইল।

যথাসময়ে রাধামতিকে লইয়া কামিনী তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, হেমেন্দ্র রাধামতির প্রতি একবার মাত্র নিরীক্ষণ করিয়া, অগ্রসর হইল। রাত্রির অন্ধকারে স্পষ্ট কিছুই দেখা গেল না। সরলা রাধামতি পাপমতি দ্বারকা-পুত্রকে স্বামী জ্ঞানে, তাহারই পদ ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল! এরূপ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়াও স্বামী কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া, রাধামতি কামিনীর প্রতি চাহিয়া রহিল। বহুদিনের ঈপ্সিত সাধ পূর্ণ হইবে, পতিপ্রেমে যুবতী আনন্দসাগরে ভাসিবে, এইরূপ প্রবোধ বাক্যে সহচরী মিত্রজকন্যাকে গাড়ীতে উঠিবার জন্য আকিঞ্চন করিল। রাধামতি কামিনীর কথায় কিঞ্চিৎ বিস্মিতা হইল, ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। গাড়ীতে আরোহণ করিতে যুবতী অস্বীকৃত, দাসীর কথায় রাধামতির অনিচ্ছা জানিয়া, ললিতচন্দ্র অপ্রকাশে শকটের অপর পার্শ্ব দিয়া নামিয়া অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিল। কামিনী হেমেন্দ্রকেই রাধামতির স্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল, একারণ বৃদ্ধা যুবতীকে পুনঃ পুনঃ শকটারোহণের

নিমিত্ত আকিঞ্চন করায়, রাধামতি গাড়ীতে উঠিল। কামিনীও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে চাপিল, ইত্যবসরে ললিতচন্দ্রও সেই গাড়ীর পশ্চাৎভাগে আরোহণ করিল।

রাধামতি কামিনী সহ শকটে আরোহণ করিবামাত্র, অশ্বচালক দ্রুত-বেগে অশ্ব চালাইল. আরোহীগণ সকলে মৌনভাবাপন্ন, কাহারও মুখে কোন কথা নাই! সরলা রাধামতি গৃহস্থের কন্যা, কামিনী যে সেই অবলার সর্ব্ব-নাশ সাধনে উদ্যোগী হইয়াছে, সে কথা সে কিছুই জানে না। হেমেন্দ্রকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, রাধামতি পরিচারিকাকে গোপনে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; কিন্তু সে দুশ্চারিণী বৃদ্ধা যুবতীর কথায় আদৌ কর্ণপাত করিল না। দ্রুতবেগে শকট চলিতেছে, কামিনী যেন সেই গাড়ীর চক্রের ঘর্ঘর শব্দে বধির হইয়াছে, ভীতস্বভাবা রাধামতি যে তাহাকে বারম্বার ডাকিতেছে, জিজ্ঞাসা করিতেছে, তৎপ্রতি তাহার লক্ষ্যও হইল না! এরূপ ব্যাপারে রাধামতির মনে অতিশয় সন্দেহ হইল। যে স্বামী রাধামতিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, তাহার সুখ সাধনই যাহার মুখ্য চিন্তা—সেই পতি কল্যাণ সম্বন্ধে ভয়বিহ্বলা রাধামতি কাতর কণ্ঠে দাসীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে—বৃদ্ধা তাহার কোন কথায় উত্তর দিতেছে না। পতিপ্রাণ স্বামী সম্বন্ধে রাধামতি এরূপ ব্যাকুলা, শঙ্কিতা! সাত পাঁচ ভাবিয়া রমণী নিদারুণ চিন্তায় অভিভূতা, তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুধারায় বিগলিত।

গভীর রজনী—পথে জনমানব নাই, কাহাকেও ডাকিয়া যে অবলা সন্দেহ ভঞ্জন করিবে, নিরাশ্রয়ে আশ্রয় পাইবে—সে উপায়ও দেখিতেছে না! রাধামতির হৃদয়োদ্বেগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হওয়ায়, রমণী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। হেমেন্দ্র রাধামতিকে এ সময়ে মনের কথা না জানাইলে, পরিণামে বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া, কামিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। ইত্যবকাশে রাধামতি দুর্দ্দান্ত হেমেন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া

পড়িল। যুবতী এতাবৎকাল হেমেন্দ্রকেই স্বামী বলিয়া স্থির জানিয়াছিল; কিন্তু পতি কেন কোনকথা কহিলেন না, এজন্য তাহার মনে ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। পাষণ্ড হেমেন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া, তাহার সকল সন্দেহ দূর হইল। যুবতী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, ভয়ে ও ক্রোধে তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিল। কোন সুযোগে সেই দুরাচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেই, রাধামতির সকল ভাবনা চিন্তা ঘুচিয়া যাইত!

কুহকিনী কামিনী রাধামতিকে বিবিধ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল, কিন্তু রাধামতি এক্ষণে তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, গাড়ী হইতে নামিবার জন্য চেষ্টা পাইল। কোন উপায়ে রাধামতির প্রাণবায়ু যদি দেহ-মুক্ত হয়, সতী আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে! রাধামতির উত্থানকালে নিষ্ঠুর হেমেন্দ্র তাহাকে সবলে ক্রোড়দেশে বসাইয়া মিষ্টালাপে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু যুবতী কিছুতেই শান্ত হইল না।

বাল্যাবধি রাধামতি সুমতির সহিত একত্র খেলিয়াছে; এক সময়ে হেমেন্দ্র তাহাকে অন্তরালে পাইয়া মনোরথ পূর্ণ করিতে চেষ্টায় ছিল, সে কথা এক্ষণে রাধামতির স্মৃতিপথে জাগ্রত হইল। হেমেন্দ্রের স্বভাবও যুবতী সম্যক্ জ্ঞাত ছিল। একে গৃহস্থের কুলবধূ ও দুহিতা, তাহাতে নিশাকালে পথিমধ্যে নিরাশ্রয়া ও অসহায়া! পাপীয়সী কামিনী হেমেন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করিতেছে—গোলযোগ বুঝিয়া, ললিত শকটের পশ্চাৎভাগ হইতে সম্মুখে আসিল এবং হেমেন্দ্রের ইঙ্গিতে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এক্ষণে তাহারা তিন জনে মিলিয়া রাধামতিকে সান্ত্বনা করণে উদ্যোগী হইল; একাকিনী রমণী রাধামতি এ বিপদ্‌কালে প্রাণত্যাগই—পাপাচারীদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় স্থির করিল। জালজড়িত পক্ষী যেরূপ কিরাত দর্শনে প্রাণভয়ে বিহ্বল হইয়া থাকে, ভয়চকিতা রাধামতি সেইরূপ তাহাদের হস্ত হইতে কোন উপায়ে উদ্ধার পাইতে চেষ্টা পাইল। কামিনী

মিত্রজের অন্নে বহুকালাবধি প্রতিপালিত, রাধামতি সে বৃদ্ধাকে আত্মীয় সদৃশ দেখে, তাহার কথার অমান্য করে না; এক্ষণে সেই বিশ্বাসঘাতিনী কামিনী তাহার সর্ব্বনাশে সহায়তা করিতেছে দেখিয়া, রাধামতি আশ্চর্য্যান্বিতা হইল।

যুবতীর রোদন, কাতরতা ও অনুনয় বাক্যে তাহাদের কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইল না; রাধামতি দুশ্চিন্তায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। অবলার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া পাষণ্ড হেমেন্দ্র মনে মনে স্থির করিল যে, তাহার অভিসন্ধি পূরণের ইহাই উপযুক্ত সময়। দুর্ব্বৃত্ত রাধামতির প্রতি অত্যাচার সাধনে উদ্যোগী হইলেও, সতীর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে তাহার সাহস কুলাইল না!

মূর্চ্ছিতা রাধামতির এক্ষণে বিলাপধ্বনি নাই! যুবতী স্পন্দহীনা—নীরবে পতিতা; পার্শ্বে কামিনী তাহার চৈতন্য সম্পাদনে সেবা শুশ্রূষায় সংযতা। রজনী শেষ হইয়া আসিল! শকটচালক চর্গাণর গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া সারা রাত্রি গাড়ী চালাইয়া, ঊষার সমাগমেই শালিখার খেয়া ঘাটে পৌঁছিল। তদ্দণ্ডে ললিতচন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিল। অজ্ঞানাবস্থায় যুবতী তখনও পতিতা!

ত্রয়োত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

সংসারে ইচ্ছামত কার্য্য করিলে, মনে যখন যাহা উদয় হয়, উদ্যোগী হইয়া তৎসাধনে তৎপর হইলে, কল্পনার সঙ্গেই ক্রিয়ার সহযোগিতা প্রকাশ পায়! এরূপ অবস্থায় দৈবশক্তির প্রাধান্য লোপ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। যাহা মনে উঠে; তাহা পূরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াও অনেক সময়ে অনেককে অকৃতকার্য্য হইতে হয়। কণীন্দ্র সংসার-চক্রে জড়িত হইবামাত্র, পাপ তাপে শান্তি লাভের বাসনায় গৃহত্যাগী হইয়াছেন। পিতা

মাতা তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছেন; তাঁহাদের অনুকম্পায় তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জন হইয়াছে, সেই স্নেহাধার জনক জননীকে না বলিয়া কহিয়া, তাঁহাদের বার্দ্ধক্যাবস্থায় এরূপ ভাবে চলিয়া যাওয়া—তাঁহার পক্ষে কদাচ সঙ্গত নহে। অন্যপক্ষে তিনি রাধামতির পাণিগ্রহণ করিয়াছেন. সে অবলার যাবজ্জীবনের ভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় সংসার-ধর্ম্ম লোকলৌকিকতা সমুদয়ই তাঁহাকে করিতে হইবে। পিতার মত তিনিও এক সময়ে গণ্যমান্য হইবেন, পুত্র পৌত্রাদি লইয়া সংসার পাতিবেন, জনকজননীর বার্দ্ধক্যে সেবা শুশ্রূষা করিবেন। এই সকল কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া, তিনি গৃহত্যাগী হইয়াছেন! এখন তিনি একাকী. অবলম্বনহীন, অর্থোপার্জ্জনে তাঁহাকে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে হইবে! কিন্তু এরূপ সংসারবৈরাগ্যে নিশ্চিন্ততায় সুখ কোথায়? ভগবানের রাজ্য সুখ দুঃখময়, সেই কারণেই হর্ষবিষাদের ঘাত প্রতিঘাতে আন্দোলিত হইয়া কেহ স্বেচ্ছায় কোন কাজ করিতে পারে না। সরল ও উদারচেতা ফণীন্দ্র এবম্বিধ চিত্তচাঞ্চল্যে পরিজন প্রতি বীতানুরাগী হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট কাল নির্জ্জনবাসে, ভগবৎ চিন্তায় যাপন করিবেন, কিম্বা নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন দিয়া, সে মনোবিকারে শান্তি লাভ করিবেন! এইরূপ সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়াই যুবক সাধবীর মায়া মমতা ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বর সহায় না হইলে, কোন কার্য্য সাধিত হয় না।

যে ব্যক্তি বিধির বিধান উপেক্ষা করিয়া—স্বেচ্ছায় কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর, তাহার পক্ষে কোন কার্য্য কদাচ সুসিদ্ধ হয় না। সংসার ত্যাগে ফণীন্দ্র শোকতপ্ত হৃদয়ে আত্মহত্যাই স্থির ভাবিয়াছেন; পরক্ষণে কর্ত্তব্যজ্ঞান সেই মহাপাতকের হন্তারক হইয়াছে। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি দুর্লভ জীবন উচ্ছেদ করিবেন, প্রগাঢ় চিন্তায়, গভীর যুক্তিতে, এরূপ অনুষ্ঠান সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল না। অথচ প্রবল রিপু—ক্রোধ এখনও তাঁহার সর্ব্বশরীরে পূর্ণ

ভাবে বিরাজমান! গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, সম্ভবতঃ পিতা মাতা তাঁহাকে পূর্ব্ব মত স্নেহে দৃষ্টিপাত করিবেন না! বালিকা স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, সুদীর্ঘ সময়ে সে পতিভক্তি শিখিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীপুরুষে বহুদিন দেখা নাই! এই সকল ভাবিয়া ফণীন্দ্র এক্ষণে সংসারে বীতস্পৃহ, আত্ম-হত্যায়ও নীরস্ত হইয়াছেন, দুঃখে কষ্টে জীবন যাত্রা করিয়া, কিছুদিন পরে ফণীন্দ্র জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রাই মনস্থ করিলেন।

বিদেশ যাত্রায় অর্থের প্রয়োজন, ফণীন্দ্র চাকুরী বৃত্তি অবলম্বন করিলে, অবশ্য দশ টাকা সংস্থান করিতে পারিতেন, কিন্তু সে উপার্জ্জনে তাঁহার লক্ষ্য নাই! পর মুখাপেক্ষী হইয়া এতাবৎকাল তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার হস্তে এক পয়সা সংস্থান নাই, অথচ পশ্চিমাঞ্চল গমনে মন্তব্য করিয়াছেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া ফণীন্দ্র হাতের সুবর্ণনির্ম্মিত অনন্ত গাছা পোদ্দারের দোকানে বাঁধা দিয়া, বিদেশ যাত্রার উপযোগী বেশ ভূষাদি ক্রয় করিলেন। বাল্যাবধি বিলাসভোগের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না; প্রয়োজনী মত অভাব পূরণ হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। এসময়ে প্রয়োজন অনুসারে কাপড় জুতা জামা ক্রয় করিয়া, তিনি সর্ব্বপ্রথমে মঙ্গের অভিমুখে যাইলেন।

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

বঙ্কেশ্বর জামাতার নিরুদ্দেশ সংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাঁহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন রাধামতি ফণীন্দ্রের গৃহত্যাগ সংবাদে বিচলিতা! পতিই সতীর জীবন সর্ব্বস্ব, অভাগিনী রাধামতির ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিরত বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন। ফণীন্দ্রনাথ সুবিজ্ঞ, লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তিনি যেঅহিত প্রকৃতি প্রযুক্ত গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার বিরহে বৃদ্ধ

পিতা মাতা, প্রিয়পরিজনবর্গ যে শোকাচ্ছন্ন হইবে,সে কথা কি ফণীন্দ্রের মনে একবারও উদয় হয় নাই ? বক্কেশ্বর এইরূপ সাত পাঁচ কত ভাবিয়া শোকাকুল হইয়াছিলেন। রাধামতিকে বহুদিবস দেখেন নাই, কন্যার সম্প্রতি পিতৃ গৃহে আগমনে পিতার হৃদয়ে আনন্দ-উৎস প্রবাহিত হইবার কথা—কিন্তু, ভগবান্ বক্কেশ্বরের সে সাধে বাদ সাধিয়াছেন ! তিনি জামাতার অনুসন্ধানে বিস্তর চেষ্টা পাইতেছিলেন। অধিকন্তু যাহাতে দুহিতা পতি-শোকে বিহ্বলা না হয়, সাংসারিক কাজ কর্ম্মে নিয়োজিতা থাকিয়া, অন্যমনস্ক ভাবে সময় ক্ষেপ করে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

স্বামী সচ্চরিত্র সাধু, হইলেও অভাগিনী রাধামতি পতিভক্তি জানিত না। ফণীন্দ্র যে তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, তাহারই জন্য যে তিনি গৃহত্যাগী হইয়াছেন—একথা রাধামতির মনে একবারও উদয় হয় নাই ; কিন্তু সময় ক্রমে স্বামীবিরহবিধুরা রাধামতি মনশান্তি লাভে বঞ্চিতা হইয়াছিল। বক্কেশ্বর কন্যার চিত্তবিকার নিবারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন, রাধামতির প্রতি তাঁহার আদৌ অনাদর ছিল না। আহার বিহার, বসন ভূষণ—কন্যার যখন যাহা প্রয়োজন, বক্কেশ্বর তদ্দণ্ডে তাহা পূরণ করিতেছিলেন, রাধামতি পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়াও, পিতৃস্নেহে কতকটা মনের সুখে ছিলেন।

কামিনী বাহিরের কাজ কর্ম্ম করিত, রাধামতি রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে সংযতা থাকিত। সুখ দুঃখে দিনপাত হইতেছিল, কোন পক্ষে গোলযোগ ছিল না, কিন্তু যাহার যেরূপ স্বভাব, সে সেই মত কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়, অন্য পথ অবলম্বন তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য ! রাধামতি বিলাসিনী, আমোদ প্রমোদে অনুরক্তা, আনন্দোপভোগে সে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিত। পরিণামে এরূপ স্বভাববশতঃ যে মহা বিপাকে পতিতা হইবে, সে দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

দিনে দিনে পিতৃগৃহে একাকিনী কালযাপনে রাধামতির বিরক্তি জন্মিয়াছিল, তাহাতে সে পূর্ণ যুবতী! যৌবন-প্রবাহের উত্তাল তরঙ্গে মনে যখন যে ভাবের সঞ্চার হয়—অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, রাধামতির তদ্দণ্ডেই তাহা সম্পন্ন করিতে বাসনা! কিন্তু, যুবতীর হৃদয় স্ফূর্ত্তি হীন! সর্ব্বদাই রমণী যেন ঘোর চিন্তাকুলা! যৌবনের প্রারম্ভে হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, পদে পদে বিঘ্ন ঘটে। আমোদপ্রিয় যুবক যুবতী ঐহিক সুখসম্ভোগে, চরিত্র দমনে অক্ষম হইয়া, অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। রাধামতি একে বিলাসভোগিনী, তাহাতে কুটিলা কামিনী তাহার সঙ্গিনী। পাপপথে বিচরণে জীবনের অবশিষ্ট দিন যে দারুণ যন্ত্রণায় যাপিত হইবে, সে জ্ঞান লোকের থাকে না। হিন্দুললনার সতীত্ব জগতে আদর্শ স্থানীয়, পতিব্রতা সাধ্বীর তুলনা জগতে নাই। রাধামতির প্রকৃতি সরল ও উদার, কিন্তু স্বেচ্ছাচারিণী! কামিনী তাহার শিক্ষয়িত্রী, যে সন্ধ্যাকালে রাধামতি সহচরী সমভিব্যাহারে ছাদদেশে বিহার করিয়াছিল, সেইক্ষণেই সে অবলা পাপমতি হেমেন্দ্রনাথের নয়নপথে পতিতা হইয়াছিল।

এদিকে পাপমতি হেমেন্দ্র পত্নীশোকে কয়েক দিন বাহ্যিকদৃশ্যে ম্লান ভাবে কাটাইত, কিন্তু, রক্ষিতা বারবিলাসিনীসহ মিলিত হইলেই, তাহার সে কল্পিত মনস্তাপ ঘুচিয়া যাইত, যুবক আমোদ উপভোগ করিত! ভগবানের রাজ্যে অসৎ উদ্দেশ্য কদাচ পূর্ণ হয় না, অধিকন্তু পদে পদে বিপদ সংঘটিত হইয়া থাকে। অন্যপক্ষে কুহকিনী বারাঙ্গনার অনন্তশক্তি! যে পতিতার কারণ হেমেন্দ্র মানসম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহার মনস্তুষ্টিই সংসারের সার ভাবিয়াছে, যাহার প্রীতিতে প্রিয় অপ্রিয় বিবেচনা করিয়াছে, যে কুলটার প্রেমে মজিয়া পতিপ্রাণা সরলাকে জন্মের মত বিদায় দিয়াছে, সেই পাপিয়সী এক্ষণে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, হেমেন্দ্রের ভালবাসায় সে আর মুগ্ধা নহে! আমোদিনী যে অপর যুবকের প্রণয়ে অনুরক্তা হইয়াছে,

অভাগা হেমেন্দ্র সে কুটিলার এ সকল চাতুরি ছলনা লক্ষ্য করিয়াও, তৎপ্রতি আসক্তি একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই। মায়াবিনী আমোদিনীর ছলনাজালে সে এখনও জড়িত, পাপ মুক্ত হইয়া সে উদ্ধার পাইবে, সে চৈতন্য এখনও হেমেন্দ্রের হয় নাই! বারবিলাসিনী অনাদর করিলেও, সে হেমেন্দ্রের আদরিণী, আনন্দদায়িনী। দিবা রাত্র হেমেন্দ্র তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন, কতদিনে পুনরায় তাহার সহিত প্রেমালাপে মিলিত হইবে, অভাগার তাহাই একমাত্র চিন্তা।

দুষ্টার হৃদয়ে দয়ামায়ার লেশমাত্র থাকে না, তাহার ছলনা চাতুরি তাহাদের নিত্যকার মূলমন্ত্র। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে লোকের সর্ব্বনাশ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিতা নহে, যে কোন উপায়ে লম্পটের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করাই এরূপ রমণীর ধর্ম্ম! রিপু প্রাবল্যে মোহবশে লোকে কুলটা প্রেমে মত্ত হইয়া হিতাহিত বিবেচনাশক্তির লোপ করে। হেমেন্দ্র বারাঙ্গনাপ্রেমে স্বীয় সংসার বিষাদাগারে পরিণত করিয়াছে, সে জ্ঞান সময়ে তাহার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু, মোহিনীর কি মোহিনী শক্তি! পদে পদে লাঞ্ছিত অপমানিত হইয়াও অভাগা হেমেন্দ্র চতুরা আমোদিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী! স্ত্রীবিয়োগ জনিত শোকাবেশে সে আমোদিনী বিরহে জীবন্মৃত ভাবাপন্ন, কিন্তু, পতিব্রতা সতী লজ্জা সরলা পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া, হইয়াছেন। সতীর সে অপূর্ব্ব দৃশ্য নিষ্ঠুর হেমেন্দ্রের হৃদয়ে এক মুহূর্ত্তের আত্মবাতিনী জন্যও অঙ্কিত হয় নাই।

যাহারা বাল্যাবধি আমোদপ্রিয়, বেশ্যা ও সুরাসেবী, তাহাদের কখনও চিত্ত স্থিরত্বলাভ হয় না; অসৎ কার্য্যে অভ্যস্ত ব্যক্তি কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, অনুষ্ঠানের সূত্রপাতেই তাহা পাপময় করিয়া তুলে! হেমেন্দ্রের বহুকালাবধি রাধামতিকে আয়ত্তাধীন করিতে একান্ত বাসনা ছিল; কিন্তু এতাবৎকাল তাহার সে সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। তাহাতে কমীন্দ্রনাথকে

একদিন কুস্থানে লইয়া যাওয়ায়, দ্বারকানাথ ও অন্যান্য গুরুজনবর্গ কর্তৃক সে যথেষ্ঠ তিরস্কৃত হইয়াছিল, তাহার প্রতি তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই গর্হিত কার্য্য জনিত লাঞ্ছনার প্রতিশোধ চেষ্টায়, হেমেন্দ্র এতাবৎকাল সে অপমান স্মৃতিপথে জাগ্রত রাখিয়া, অর্থাভাবে পিতৃ মাতৃ সমীপে অর্থ গ্রহণে বঞ্চিত হইয়াছিল; সরলার অকাল মৃত্যুতে, সেই পথে কণ্টক পড়িয়াছে, তথাচ হেমেন্দ্র আমোদপ্রিয়।

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

রাধামতিকে লইয়া হেমেন্দ্র কলিকাতায় উপস্থিত। ললিত ও কামিনী তাহাদের সহিত আছে। মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীটে মাসিক ষোল টাকা ভাড়া ধার্য্য করিয়া, হেমেন্দ্র তাহাদের সহিত একত্র বাস করিতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী জনৈক হিন্দুস্থানী দ্বাররক্ষকের কার্য্য পাইয়াছে, তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ সেই বাটীতে প্রবেশ করিতে পায় না। প্রয়োজনমতে বাজার হইতে দ্রব্য সামগ্রী ললিতচন্দ্র আনিয়া দেয়; কামিনী এখানেই গৃহিণীর কার্য্য লইয়াছে। হেমেন্দ্র স্বাবশ্যকতায় অলঙ্কার ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি সমস্তই আনিয়াছিল। রাধামতির মনস্তুষ্টির কারণ মূল্যবান্ দুই তিনখানি মাত্র অলঙ্কার ও ভাল ভাল কয়েকখানি বস্ত্র রাখিয়া অবশিষ্টগুলি বিক্রয় করিয়া, নগদ টাকা সঞ্চিত করিয়াছে।

অভাগিনী রাধামতির হৃদয়ে সুখের লেশ নাই, আর সকলেই মনের সুখে কালক্ষেপ করিতেছে। যুবতী কলিকাতার কথা পিতার মুখে পূর্ব্বে শুনিয়াছিল, কখন কলিকাতা দেখে নাই। জলের কল, গ্যাসের আলোক ও অন্যান্য শোভায় আগন্তুকের মন প্রফুল্ল হয়, কিন্তু রাধামতি যে বিপদ্‌গ্রস্থা, তাহাতে তাহার সে সকল সাধআহ্লাদ কিরূপে পূরিতে পারে?

এক্ষণে যদিও রাধামতি মহানগরী কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতা বন্দিনী সদৃশা তাহার হৃদয় আকুলিত! কিরূপে যুবতী সতী ধর্ম্ম রক্ষা করিবে, নিষ্ঠুর হেমেন্দ্রের কঠোর হস্ত হইতে মুক্তি পাইবে, অনুক্ষণ সেই চিন্তাতেই সে চিন্তিতা। হেমেন্দ্র ভাবিয়াছিল, রাধামতিকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেই, যুবতী উপায়ান্তর হইয়া, তাহাকে পতিত্বে বরণ করিবে, যুবক যুবতী উভয়ের মিলনে, পরস্পর মনোমালিন্য বিদূরীত হইবে; রন্ধন কারণ সে সময়ে আর পরিচারিকার প্রয়োজন হইবে না; কিন্তু, এক্ষণে রাধামতির অবস্থা অপেক্ষাকৃত বিকৃত।

এ কারণ রায়পুত্র কর্ত্তৃক জনৈক পাচিকা নিযুক্ত হইয়াছে রাধামতির সতীত্বনাশই দুর্বৃত্ত হেমেন্দ্রের মন্তব্য—সেই পাশববৃত্তি চরিতার্থ করণ মানসে, অভাগা বিপদ্-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছে। কিন্তু সে আশা পূরণে বিলম্ব দেখিয়া পাপমতি অধিকতর চঞ্চল। যে গৃহে রাধামতি শয়ন করে, হেমেন্দ্র প্রচ্ছন্নভাবে এক দিবস সন্ধ্যার প্রাকালে তথায় লুক্কায়িত থাকিল।

সরলা রাধামতির অনশনেই একপ্রকার দিনাতিপাত হইতেছে। নিদ্রা —জীবের বিরাম-দায়িনী! শোকতাপ জনিত ভাবনা চিন্তায় অব্যাহতি পাইয়া, লোকে শান্তিময়ী নিদ্রাক্রোড়ে শান্তিলাভ করে। রাজা প্রজা, দীন দুঃখী নিদ্রায় নিমগ্ন হইলে, সকলেই সমান সুখভোগ করে। নিদ্রিতাবস্থায় সাংসারিক কোন অভাব যাতনায় উদ্বেলিত হইতে হয় না। অভাগিনী রাধামতির সারা দিন মনস্তাপেই কাটিয়া যায়। বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর পাত্রাপাত্রের ইতর বিশেষ নাই, দুঃখিনী রমণী পার্থিব সুখে বঞ্চিতা হইয়াছে বলিয়া, নিদ্রাদেবীর শান্তিক্রোড় লাভে বিচ্যুতা হইবে কেন? সে সুখ বিধায়িনীর অনুরাগ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সমধিক বিস্তারিত হইয়া থাকে! রাধামতি শয্যা গ্রহণের অনতিবিলম্বেই নিদ্রিতা হইল। রমণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকিলেও, অপরূপ কান্তি অপ্রকাশ থাকে না। পূর্ণচন্দ্র

সদৃশ সুন্দরীর বদন-মণ্ডল শোকতাপে ম্লান হইলেও, মেঘাচ্ছাদিত শশী কিরণ সদৃশ দীপ্তি পায়।

রাধামতি অচৈতন্যাবস্থায় নিদ্রা যাইতেছে, গৃহের দ্বার অর্গলাবদ্ধ, যুবতী নিরাপদে বিরামভোগ করিতেছে। কিন্তু, হেমেন্দ্র যে গোপনে সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাধামতির সতীত্ব নাশের অপেক্ষা করিতেছে—এ ব্যাপার রমণী কিছুই জানে না। রাধামতিকে গাঢ়নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া, ধীরে ধীরে পদসঞ্চালনে হেমেন্দ্র তাহার সম্মুখীন হইল এবং এক দৃষ্টে তাহার প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল! কিন্তু এরূপ দর্শনে পাপাত্মার মনস্তুষ্টি হইল না। নিষ্ঠুর অবিলম্বে রাধামতির পার্শ্বদেশে শয়ন করিল। ধর্ম্মনাশ উদ্দেশ্যে পাপমতি হেমেন্দ্র যে সেখানে শয়ন করিয়াছে, রাধামতি সে সংবাদ কিরূপে জানিবে? যুবতী সুনিদ্রায় শান্তিলাভ করিতেছে, ইতোমধ্যে হেমেন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল, তৎক্ষণে রাধামতির নিদ্রা ভাঙ্গিল। অভাগিনী ভয়চকিতচিত্তে কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু সে শত্রুপুরীতে রাধামতি নিঃসহায় অবস্থায় বাস করিতেছে, সকলেই তাহার অনিষ্টকারী -- এরূপ অবস্থায় একা রমণীর বিপদ্ উদ্ধারের উপায় কি?

রাধামতির অবস্থা বুঝিয়া, হেমেন্দ্র তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। ভয়বিহ্বলা রাধামতি নয়নাসারে বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। হিন্দু রমণীর সতীত্বই পরম রত্ন! দুর্বৃত্ত হেমেন্দ্রের হস্ত হইতে উদ্ধার কারণ যুবতী প্রাণপণে চেষ্টা পাইল, কিন্তু পদে পদে সে সহায়হীনা—দুর্ব্বলা। পতির প্রতি অনাদর করিয়াই রাধামতির এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, আসন্ন বিপদে অশ্রুধারাই রমণীর একমাত্র সম্বল! অভাগিনী রাধামতি অনন্যোপায় হইয়া হেমেন্দ্রের শরণাপন্না হইল, কাতর কণ্ঠে; অনুনয় বিনয় বাক্যে, কত স্তবস্তুতি করিল! হেমেন্দ্র রাধামতিকে আয়ত্তাধীন বুঝিয়া ইচ্ছামতে এক্ষণে তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারে—স্থির জানিয়া, যুবতীর কথায় কর্ণপাত করিল।

উপস্থিত বিপদে রাধামতির উদ্ধার নাই, তথাচ অবলা যদি কোন গতিকে সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে,এই চিন্তায় পাপমতির নিকট কয়েক দিনের জন্য অবসর প্রার্থনা করিল।

পতির উদ্দেশে পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া রাধামতি বিপন্না, তাহার সাধ আহ্লাদ সকলই ফুরাইয়াছে! ক্ষুধাতৃষ্ণায় অভাগিনীর লক্ষ্য নাই, মলিনবদনে তাহার দিনযাপিত হইতেছে! হেমেন্দ্র তাহাকে বহুমূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্রাদিতে সুসজ্জিতা হইবার জন্য যথেষ্ট আকিঞ্চন করিয়াছে, কিন্তু যুবতীর সে দিকে লক্ষ্য না থাকায়—হেমেন্দ্রের সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। ফল মূল ও দুগ্ধ খাইয়া অভাগিনী জীবিতা, পাচক-ব্রাহ্মণী অন্ন গ্রহণের জন্য তাহাকে যথেষ্ট সাধ্য সাধনা করিয়াছিল, যুবতী কোন কঠোর ব্রতের উল্লেখ করিয়া, সে দায়ে অব্যাহৃতি পাইয়াছিল।

ফণীন্দ্র রাধামতিকে বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু রাধামতি তাঁহাকে ভুলে নাই! পতি দর্শন আশায় বঞ্চিতা হইয়া, শোকাবেগে যুবতীর শরীর অবসন্ন, অভাগিনী কায়মনোবাক্যে পতিধ্যানে সংযতা হইয়াছে, অথচ বাহ্যিক লক্ষণে সে ভাব সম্যক্ গোপন রাখিয়াছে; অনশনে দিনপাত, চীরবাস পরিধান ও মৌনাবলম্বনই অভাগিনী স্থির জানিয়াছে! রাধামতি সম্বন্ধে সকল কথাই হেমেন্দ্র অবগত, এ কারণ তাহার যুবতীর প্রতি আর পীড়ন নাই! রাধামতি একাগ্রচিত্তে পতি চিন্তায় অহোরাত্র নিমগ্না, অবলার আর্ত্তনাদ সময়ে দেবলোকে পৌঁছিল!

লোকের মন চিরদিন এক ভাবে থাকে না। এ দিকে রাধামতি যে পিতৃ বা শ্বশুরালয়ে পুনরায় গমন করিবে, সে আশায় অবলা চিরদিনের জন্য বঞ্চিতা হইয়াছে। দুরাত্মা হেমেন্দ্র তাহার সুখের হন্তারক, অথচ এ পাপপুরীতে এরূপ বিষণ্ন ও মলিন ভাবে দিন যাপনেও কোন ফল নাই ভাবিয়া, রাধামতি মনে মনে কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়াছে, সংসারের কাজ

কর্ম্মে এক্ষণে তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে—তাহা দেখিয়া, দুর্ম্মতি হেমেন্দ্র অবিলম্বে মনোরথ পূরণ হইবে স্থির ভাবিয়া, মনে মনে সন্তোষ লাভ করিয়াছে।

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রতিফল কেহ ইহজীবনেই ভোগ করিয়া থাকে, আর কাহারও বা পরজন্মে ভোগ হয়। আপাততঃ সুখকর ভাবিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ লালসায় অভিভূত হইলে, পরিণামে অবশ্যই তাহার সমুচিত শাস্তি ভোগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি অবিরত দৃষ্টি রাখিয়া, সংসার-কার্য্যে সংযত, ইহজীবনে কষ্টভোগ করিলে, পরলোকে যে সুখ ভোগ করিবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি? আপাততঃ যে কার্য্যে বাহ্যিক কষ্টের সম্ভাবনা, মানুষ সহজে তাহাতে সংযত হয় না। এজন্য অনেকেই ক্ষণিক আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকিয়া, কালক্ষেপ করে; কিন্তু সকলের দিন সমান যায় না, পৈত্রিক ধন সম্পত্তিতে জলাঞ্জলি দিয়াও বঙ্কেশ্বর পতিপ্রাণা কমলার সহায়তায় এক দিনও দুঃখ ভোগ করেন নাই। দুঃখের দিন আসিলে, উত্তরোত্তর অধোগতি হইতে থাকে! যৎসামান্য মাসিক বৃত্তিতে নির্ভর করিয়া, তিনি রাধামণিকে লইয়া সংসার বজায় রাখিয়াছিলেন। স্ত্রীবিয়োগের দিন হইতে তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে। জীবনের অবশিষ্ট কাল ঈশ্বর চিন্তায় যাপন করিতে, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা—সাংসারিক ভোগবিলাসে আর তাঁহার অনুরাগ নাই! পতিপ্রাণা সতীলক্ষ্মী কমলা যে তাঁহার গর্হিত আচরণে সংসারে ধিক্কার দিয়া জন্মের মত চলিয়া গিয়াছেন—সে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে। সে পাপে মুক্তি কোথায়?

বহির্ব্বাটীতে বঙ্কেশ্বর বন্ধুসহ দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত, এদিকে রাধামণিকে লইয়া কামিনীর প্রস্থান, সে সংবাদ মিত্রজ কিঞ্চিন্মাত্র জানিতে পারে নাই। যথাসময়ে অন্তঃপুরে যাইয়া দুহিতা ও পরিচারিকা উভয়ের কাহাকেও

দেখিতে না পাইয়া, তিনি রন্ধনশালা, শয়নগৃহ প্রভৃতি সকল স্থানে সন্ধান লইলেন; কিন্তু কোথাও সে দুইজনের কাহারও সন্ধান পাইলেন না, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে দ্বারকানাথের বাটীতে গমন করিলেন। সে গভীর রাত্রিতে রায় মহাশয়ের বাটীর সকলেই নিদ্রিত, বহির্দ্বারে করাঘাত ও পুনঃ পুনঃ ডাক দিয়া, বক্কেশ্বর রায় মহাশয়ের দরজা খোলা পাইলেন।

মিত্রজ প্রমুখাৎ দ্বারকানাথ রাধামতি ও কামিনীর গৃহ হইতে প্রস্থান শুনিয়া, বিস্মিত হইলেন। নিশাযোগে সহচরী সহ রাধামতির বাটী হইতে বহির্গমন শ্রবণে তাঁহার মনে ঘোর সন্দেহ হইল। তদ্দণ্ডে তিনি গোপালকে ডাকাইয়া হেমেন্দ্রের সংবাদ লইতে বলিলেন, যেহেতু হেমেন্দ্র পূর্ব্বদিবস হইতে বাটীর বাহির হইয়াছে, সম্ভবতঃ কোন প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া হেমেন্দ্র রাধামতিকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে!

গোপাল হেমেন্দ্রের গৃহে যাইয়া দেখা পাইল না। হেমেন্দ্রের অনুপস্থিতি জানিয়া, রায় মহাশয় তাহার তত্ত্ব লইবার জন্য ললিতচন্দ্রের সন্ধান করিলেন; কিন্তু তাহারও কোন সন্ধান পাইলেন না, তিনি অধিকতর চিন্তিত হইলেন।

এক দিবস বক্কেশ্বর কামিনীর মুখে শুনিয়াছিলেন যে, রাধামতি শ্বশুরালয়ে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছে। সম্ভবতঃ কামিনী সহ রাধামতি পতিগৃহে গিয়াছে, কথাপ্রসঙ্গে এইরূপ কথার উত্থাপন হইল। কিন্তু বুদ্ধিমান দ্বারকানাথ চন্দ্রনাথ বাবুর নিকটে তদ্দণ্ডে কোন লোক পাঠাইতে নিষেধ করিলেন, যেহেতু রাধামতি যদি ভর্ত্তৃগৃহে না যাইয়া, স্থানান্তরে গিয়া থাকে; তাহা হইলে শ্বশুরালয়ে মুখ দেখান, রাধামতির পক্ষে ইহজীবনের মত দুরূহ হইবে, সমাজেও বক্কেশ্বরের মস্তক অবনত হইবে। দ্বারকানাথের যুক্তিমত আপাততঃ পল্লাসিনীতে কোন সংবাদ দেওয়া হইল না।

নারী চরিত্র—স্বচ্ছ দর্পণ! কলঙ্ক স্পর্শে চিরদিনের জন্য তৎনিন্দা গৃহে গৃহে কথিত ও কীর্ত্তিত হইতে থাকে। পুত্রের অসচ্চরিত্রের পরিচয় রায়

মহাশয়ের অবিদিত নহে, তাহাতে হেমেন্দ্র রাধামতির রূপলাবণ্যে যে মুগ্ধ, সে সংবাদও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। সম্ভবতঃ কোন স্ত্রীলোকের নিন্দা একবার মাত্র ঘোষিত হইলে, সে রমণী শত সহস্র সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও, তাহার দুর্নাম কখন দূর হয় না, সে স্ত্রীলোক সমাজে আজীবনকাল ঘৃণীতা! পথের বাহির হওয়া দূরের কথা, পরপুরুষের মুখদর্শনে হিন্দুললনাকে নিরয়-গামিনী হইতে হয়। রাধামতি যখন নিশাযোগে গৃহের বহির্গত হইয়াছে, নিষ্কলঙ্কিনী হইলেও—তাহার চরিত্রে দোষারোপ হইয়াছে! অবশ্য তাহার মনে কোন দুরভিসন্ধি ছিল, সম্ভবতঃ কোন লোকের ছলনায় পড়িয়া তাহার এরূপ অধোগতি, নতুবা সহচরী সহ নিশাকালে হিন্দু কুলকামিনী বাটীর বাহির হইল কেন?

রাধামতির বিষয় লোকে জানিলে, বক্কেশ্বর এক ঘরে হইবেন, সকলে তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবে, লোকসমাজে তাঁহার মুখ দেখান ভার হইবে। আত্মীয় স্বজন কেহ আর তাঁহার বাটীতে জলগ্রহণও করিবে না। একারণ এ সকল কথা অপ্রকাশ রাখিয়া, গোপনে রাধামতির সন্ধান হইতে লাগিল। রায় মহাশয় বক্কেশ্বরকে সহোদরের মত ভাল বাসিতেন, তিনি তাঁহার বিপদ নিজের বিপদ্ ভাবিয়া মনে মনে অনুতাপিত হইলেন।

পরদিবস প্রভাতে দ্বারকানাথ বক্কেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কেহ রাধামতি সংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, এইরূপ বলা হইবে যে, চন্দ্রনাথ বাবুর বাটীতে অকস্মাৎ একটী বিবাহ উপস্থিত হওয়ায়, কামিনী সহ তাহাকে শ্বশুরগৃহে পাঠান হইয়াছে। কিন্তু, লোকের নিকট প্রকৃত ঘটনা গোপন রাখিয়াও, তাঁহাদের মন কোন মতে নিশ্চিন্ত হইল না। দুশ্চিন্তায় উভয়েই আকুলিত রহিলেন।

বক্কেশ্বরের বাটীতে অপর লোকজন কেহ নাই। রায় মহাশয় তাঁহাকে আপনার বাটীতে আহারাদি করান। নিশাযোগে বক্কেশ্বর গোপালকে সঙ্গে

লইয়া আপনার বাটীতে শয়ন করেন। দিবাভাগে একপ্রকার মিত্রজের বাটী বন্ধই থাকে। জন সমাগম তথায় আদৌ হয় না।

যে দিবস এই ঘটনা হয়, তাহার পূর্ব্বদিন হইতে হেমেন্দ্র গৃহত্যাগী হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে পাঁচ সাত দিবস গত হইল, তাহারও কোন সন্ধান হইল না; ললিতচন্দ্রও নিরুদ্দেশ। তাহাদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে রায় মহাশয় বিশেষ চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তিনি ভাবিয়া কি করিবেন? কুলাঙ্গার পুত্র হইতে তাঁহার এ অশান্তি! সাংসারিক ভোগবিলাসে অভাব না থাকিলেও, তিনি হেমেন্দ্র কারণ সংসারে একদিনও সুখী নহেন।

এই দুর্ঘটনার পর, একদিন রায় মহাশয় সন্ধ্যাকালে আহারাদি করিয়া শয়নাগারে একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মঙ্গলা আসিয়া বলিলেন, "ছোট বধূর গহনার বাক্স পাওয়া যাইতেছে না।" রায় মহাশয় পূর্ব্বেই হেমেন্দ্রকে এই গোলযোগে সংশ্লিষ্ট আছে, পুত্রই যে ইহার মূল কারণ, তাঁহার এইরূপ স্থির অনুমান হইয়াছিল। এক্ষণে সমস্ত অলঙ্কার সমেত বাক্সটি খোয়া গিয়াছে শুনিয়া, তাঁহার সেই সন্দেহ অধিকতর বৃদ্ধি হইল। সরলার জীবদ্দশায় এক ছড়া চিক হারাইয়াছিল, হেমেন্দ্র যে তাহা আত্মসাৎ করিয়াছিল, একথাও দ্বারকানাথ পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন। এক্ষণে হেমেন্দ্রই যে, সেই গহনার বাক্স আত্মসাৎ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ তাঁহার স্থির অনুমান হইল। তিনি এ সময়ে হেমেন্দ্রের প্রতি এত দূর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাকে রাজদ্বারে চৌর্য্যাপরাধে শাস্তি প্রদানেও উদ্যত হইয়াছিলেন। অলঙ্কার লইয়া পুত্র গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহার চরিত্র সংশোধন অভিপ্রায়ে, এ সংবাদ তিনি পুলিশে জানাইতে সঙ্কল্প করিয়াও ইচ্ছা করিলেন না; যেহেতু এরূপ অনুষ্ঠানে হেমেন্দ্র রাজদ্বারে দণ্ডভোগে অব্যাহতি পাইবেনা, অপত্যস্নেহে দ্বারকানাথ সে ক্ষান্ত হইলেন।

হুগলিতে রায় মহাশয়ের বিশেষ প্রতিপত্তি। ছোট বড় সকলেই তাঁহার

অনুগত, চৌর্য্যাপরাধে পুত্র পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত ও উৎপীড়িত হইবে, এ অপবাদে তাঁহার যশোরবি অবশ্য কলঙ্কমেঘে অবচ্ছন্ন হইবে। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, পত্নীর একান্ত আকিঞ্চনে সে বিষয়ে নীরস্ত হইলেন, কিন্তু এরূপ ব্যাপারে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বধূর গহনা গিয়াছে, সে জন্য তিনি দুঃখিত নহেন, কিন্তু হেমেন্দ্র যে বাটী ত্যাগ করিয়াছে, এতাবৎকাল তাহার কোন সমাচার পাওয়া যাইতেছে না—এই ভাবনায় তিনি মনে মনে বিষণ্ণ, অন্যপক্ষে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্‌ বক্রেশ্বরের একমাত্র কন্যা নিরুদ্দেশ! তিনি এই সকল দুশ্চিন্তায় বিশেষ অসুখী। এক্ষণে কাজ কর্ম্মে রায় মহাশয়ের আর মনোযোগ নাই; অবকাশ মতে মিত্রজ মহাশয়ের সহিত তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, কন্যা বিরহে বক্রেশ্বর এক একবার তাহার নিকটে মনের আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

রাধামণির অদর্শনজনিত মনস্তাপাপেক্ষা লোকাপবাদ বক্রেশ্বরের পক্ষে গুরুতর হইয়াছে। কন্যা গৃহত্যাগিনী—এ কথা জনসাধারণে প্রকাশ হইলে, তাঁহার অপবাদ ঘোষিত হইবে, শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার নিন্দা করিবে, জীবনের শেষ দশায় তাঁহার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবে—তিনি তাহা স্বপ্নেও কখন ভাবেন নাই। বক্রেশ্বর কাজকর্ম্ম, সংসার ধর্ম্ম সকল দিকে জলাঞ্জলি দিয়া, কন্যার চিন্তায় আকুল হইয়াছেন। কি করিবেন, চরমে তাঁহার কি গতি হইবে, এই ভাবিয়া তিনি শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রায় মহাশয় সাধ্যমত তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন, কিন্তু তাঁহার সে অস্থির হৃদয় কিছুতেই প্রবোধ মানে না। এক্ষণে জীবন্মৃত অবস্থায় মিত্রজের দিনযাপন হইতেছে।

হেমেন্দ্রের শোকে মঙ্গলা অভিভূতা; আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্তানের কারণ রায়পত্নী রোদন করিতে লাগিলেন। একদিকে পুত্র-বিরহ-কাতরা সহধর্ম্মিণী; অন্যপক্ষে পুত্রশোকে প্রিয়বন্ধুর মনোবিকার! কি উপায়ে যে গৃহিণীর ও বন্ধুর মনস্তুষ্টি করিবেন, কোথায় হেমেন্দ্র ও রাধামণির

সন্ধান পাইবেন, প্রগাঢ় চিন্তায় বহু অনুসন্ধানে কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিলেন না! তিনিও মঙ্গলা ও বন্ধুর মত শোকাচ্ছন্ন অবস্থায়, দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

রেলগাড়ীতে আরোহণ করিয়া ফণীন্দ্রনাথ পর দিবস প্রাতে আট ঘটিকায় জামালপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। তথায় তাঁহার জনৈক সহপাঠির সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইংরাজী বিদ্যালয়ে ফণীন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত একত্র পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন, বহুদিনের পর উভয়ের দেখা সাক্ষাতে, দুই জনেই কথাবার্ত্তায় আনন্দ অনুভব করিলেন। বন্ধুর সহিত দেখা সাক্ষাতের অনতিবিলম্বে, ফণীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরের গাড়ীতে আরোহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে, সেই বন্ধু তাঁহাকে বাটীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ফণীন্দ্রনাথ কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে মুঙ্গেরে যাইতেছিলেন না, একারণ বন্ধুর একান্ত অনুরোধ আকিঞ্চনে, অবশেষে তাঁহার বাটীতেই গমন করিলেন।

যে যুবক ফণীন্দ্রনাথকে বাটীতে লইয়া যাইলেন, তাঁহার নাম হীরালাল দে, নিবাস কলিকাতা, ঠুলিপাড়া। তিনি ফণীন্দ্রের সহিত একত্র পাঠাধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু পিতার অসঙ্গতিপ্রযুক্ত তিনি পাঠদশায় বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কোন আত্মীয়ের অনুগ্রহে জামালপুরে রেলওয়ে অডিট আফিসে ১৫৲ টাকা বেতনে একটী কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বেতন ২৭৲ টাকা হইয়াছে।

যথা সময়ে হীরালাল ফণীন্দ্র সহ স্নানাহার করিয়া কার্য্যস্থানে যাইলেন। ফণীন্দ্রনাথ চাকুরীর অনুসন্ধানে দেশ ত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহার মুঙ্গেরে যাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কথায় কথায় এ সংবাদ হীরালাল জানিতে পারিয়াছিলেন, একারণ তিনি বন্ধুকে লইয়া কার্য্যস্থানে উপস্থিত হইলেন।

হীরালাল আপন আসনে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন, ফণীন্দ্র ধীরভাবে তাঁহার পার্শ্বে অন্য আসনে বসিয়া আছেন; এমন সময়ে আফিসের প্রধান বাবু, হীরালালকে ডাকাইয়া বলিলেন, "কার্য্যের যেরূপ বাহুল্য হইয়াছে, তাহাতে আমি সাহেবের অনুমতি অনুসারে ১৫৲ টাকা বেতনে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; তোমার সন্ধানে যদি কোন লোক থাকে, তাহাকে লইয়া আসিও।" হীরালাল বন্ধুর নিকটে আসিয়া, উক্ত পদস্থ কর্ম্মচারীর কথা ব্যক্ত করিলে, ফণীন্দ্রনাথ সেই পদের প্রার্থী হইয়া একখানি দরখাস্ত দিলেন। ফণীন্দ্র লেখা পড়ায় বিশেষ পারদর্শী, ইংরাজী ভালরূপ লিখিতে জানেন; তাঁহার হস্তাক্ষর ও বাক্যবিন্যাস প্রণালী দেখিয়া আফিসের প্রধান বাবু তদ্দণ্ডে সাগ্রহে সাহেবের গৃহে যাইলেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, সেই দিনই ফণীন্দ্রকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আফিস বন্ধ হইল; ফণীন্দ্র বন্ধুর সহিত তাঁহার বাসাতেই আসিলেন। কয়েক দিন বন্ধুর সহিত একত্র থাকিয়া, ফণীন্দ্র অডিট আফিসের একজন প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী হইলেন।

ফণীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, একমাত্র তাহারই জন্য তিনি সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন. এ সকল কথা বন্ধুর নিকটেও প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু শ্বশুর প্রদত্ত সুবর্ণ অনন্তগাছা অর্থের অভাবে হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন। খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার হস্তে এখনও ২৫৲ টাকা মজুত ছিল। এক মাস কার্য্য করিয়াই তাঁহার আর ১৫৲ সঞ্চিত হইল; তিনি বন্ধুর নিকট হইতে ২১৲ কর্জ্জ লইয়া, বাসা খরচ হিসাবে ৮৲ টাকা তাঁহারই হস্তে দিলেন। হীরালাল প্রথমতঃ সেই টাকা গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু ফণীন্দ্রের বিশেষ উপরোধ অনুরোধে তাহা গ্রহণ করিলেন।

এক্ষণে ফণীন্দ্র সেই গোয়েন্দাবের লিখিত নির্দ্দেশ অনুসারে, তাঁহার আপন

৫০৲, সুদ ও তাগা পাঠাইবার খরচা সর্ব্বসমেত হিসাব করিয়া, একখানি রেজেষ্টারি পত্র মধ্যে ৫০৲ টাকার একখানি গভর্ণমেণ্ট করেন্সি নোট ও পোষ্ট-ষ্ট্যাম্প ২॥৶০, একুনে মোট ৫২॥৶০ ডাকযোগে পাঠাইলেন। পোদ্দার যথাসময়ে সেই অনন্তপাছা ফণীন্দ্রকে পাঠাইয়া দিল। সংসারের যাবতীয় সুখে বিসর্জ্জন দিয়াও ফণীন্দ্র প্রিয়তমার নিদর্শন শ্বশুরপ্রদত্ত সুবর্ণ অনন্ত পাছা হস্তে ধারণ করিলেন। বন্ধুর সহিত এই ভাবে দুই তিন বৎসর একত্র থাকিয়া, অল্প দিনেই ফণীন্দ্রের হস্তে ৪।৫ শত টাকা সংগৃহীত হইল।

এক দিবস রজনীযোগে ফণীন্দ্র ও হীরালাল উভয়ে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে হীরালাল ফণীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ফণীন্দ্র! তোমার বাড়ী হইতে পত্রাদি আসে না, তোমাকেও কোন পত্রাদি লিখিতে দেখি না। ইহার কারণ কি?"

ফণীন্দ্র। না, সময়ে সময়ে পত্র আসে; আমিও উত্তর পাঠাইয়া থাকি।

মনোভাব অপ্রকাশ রাখিয়া ফণীন্দ্র যদিও এইরূপ উত্তর করিলেন বটে, কিন্তু সুচতুর হীরালালের তাহাতে সন্দেহ জন্মিল। অবশ্যই কোন গূঢ় তত্ত্ব ইহাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, নতুবা বন্ধু বাটীর কথায় এরূপ কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর করিলেন কেন? হীরালাল মনে মনে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বন্ধু সমীপে আপাততঃ সে কথার, আর উত্থাপন করিলেন না। ফণীন্দ্রনাথের সৌজন্য ও সদাচারে জামালপুরস্থ বহু লোকের সহিত তাঁহার সদ্ভাব হইল; সকলেই তাঁহাকে আদর যত্ন করিতে লাগিল।

একদিন হীরালাল ফণীন্দ্রকে লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে করিতে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কি—না—জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপ্রশ্নে ফণীন্দ্র কোন সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি একবার বলিলেন—"হাঁ হইয়াছিল, কিন্তু দুই চারি মাস পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" পুনরায় বলিলেন, "না, আমি বিবাহ করি নাই, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিব

পলাইয়াই —বিদেশে আসিয়াছি। দার-পরিগ্রহে বৃথা ভাবনা চিন্তায় শরীর ও মনের অনিষ্ট করা উচিত নহে।”

ফণীন্দ্রের বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া আফিসের সাহেব দিনে দিনে তাঁহার পদোন্নতি করিতে লাগিলেন। ফণীন্দ্র একাদিক্রমে পাঁচ ছয় বৎসর কর্ম্মস্থানেই যাপন করিলেন। তাঁহার মাসিক উপার্জ্জন এক্ষণে প্রায় দুই শত টাকা, কিন্তু অর্থব্যয়ে বিলাসভোগ বা আমোদপ্রমোদে তাঁহার চিরবিদ্বেষ। গোপনে দীন দুঃখীগণের হস্তে দুই পাঁচ টাকা দান করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; তাহা ছাড়া, বন্ধু বান্ধবের আমোদ-ভোজে তাঁহার মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু টাকা ব্যয় হইত। এইরূপ বাজে খরচ ও নিয়মিত ব্যয় সঙ্কুলন করিয়া, উক্ত সময়ে তাঁহার চার সহস্র মুদ্রা সঞ্চিত হইয়াছে।

এতাবৎকাল পিতৃমাতৃ স্মরণে ফণীন্দ্র মনে মনে অনুতপ্ত ছিলেন, কিন্তু এতদিনও তাঁহাদিগকে পত্রাদি লেখেন নাই। তাঁহার অবর্ত্তমানে সেই সমস্ত টাকা গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হইবে এবং জনক জননীর বহু কালাবধি সমাচার পান নাই। তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে তিনি যে বাটী হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে অবশ্যই তাঁহারা কত কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহাদের বৃদ্ধাবস্থায় এরূপ যাতনা দিয়াছেন ভাবিয়া, তিনি ব্যথিত হইলেন; অবশ্য সে কার্য্যও তাঁহার গর্হিত হইয়াছে! এই সকল মনে মনে আন্দোলন করিয়া তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, একখানি সুদীর্ঘ পত্র ও তৎসহ সহস্র মুদ্রার একখানি গভর্ণমেণ্ট নোট ইন্সিওর ও রেজেষ্টারি করিয়া পিতৃ উদ্দেশে পাঠাইলেন, কিন্তু ফণীন্দ্রের পিতা ইতিপূর্ব্বেই সে বাটী ত্যাগ করিয়া তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছেন, একারণ পত্রখানি বহুদিন পরে তাঁহারই নিকট ফিরিয়া আসিল।

অষ্টাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

লোক পরম্পরায় রায় মহাশয় রাধামতি সংক্রান্ত পুত্রের সংবাদ পাইয়া স্বয়ং কলিকাতায় আসিলেন, বহু সন্ধানে হেমেন্দ্রের সাক্ষাতে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন। পিতার তাড়নায় হেমেন্দ্র রাধামতিকে ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিল। দ্বারিকানাথের আগমনে ললিতচন্দ্র যে, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিল, তাহার আর কোন সন্ধান হইল না। অভাগিনী রাধামতি এক্ষণে পথের ভিখারিণী। কামিনী এখনও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। রায় মহাশয় পুত্রসহ বাটী যাইবার সময়ে, রাধামতিকে লইয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু সমাজভয়ে তৎসাধনে সঙ্কুচিত হইলেন। টাকা কড়ি, গহনা পত্র সমুদয়ই রাধামতির হস্তগত হইল। এক্ষণে দুইটী স্ত্রীলোকে সেই বাটীতে বাস করিতে লাগিল। হেমেন্দ্রের গৃহে গমনের পর দিবসে দ্বারবানকে কর্ম্মচ্যুত করা হইল। কামিনী বাজার হাট করে, রাধামতি রাঁধে বাড়ে, খায় দায়; এই ভাবে উভয়ের ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হইতেছে।

রাধামতির জীবনে ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জন-সমাজে তাহার মুখ দেখান ভার, স্নেহময় পিতা আর কন্যাকে গৃহে লইবেন না, শ্বশুর শাশুড়ী আর সে খবর কোন সংবাদই রাখিবেন না। সংসারবৈরাগ্যে ফণীন্দ্রনাথ গৃহত্যাগী, যদি কখন তিনি গৃহে ফিরেন, তাহাকে তিনি আর সে স্নেহ সম্ভ্র করিতে পারিবেন না। আত্মীয়স্বজন সকলেরই নিকট অভাগিনী অপরাধিনী! রাধামতি প্রাণপণে সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু সমাজ দৃষ্টিতে—সে কলঙ্কিনী! লোকে তাহার কথা লইয়া কত বিদ্রূপ, কত উপহাস করিবে, যুবতীকে সকলই সহ্য করিতে হইবে। রাধামতি দেহপাতে সতীত্ব রত্ন রক্ষা করিয়াও জনসমাজে নিন্দিতা! পাপমতি হেমেন্দ্র তাহার এই সর্ব্বনাশের মূল! এক্ষণে রাধামতি মৃত্যুই শ্রেয়ঃ স্থির করিয়াছে; কিন্তু

ইচ্ছা মৃত্যু কয়জনের অদৃষ্টে ঘটে? রাধামতির আহার নাই, নিদ্রা নাই, পরিণামে তাহার কি হইবে, বৃদ্ধ পিতারই বা কি ঘটিবে? লোকে তাহার কত অপযশ, কত কুৎসা করিতেছে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া রাধামতি অল্প দিনে অস্থিচর্ম্ম সার হইল।

ভাবনা চিন্তায় রাধামতি কালক্রমে রোগগ্রস্তা হইল। কোন গতিকে কালগ্রাসে পতিতা হইলেই, তাহার সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সমস্ত ঘুচে, এই পাপপুরীতে তাহার মুখ দেখাইতে আর ইচ্ছা নাই। এরূপ বিপন্নাবস্থায় কামিনী তাহাকে কুপথগামিনী করিতে যথাশক্তি চেষ্টা পাইতেছে। রাধামতির পীড়ার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি বুঝিয়া, সেই পাপীয়সী জনৈক চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিল। সেই চিকিৎসকের ঔষধ সেবনে রাধামতি কয়েক দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিল।

রাধামতি এখন কি করিবে?—পীড়িতা হইয়াও তাহার দেহপাত হইল না! একাকিনী রমণী, তাহাতে বিদেশ বাস; গৃহে যাইয়া আত্মীয়ের সেবা শুশ্রূষায় কথঞ্চিৎ সে যে সুস্থা হইবে, সে আশাপথও তাহার রোধ হইয়াছে। কোন সুযোগে কামিনীর সঙ্গ পরিত্যাগে যুবতী সুখী হইবে, মনে মনে এইরূপ যুক্তি করিল। কিন্তু, কুহকিনীর ছল কৌশল সহজে ভেদ করা সরলার অসাধ্য। সীমন্তিনীর স্বর্ণবলয় হাতেই আছে, গৃহ হইতে আসিয়া অন্যান্য অলঙ্কারোন্মোচন করিয়া রাধামতি বাক্সে রাখিয়াছিল; কিন্তু সঙ্গে সেই বালা দুই গাছা ও সিঁথির সিন্দুর যুবতী ধারণ করিয়াছিল। এক সন্ধ্যা আহার ও চীরবাস পরিধানে তাহার দিন যাপন, সুখসম্ভোগে সুন্দরী এককালে বীতানুরাগিনী হইয়াছে।

এই দীনভাবে রাধামতির দিনপাত হইতেছে, অকস্মাৎ এক দিবস ললিতচন্দ্র দেখা দিল। তাহাকে দেখিয়া রাধামতি আশ্বাসিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল, ভাবিল, ইহার সাহায্যে পিশাচিনী কামিনীর সঙ্গত্যাগ হইতে

পারে, তাহাতে তাহার উপকার হইবে। ললিত সেই বাটীতে খায় দায় থাকে। পাঁচ সাত দিন গত হইলে, রাধামতি কথায় কথায় সমস্ত অলঙ্কার ও তাহার বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য ললিতকে অনুরোধ করিল, ললিতও যুবতীর কথায় সম্মত হইল।

সরলা রাধামতি অলঙ্কারাদি যাবতীয় মূল্যবান্ সামগ্রী ললিত চন্দ্রের হাতে দিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ আশায় নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিল; কিন্তু ললিত তৎসমুদয় আত্মসাৎ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল, আর রাধামতির সহিত সাক্ষাৎ করিল না। দেখিতে দেখিতে পূর্ণ এক মাস গত হইল, ললিত ফিরিল না। এদিকে বাটী ভাড়ার দেনা, হেমেন্দ্র চুক্তি করিয়া এক মাসের টাকা মাত্র অগ্রিম দিয়া বাটী ভাড়া লইয়াছিল, তাহার পর হইতে, আর ভাড়ার টাকা দেওয়া হয় নাই, এ কারণ পূর্ণ তিন মাসের টাকা জমিয়া গিয়াছে। গৃহস্বামীর সরকার আসিয়া টাকার ঘন ঘন তাগিদ করিতে লাগিল। রাধামতির একমাত্র সম্বল দুই গাছা স্বর্ণ বলয়। স্বামীর শুভ চিহ্ন স্বরূপ রাধামতি এতাবৎকাল সেই দুই গাছা হস্তে ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে পুনঃ পুনঃ তাগিদায় তাহা খুলিয়া ফেলিতে বাধিত হইল! হাতের বালা খুলিতে যুবতীর প্রাণে দারুণ বাজিল, কিন্তু অন্তর্ব্যথা অন্তরেই চাপিল। গৃহস্বামীর ঋণ অবশ্য পরিশোধ করিতে হইবে, অনন্যোপায় হইয়া যে লোক ভাড়া আদায় করিতে আসিয়াছিল, তাহাকেই পোদ্দার ডাকিয়া আনিতে বলিল। স্বর্ণকারকে বালা দুই গাছা বিক্রয় করিয়া রাধামতি উপস্থিত ঋণ-জাল হইতে মুক্তি পাইল এবং তদ্দণ্ডে সে বাটী ত্যাগ করিল। কামিনী রাধামতির অবস্থা বুঝিয়া নিজেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে সরিয়া পড়িল।

ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

রাধামতির বিবাহের অনতিবিলম্বে সুমতিকে দ্বারকানাথ পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। সঙ্গতিপন্ন পিতার কন্যাসম্প্রদানে বিপদাপন্ন হইতে হয় না। রায় মহাশয় সাধ্যমত ব্যয় করিয়া ঘর বর দেখিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। পিত্রালয়ে সুমতিকে এক দিনের জন্য কষ্টভোগ করিতে হয় নাই, ধনশালী শ্বশুরের পুত্রবধূ হইয়া তাঁহার সে সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে রায়-জামাতা শৈলেন্দ্রনাথঘোষ স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। এক দিকে ধনশালীর পুত্র, অন্যপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় শৈলেন্দ্র শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিলেন, সহায় সম্পত্তি না থাকিলে কাজ কর্ম্মের সুবিধা প্রায়ই ঘটে না। শৈলেন্দ্রনাথ স্বীয় গুণপণায় গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত কার্য্যে সর্ব্বপ্রথমেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দিনে দিনে শৈলেন্দ্রনাথের যত পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ভাগ্যবতী সুমতিও উত্তরোত্তর শ্বশুর শাশুড়ীর নয়নমণি হইতে লাগিলেন। তিনি এখন কয়েকটী কন্যা পুত্রের জননী হইয়াছেন। প্রীতিনিদর্শন সন্তান সন্ততিকে বক্ষে লইয়া, শৈলেন্দ্র পরম সুখ অনুভব করিতেছেন! সুমতি শৈলেন্দ্র ভালবাসার আদান প্রদানে দুটী প্রাণে যেন এক হইয়াছেন। সে প্রণয়ে অভেদ নাই—তারতম্য নাই!

কার্য্য উপলক্ষে শৈলেন্দ্রনাথকে অনেক সময়ে বিদেশে একাকী থাকিতে হইয়াছিল, আয়ের সহিত জন সমাজে এখন তাঁহার মান সম্ভ্রম যথেষ্ট। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নত হইয়া, শৈলেন্দ্রনাথকে যথাক্রমে বর্ষের অধিককাল বিদেশে বাস করিতে হয়, একারণ পিতার আদেশমতে তিনি পুত্র কলত্র লইয়া কর্ম্ম স্থানে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সুমতি গৃহিণী, শৈলেন্দ্র কর্ত্তা! স্ত্রীপুরুষে এক পরামর্শে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে।

মানুষ মানুষকে ভালবাসে, আদর যত্ন করে। যে যাহাকে ভালবাসে. সে তাহার অদর্শনে প্রাণে ব্যাকুলতা বোধ করে, পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ না হইলে, সে প্রাণের বেদনা কিছুতেই বিদূরীত হয় না। অন্যপক্ষে মনুষ্যই মনুষ্যের শত্রু, একের বিষনয়নে অন্যে পড়িলে, তাহার আর রক্ষা হয় না; ছলে বলে একে অন্যের সর্ব্বনাশ না করিয়া, কদাচ নিশ্চিন্ত বোধ করে না। সংসারে সকলের প্রকৃতি সমান নহে, সেই বিভিন্ন ভাবের বিকাশে সুখ দুঃখের সংঘটন!

স্বামীর সহিত বিদেশে থাকায় সুমতি পিত্রালয়ে আসিতে পায় না, বালসহচরী রাধামতিরও কোন সংবাদ লইবার সুবিধা হয় না। একমাত্র পত্র লিখিয়া সুমতি সময়ে সময়ে তাঁহাদের সংবাদ লয়, কিন্তু গৃহস্থালির কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায়, কোন কোন সময়ে তাঁহাদিগকে পত্র লিখিতেও তাহার অবসর হয় নাই।

একদিন স্ত্রীপুরুষে একত্র বসিয়া গল্পসল্প করিতেছেন. কথায় কথায় শৈলেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে রাধামতির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুমতির সহিত রাধামতির বহু দিন দেখা নাই, ফণীন্দ্রনাথ সংসার ধর্ম্মে বীতানুরাগী হইয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন, এ সংবাদ তাঁহারা উভয়েই অবগত ছিলেন, সুদীর্ঘ সময়ে ফণীন্দ্রনাথের কোন সংবাদ না পাওয়ায়, উভয়েই রাধামতির জন্য মনক্ষুণ্ণ ছিলেন।

. স্বামী সর্ব্বাগ্রে প্রিয়সখি রাধামতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সুমতিও মিত্রজ কন্যার কারণ বিশেষ ব্যথিতা, সুযোগ বুঝিয়া রহস্যচ্ছলে সুমতি উত্তর করিলেন, "তুমি হাকিম! দণ্ড মুণ্ডের হর্ত্তাকর্ত্তা—একটা মেয়ে মানুষ এত দিন পতিবিরহে যাতনা সহ্য করিতেছে, আর তুমি সকলের দোষ গুণ বিচার কর—এটা কি তোমার পক্ষে অন্যায় না?" "সুমতি! তোমার কথা আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে আজও তো কোন

সন্ধান পাইলাম না! লোক পরম্পরায় শুনিয়াছি—রাধামতি পিত্রালয়ে নাই।”

“সে সংবাদ আমি পূর্ব্বেই পাইয়াছি, মেয়ে মানুষ এক পিত্রালয়, আর এক শ্বশুর বাটী—রাধামতি যদি এই দুই স্থানের কোন স্থানে থাকিত, কোন পক্ষে গোলযোগ হইত না, কিন্তু ভাগ্যগুণে ফণীন্দ্রনাথ দেশত্যাগী, সেই দুঃখে রাধামতির শ্বশুর শাশুড়ী তাহাকে লইয়া যায় না, তাহার তত্বও তেমন রাখে না। দুঃখিনী অগত্যা পিতারই গলগ্রহ, রত্নেশ্বর বাবুর সংসারে রাধামতি ভিন্ন কেহ ছিলনা। সে বৃদ্ধ পিতাকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া বিশেষ অন্যায় করিয়াছে।” “স্ত্রীলোক চিরদিনই পরের অধীন, পিতার অনুমতি না লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছে। স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করিয়া অভাগিনী একুল ওকুল—দুকুল হারাইয়াছে। পোড়ার মুখীর সঙ্গে, যদি কখন দেখা হয়, তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতাম, সে কেন এমন করিয়াছে?”

“রাধামতি অবশ্যই অন্যায় করিয়াছে, কিন্তু সে মেয়ে মানুষ—পেছনে লোক না থাকিলে, সে কি এ কাজ করিতে পারে? আর এক কথা, ফণীন্দ্র বাবুরই বা আক্কেল কি? ভদ্র লোকের মেয়েকে বিবাহ করেছেন, তার খোরাক পোষাকের ভারতো তাঁহারই উপর!”

“এক দিকে পতির নিরুদ্দেশ, অন্যপক্ষে কুলকামিনী—গৃহত্যাগিনী! বহু দিন স্ত্রীপুরুষে দেখা নাই, এরূপ অবস্থায় পরস্পর উভয়ের যে দেখা সাক্ষাৎ হইবে—সে আশা বিড়ম্বনা!”

“যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশা—চেষ্টার ক্রটি হইতেছে না, এক দিন না একদিন তাদের দু'জনেরই সংবাদ পাওয়া যাবে—উতলা হয়ে আর কি করিবে বল?”

পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তায় বেলা হইল। শৈলেন্দ্রনাথ আহারাদি করিয়া কর্ম্ম স্থানে যাইলেন। সুমতি গৃহস্থালির তত্বাবধান ও দৈনিক কার্য্য

সমাধা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে রাধামতির কথা ভাবিতে বসিলেন। বাল্যে উভয়ের একত্র আহার বিহার, বসা দাঁড়ান; কথায় বার্ত্তায় পরস্পর ক'ত কাঁদিয়াছে—হাসিয়াছে। রাধামতি সংক্রান্ত পুরাতন ঘটনা যতই সুমতির মনে পড়িতে লাগিল, যুবতী ততই অধীরা হইলেন। শোকোচ্ছ্বাসে সুমতি অশ্রুধারা বর্ষণ করিলেন।

এদিকে শৈলেন্দ্র কর্ম্মস্থানে যাইয়াই পুলিশ চালানী এক মোকদ্দমার তদ্বিরে বসিলেন। বামাল সমেত আসামী ধরা পড়িয়াছে, দারগা জমাদারের সোৎসাহে তদারকের ব্যাপার চলিয়াছে, বিচার গৃহে রথ দোলের হাট বসিয়াছে। লোকে লোকারণ্য, চতুর্দ্দিকে হৈ চৈ পড়িয়াছে, সময়ে সময়ে প্রহরীর বজ্র নিনাদে শান্তির ব্যবস্থা হইতেছে। বিচারপতি শৈলেন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রে পুলিশের এজেহার গ্রহণ করিলেন, আসামীর প্রতি কয়েকবার তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও পতিত হইল।

শ্বশুর বাটীতে ঘন ঘন যাতায়াত না থাকিলেও, শৈলেন্দ্রনাথ আসামীকে চিনিতে পারিলেন, ললিতের পরিচয় তাঁহার নিকট অব্যক্ত রহিল না। দ্বারকানাথের মোহরার কার্য্যে ললিতচন্দ্র নিযুক্ত ছিল, সে সংবাদ তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন। এক্ষণে চৌর্য্য অপরাধে ললিত পুলিশের হস্তে ধৃত হইয়াছে, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন বিচারপতির ভার, ন্যায় বিচারে পারিতে সুপারিশে কোন কাজই হয় না! শৈলেন্দ্রনাথ ধার্ম্মিক ও সূক্ষ্ম বিচারক, তিনি ললিতকে আসামী শ্রেণীভুক্ত দেখিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন; কিন্তু সংসারে যে যেমন কাজ করে, তাহাকে তদুপযোগী শাস্তিভোগ করিতে হয়, স্থির ভাবিয়া পরক্ষণে তিনি কর্ত্তব্য সাধনে উদ্যোগী হইলেন।

ললিতচন্দ্র কাটগড়ায় আবদ্ধ, সাক্ষ্য সাবুদ সমেত পুলিশ আসামীর প্রতিবাদী হইয়াছে। ললিতের নিকট যে সকল জিনিষ থানাতল্লাসে পাওয়া গিয়াছিল, একে একে সেই সমস্তগুলিই বিচারকের সমক্ষে স্থাপিত হইল।

শৈলেন্দ্রনাথ কর্ত্তব্যানুরোধে সেই সমস্ত তন্ন তন্ন ভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অপহৃত দ্রব্যের তালিকায় কেবলমাত্র কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার ছিল, এক একখানি করিয়া তিনি সেই জিনিষ গুলির পরীক্ষা করিতেছেন, ইতোমধ্যে এক গাছা ব্রেশলেট হস্তে লইয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। এজ্‌লাসে বসিয়া অকস্মাৎ বিচলিত ভাব দেখাইলে, অপরাপর লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে, বিচক্ষণ শৈলেন্দ্রনাথ মনের উদ্বেগ মনেই সম্বরণ করিলেন।

এতাবৎকাল শৈলেন্দ্রনাথ ফরিয়াদীপক্ষের যথাযথ বর্ণনা শ্রবণ করিতেছিলেন, আসামীর সহিত কোন বাক্যালাপ করেন নাই। ব্রেশলেট দেখিয়া তিনি ললিতকে প্রশ্ন করিলেন, "এ জিনিষ তুমি কোথায় পাইলে?"

ললিত। আমার মনিবের কন্যা দিয়াছেন।

শৈলেন্দ্র। তুমি কাহার নিকট কর্ম্ম করিতে? আর তাঁহার কন্যাই বা কে?

ললিত। হুগলির বক্রেশ্বর মিত্র মহাশয়ের আমি কর্ম্মচারী, তাঁহার কন্যা ইহা আমাকে দিয়াছেন।

"দেখ, এটা বিচার গৃহ, তুমি মিথ্যা বলিয়া এখানে অব্যাহতি পাইবে না, স্মরণ রাখিয়া—কথাবার্ত্তা কহিবে।"

"সত্যই বলিতেছি।"

"সত্য বলিলে তোমার এ দুর্দ্দশা হইবে কেন? এখনও বলিতেছি, যাহা যাহা ঘটিয়াছে, ঠিক করিয়া বল—অবশ্য তোমার প্রতি অন্যায় করা হইবে না।"

"আমি যাহা বলিবার—বলিয়াছি, এখন আপনি যাহা বিচার করেন।"

"বক্রেশ্বর বাবুর কন্যা এ ব্রেশলেট তোমায় কেন দিয়াছেন?"

"এ কথার উত্তর আমি কি দিব? দাতায় দান করে, যাচক গ্রহণ করে, কেন, কি নিমিত্ত—এ সব তত্ত্ব আমি জানি না।"

"এই ব্রেশলেটে অন্য একজনের নাম লেখা আছে, তাহা কি দেখিয়াছ?"

শৈলেন্দ্রের প্রশ্নে ললিত আর কোন প্রত্যুত্তর করিল না। আসামীকে নিরুত্তর বুঝিয়া, বাদীপক্ষ প্রত্যক্ষ প্রমাণে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত করণে সমর্থন করিল। ললিত চোর বলিয়া ধৃত হইয়াছে, একে একে সকল প্রশ্ন তাহার প্রতিকূলে প্রমাণিত হইল।

এই মোকদ্দমায় সুদীর্ঘক্ষণ মস্তিষ্ক আন্দোলিত করিয়া বিচারক অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, আদালতের নির্দ্দিষ্ট সময়ও শেষ হইয়া গেল। শৈলেন্দ্রনাথ সে দিন আর কোন রায় প্রকাশ করিলেন না, আসামী পুলিশের তত্ত্বাবধানেই রক্ষিত হইল। অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত ললিত নজরবন্দী ভাবে হাজতে স্থান পাইল। শৈলেন্দ্রনাথ সমস্ত অলঙ্কারাদি দারোগার জিম্মায় দিয়া, সে দিনের মত কার্য্য শেষ করিলেন। অবসর পাইয়ে কর্ম্মচারীগণ যে যাহার বাসায় যাইল, শৈলেন্দ্রনাথ বাসায় আসিলেন।

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

কুলকামিনী রাধামতি একণে পথের ভিখারিণী। জীবন ধারণ জন্য তাহাকে পর মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। ভিক্ষাই তাহার উপজীবিকা। যুবতীর বাল্যাবধি সুখে কালাতিপাত হইয়াছে, দুঃখের লেশমাত্র তাহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। অকস্মাৎ এরূপ বিপন্না হইয়া রাধামতি চিত্তশান্তি হারাইয়াছে, হা হতাশে শোকতাপে অভাগিনী সংসার অন্ধকারময়ী দেখিল। কলিকাতার পথে ভদ্র রমণী—একাকিনী, লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত, এ দৃশ্য ভয়ানক! রাধামতি গৃহস্থের কন্যা, সম্ভ্রান্তের পুত্রবধূ, তাহাতে অলৌকিক রূপবতী, অন্যপক্ষে এরূপ স্ত্রীলোকের অনাথার ন্যায়

প্রাণধারণ—অসম্ভব! কামিনীর সঙ্গ পরিত্যাগে রমণী অধিকতর নিরাশ্রয়া হইয়াছে!

কলিকাতা সহরে বহু লোকের জনতা, পথঘাটে লোকের যাতায়াতও অধিক। পল্লীগ্রামবাসী ভদ্র-মহিলা রাধামতি সে সংবাদ কিছুই জানে না; অন্তঃপুরবাসিনী সে দৃশ্যে মর্ম্মাহতা ও শোকাভিভূতা হইয়া পড়িয়াছে। কি করিবে, কোথায় যাইবে, বিদেশে কোথায় আশ্রয় পাইবে? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া যুবতী এক্ষণে জীবন্মৃতা! অপরিচিত স্থানে আত্মপরিচয় দিয়া কোন ফল দর্শিবে না। লজ্জাশীলা রাধামতি অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে, পথিমধ্যে একাকিনী দাঁড়াইয়া থাকিতে যুবতী জড়সড় হইতেছে! বহু লোক যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু কেহ তাহার প্রতি ফিরিয়াও দেখিতেছে না। যে দুই একজন তাহার প্রতি চাহিয়া দেখে, নেত্র পরিতৃপ্তি ভিন্ন তাহাদের অন্য অভিপ্রায় নহে—কেহ কেহ বা বিদ্রূপ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। রাধামতি পথিমধ্যে এরূপভাবে অধিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে লজ্জা বোধ করিল।

মানুষ যে ভাবেই পথে বাহির হউক না কেন, কাহারও তাহাকে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। কিন্তু, কুলকামিনী নিষ্কলঙ্কিনী হইলেও পথে আসিয়া কাহারও দৃষ্টিপথে পতিতা হইলে, সমাজে সে দূষণীয়া। রাধামূর্ত্তি ক্ষুধাতৃষ্ণাতুরা, তথাপি তাহার সে লক্ষ্য নাই! ভগবানের কৃপায় কত ক্ষণে কোন ভদ্রলোকের অনুগ্রহ পাইবে, অভাগিনী উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেই সময়ের অপেক্ষায় রহিয়াছে! যত বেলা যাইতেছে, সে ততই ভীতা, এক-বার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে, পরক্ষণে অশ্রুপাত করিতেছে।

সংসারে লোকের বিভিন্ন রুচি! কেহ পরোপকার-ব্রতে জীবন সংযত রাখিয়া, সদানন্দে কালপাত করিতেছে, অন্য কোন ব্যক্তি স্বার্থের দাস—স্বার্থপরতায় পরের অমঙ্গল সাধিতে সচেষ্টিত! রাধামতিকে পথিমধ্যে

দেখিয়া কত পান্থের মনে যে কত ভাবের উদয় হইল, তাহা তাহারাই জানে, অন্যে সে কথা কি বুঝিবে ?

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যই বিপদের মূল ভিত্তি। রমণীর রূপলাবণ্যে অনেক সময়ে অনিষ্ট হইয়া থাকে। রাধামতি পথের ভিখারিণী হইলেও, তাহার অপূর্ব্ব রূপরাশি ও চারুকান্তি লুপ্ত হইবার নহে। যুবতীর দেহের প্রতি যত্ন নাই, কেশদাম পারিপাট্য অভাবে আলু থালু ; কিন্তু সে স্বর্ণপ্রতিমা দর্শকমাত্রেরই চিত্তাকর্ষণকারিণী! মনোমোহিনীর প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই, পুনর্ব্বার তাহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইতে হয়।

ভগ্নহৃদয়ে ক্ষুণ্ণমনে রাধামতি দাঁড়াইয়া আছে। প্রতি মুহূর্ত্তে লোকের অনুকম্পা প্রাপ্তির আশায় নির্ভর করিতেছে। এমন সময়ে এক ব্যক্তি রাধামতির সম্মুখীন হইল। সরলা তাহার নিকট আত্মকাহিনী জানাইলে, অবশ্যই আশ্রয় পাইবে—এই বিশ্বাসে, সেই পথিককে সাধু ও সচ্চরিত্র জ্ঞানে, অকপট চিত্তে সে সকল কথা জানাইল। কৌশলে রাধামতিকে আয়ত্তাধীন করিবার অভিপ্রায়েই সে ব্যক্তি যে তথায় উপস্থিত হইয়াছে, অভাগিনী সে সংবাদ কিরূপে জানিবে ? ভদ্রলোক প্রকৃত কথা জ্ঞাত হইলে, অবশ্য কোন উপকার হইতে পারে, এই ভাবিয়া রাধামতি তৎ-সমীপে হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত করিল।

অসচ্চরিত্র ব্যক্তির কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। ক্ষণিক সুখভোগ-বাসনায় অন্যের সর্ব্বনাশ করিতেও সে কুণ্ঠিত নহে। রাধামতির মনের ভাব বুঝিয়া, আগন্তুক তাহাকে আশ্রয় দানে স্বীকৃত হইল। এক কথায় সে ব্যক্তিকে সহায় স্বামীর্ম জানিয়াও, রাধামতির মনে অকস্মাৎ সন্দেহ জন্মিল। ইতিপূর্ব্বেই হেমেন্দ্রের অত্যাচারে অভাগিনী গৃহধর্ম্মে বঞ্চিতা হইয়াছে, জনসমাজে অসতী বলিয়া ঘোষিতা হইয়াছে। আগন্তুকের প্রলোভনে তাহার যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে, সে কিছুই ভাবিল না! অন্যপক্ষে

সে ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র তাহার অবিদিত। দ্বিরুক্তি না করিয়া তার গ্রহণে সে ব্যক্তিকে স্বীকৃত দেখিয়া, তাহার কথামত কার্য্য করিতে রাধামতি স্বীকার পাইল না! অবলা সম্প্রতি যে মনোবেদনা পাইয়াছে, অবিমৃষ্যকারিতাপ্রযুক্ত গৃহস্থের কুলবধূ হইয়া সে পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছে। অন্যথা সরল ব্যবহারে পরের কথায় যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়াছে, এ কারণ আগন্তুকের প্রতি তাহার বিশ্বাস হইল না। সুযোগ না বুঝিয়া, সে ব্যক্তি বিদায় হইল, কিন্তু যাইবার সময়ে রাধামতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দুই একটী ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া গেল। তাহার ঈদৃশ ব্যবহারে রাধামতির সন্দেহ অধিকতর বৃদ্ধি পাইল, ভয়ে যুবতী সঙ্কুচিতা হইল! পাপাত্মা কৌশলে বিদূরীত হইয়াছে ভাবিয়া, বিপদাপন্না রাধামতি কথঞ্চিৎ সুস্থা ও আনন্দিতা হইল।

ধর্ম্মপথে লক্ষ্য রাখিয়া সংসার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে, ভগবান্ অবশ্য উপায় করিয়া থাকেন। ক্ষুন্ন মনে রাধামতি পথিপার্শ্বে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতরা, যুবতীর দৃঢ় সঙ্কল্প—আশ্রয় না পাইলে, জল গ্রহণ করিবে না। দীনবন্ধু তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি পাত করিলেন! সে পাপাত্মা রাধামতির সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার পরক্ষণে, এক বৃদ্ধ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাধামতিকে এরূপ শোকাপন্না দেখিয়া, তিনি তাহার দুঃখে সহানুভূতি দেখাইলেন। রাধামতিকে সংসার কার্য্যে নিযুক্তা করিবার অভিপ্রায়ে বৃদ্ধ তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। রাধামতি বৃদ্ধের বচনে আশ্বস্ত হইয়া, তদ্দণ্ডে তাঁহার অনুগামিনী হইল।

বৃদ্ধের বাটীতে রাধামতি ধাত্রী কার্য্যে নিযুক্ত হইল। যেহেতু রাধামতি ভদ্রকুলজাতা হইলেও পথিমধ্যে একাকিনী, অবশ্যই অভাব চরিত্র সম্বন্ধে কোন কলঙ্ক ঘটিয়াছে, নতুবা তাহার এ অবস্থা কেন? এই কারণে তাহাকে পরিচারিকা-কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। ভবিষ্যতে তাহার স্বভাব চরিত্র বৃদ্ধের তৃপ্তিকর বিবেচিত হইলে, তিনি তাহাকে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত

করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন। এক্ষণে রাধামতি বৃদ্ধের গৃহে ধাত্রী কার্য্যে নিযুক্তা।

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

রাধামতির সন্ধান জন্য সুমতি উৎকণ্ঠিতা ছিলেন, স্ত্রীর ব্যাকুলতায় শৈলেন্দ্র উপেক্ষা করেন নাই, প্রিয়সখীর সংবাদ কারণ রাজ-কুমারী কত অন্তর্যাতনা সহ্য করিয়াছেন, শৈলেন্দ্রকেও তাহার ভাগ লইতে হইয়াছিল। আদালত গৃহে, ললিতচন্দ্র কর্ত্তৃক অপহৃত দ্রব্য তালিকায় ব্রেশলেট দেখিয়া শৈলেন্দ্রনাথ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। যেহেতু সুমতির অনুরোধে তিনি রাধামতিকে যে এক জোড়া ব্রেশলেট উপহার দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম খোদিত ছিল, চোরাইমাল পরীক্ষায় তাঁহার প্রদত্ত ব্রেশলেট দেখিয়া তিনি সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। অপরাধী নিজ দোষ ক্ষালণে চেষ্টিত হইলেও, সাক্ষ্য প্রমাণে শাস্তিভোগ করিতে বাধ্য হইল। বামালসমেৎ সে ধরা পড়িয়াছে, পুলিশের এজেহারে পদে পদে তাহার অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইবে কেন? শৈলেন্দ্রনাথ ললিতের পরিচয় পাইয়াও কর্ত্তব্য কার্য্যে কোন প্রকার শৈথিল্য দেখান নাই।

ব্রেশলেট দেখিয়া রাধামতির কথা শৈলেন্দ্রনাথের স্মৃতিপথে সমধিক জাগ্রত হইয়াছিল, কিন্তু রাধামতি এখন কোথায়—কি ভাবে রহিয়াছেন, সে সংবাদ তিনি কিছুই জানেন না। ললিতকে প্রশ্নচ্ছলে তিনি রাধামতি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনুসন্ধানে তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে শৈলেন্দ্রের মনোগত ভাব কিছুই অপ্রকাশ রহিল না, এক পক্ষে রাধামতির কারণ সুমতি যেরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, অন্যপক্ষে শৈলেন্দ্রনাথ তাহার যথাযথ সন্ধান লইতে

কোন অংশে ত্রুটি করিলেন না। স্ত্রী পুরুষে পরামর্শ করিয়া, দেশ বিদেশে পরিচিত লোকের নিকটে, রাধামতির সন্ধান কারণ, সংবাদ পাঠাইলেন।

রাধামতি কলিকাতার অবস্থিতি কালে ললিত কর্ত্তৃক বঞ্চিতা হইয়াছিল, তাহার অলঙ্কারাদি সমস্ত সে আত্মসাৎ করিয়াছে, শৈলেন্দ্রনাথের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে এ সকল কথা অপ্রকাশ হয় নাই; কিন্তু এক্ষণে কলিকাতায় সন্ধান লইয়াও, রাধামতির কোন নির্দ্দেশ হইল না। রাধামতি কলিকাতায় আসিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সে কোথায় আছে, এ সংবাদ কেহই বলিতে পারিল না। আরও দুই একটি স্থান হইতে এইরূপ সংবাদ আসিল। অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোক গৃহের বাহির হইয়া কত স্থানে গিয়াছে, কত লোকের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে, অথচ কেহই তাহার সন্ধান বলিতে পারিতেছে না। অলঙ্কার দেখিয়া, শৈলেন্দ্রনাথ রাধামতির সন্ধান অবশ্য হইবে, মনে মনে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সাধ্যসাধনায় বিফল হইলেন। শৈলেন্দ্র সকল উদ্যম যত্ন অথবার বৃথা জানিয়া, মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন। স্বামীর চেষ্টায় প্রিয়সখীর সন্ধান হইবে স্থির জানিয়া, সুনীতি মনে মনে কত কল্পনা জল্পনা করিয়াছিলেন, আশায় নির্ভর করিয়া বুক বাঁধিয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহার মনোরথ অপূর্ণ রহিল, রাধামতির কোথাও সন্ধান হইল না।

এদিকে ফণীন্দ্রনাথ আত্মীয়স্বজনের বহু দিবসাবধি কোন সংবাদ না পাইয়া, মনঃক্ষুণ্ণ অবস্থায় রহিয়াছেন; অথচ সংসারের প্রতি বীতানুরাগী হইয়াই তিনি দেশত্যাগী হইয়াছেন। পিতামাতা, ভগ্নী প্রভৃতির স্নেহ মমতা ভুলিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় বাটীতে পত্র লিখিতে, তাঁহার ইচ্ছা হইলেও বিশেষ মন সরিল না; সাংসারিক ঘাতপ্রতিঘাতে বিচলিত হইয়া, তাঁহার সংসারবৈরাগ্য হইয়াছিল, সেই চিত্তবিকারে তাঁহার গৃহত্যাগ। আত্মীয়স্বজনের জন্য মন ব্যাকুল হইলে, যতক্ষণ পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ বা সংবাদ না পাওয়া যায়, কিছুতেই মনোশান্তি লাভ হয় না। ফণীন্দ্রনাথ, পিতার সংবাদ কারণ ব্যাকুল

হইলেও, চন্দ্রনাথ সমীপে কোন পত্রাদি লেখেন নাই; শৈলেন্দ্র বাবুর নিকটও তিনি অপরিচিত নহেন। রাধামতির সহিত যে দিন তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, সেইদিনই যে উভয়ের পরস্পর প্রথম আলাপ পরিচয়, তাহা নহে; শৈলেন্দ্র ও ফণীন্দ্র উভয়ে কলিকাতার এক কলেজে একত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে সুমতির সহিত রাধামতির সখীত্ব, এ সম্বন্ধে সে বন্ধুত্বও পরস্পরে বাড়িয়াছিল, কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্যপ্রযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথমে গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন, কিছুদিন বৈরাগ্য ধর্ম্মের কঠোর নিয়মাদি পালনে তাঁহার তাহাতে বীতানুরাগ জন্মে। লেখাপড়া শিখিয়াছেন, হিতাহিত বিচার-শক্তি তাঁহার জন্মিয়াছে, এরূপ অবস্থায় সংসারে জন্মগ্রহণের কর্ত্তব্যপালনে তিনি আর উদাসীন থাকিলেন না। দশের নিকট গণ্যমান্য হইতে, সমাজে মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে, তিনি কিরূপে নিশ্চিন্ত ভাবে কালক্ষেপ করিবেন? পৈত্রিক সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগেও তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। সংসারীমাত্রেরই অর্থের প্রয়োজন, গ্রাসাচ্ছাদন ব্যতিরেকে দিনপাত হয় না, সে অশন বসনেও টাকার আবশ্যক! ফণীন্দ্র নিঃস্ব অবস্থায় সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, সংসারের মায়া মমতা ভুলিয়া যোগী সাজিয়াছিলেন, কিন্তু ভোগীর পক্ষে সে সাজ বিড়ম্বনা বুঝিয়াই, তিনি আত্মীয় স্বজনের সংবাদ না লইয়া, সর্ব্বাগ্রে উপার্জ্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। অর্থ সঞ্চয় মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া, তিনি চাকুরির সন্ধানে বিদেশ যাত্রা করেন, এক্ষণে কর্ম্মস্থানে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, দশ টাকা তাঁহার সঞ্চয়ও হইয়াছে, কিন্তু এতাবৎকাল পিতা মাতা বা আত্মীয়স্বজনের কোন তত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই। এক্ষণে তাঁহার পরিজনবর্গের কথা স্মৃতিপথে জাগ্রত হইয়াছে, লোকলজ্জায় সে হৃদয়-বেদনা হৃদয়ে গোপন রাখিলেও, তিনি তাহা আর অপ্রকাশ রাখিতে পারিতেছেন না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ফণীন্দ্রনাথ শৈলেন্দ্রকে পত্র লিখিলেন বহু।

দিবস উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, সংসারে থাকিয়া ফণীন্দ্র ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রিয় বন্ধুকে কত পত্র লিখিয়াছিলেন, শৈলেন্দ্রনাথও বন্ধুর পত্রের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন ; কিন্তু সময়ের অন্তরালে এক্ষণে কে কোথায়—পরস্পর অজ্ঞাত; এরূপ অবস্থায় শৈলেন্দ্র তাঁহার কিরূপে সন্ধান লইতে পারেন ? গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় শৈলেন্দ্রের পদোন্নতি হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট গেজেটে সময়ে সময়ে তাঁহার নাম প্রকাশ হয়। ফণীন্দ্র, ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে অনায়াসে পত্রাদি লিখিতে পারিতেন, কিন্তু সংসারধর্ম্মে বীতানুরাগী হইয়া, তিনি সে প্রিয়বন্ধুরও কোন সন্ধান করেন নাই। মতিগতির পরিবর্ত্তন সহ শৈলেন্দ্রের সংবাদ কারণ তিনি এক্ষণে উতলা হইয়াছিলেন, ইতোমধ্যে গেজেটে তিনি সেই বন্ধুর নামও দেখিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্রনাথকে পত্র প্রেরণে ব্যাকুল ফণীন্দ্র এ দফায় আদৌ বিলম্ব করেন নাই।

ফণীন্দ্রের পত্রোত্তর প্রদানে শৈলেন্দ্র ও কোন প্রকারে উপেক্ষা করেন নাই, পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তরে বহু দিনের সখ্যতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিল। দেখা সাক্ষাতে উভয়ে উৎসুক হইলেও, কর্ম্মস্থানে অবসর না পাইলে, সে সুবিধা ঘটে না, অগত্যা দুই পক্ষকেই সে শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইয়াছিল। চন্দ্রনাথবাবুকে ফণীন্দ্রনাথ যে সময়ে রেজেষ্টারি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই শৈলেন্দ্রের সহিত তাঁহার পত্রাদির আদান প্রদানের সূত্রপাত হইয়াছিল।

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

পাপের স্রোত হৃদয়ে একবার প্রবাহিত হইলে, সে গতি সহজে রোধ হয় না। অগ্নি স্পর্শে তুলারাশি যেরূপ ক্ষণমধ্যে ভস্মরাশিতে পরিণত হয়,

সেইরূপ উত্তরোত্তর পাপকার্য্যে আসক্ত হইয়া, লোকে সময়ে মহাপাপী হইয়া উঠে। গর্হিতাচরণের মোহিনী মায়া, আপাততঃ মাধুর্য্য দেখাইয়া, পরিণামে গরলরাশি উদ্গারিত করিতে থাকে! সে অনুষ্ঠানে চৈতন্যের লোপ হয় এবং অসদুপায়ে যে পরিমাণে পাপে সংরত হওয়া যায়, মনোবৃত্তি তদনুসারে বিকার ভাবাপন্ন হইয়া, ভদ্র ও ইতরের পার্থক্য রাহিত করে। ধর্ম্মপথে বিচরণ কালে, অপরকে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া, মনে ঘৃণা জন্মে; অন্যায় আচরণে সংস্কৃষ্ট লজ্জা, সম্ভ্রম ও জ্ঞানের প্রতি হীনদৃষ্টি হইয়া, অকুতোসাহসে আমরাই সমগে তাহারই অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হই! সে সময়ে হিতাহিত বিবেচনাশক্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আপাততঃ যাহাতে সুখ বোধ করি, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সানন্দে তদঙ্গে তাহাতেই অনুরক্ত হই। সে সময়ে পরিণামের ভাবনা হৃদয়ে স্থান পায় না, অনুষ্ঠিত কার্য্যই প্রীতিপ্রদ জ্ঞান করিয়া, সুধাভ্রমে হলাহল পান করিয়া থাকি।

রাধামতি বৃদ্ধের বাটীতে ধাত্রীকার্য্যে নিযুক্তা। দুঃখে কষ্টে মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিলে, নিরাপদে তাহার জীবনের শেষ দিন কাটিতে পারিত! সৎপথে চলিব, কদাচ কাহারও কথায় বিচলিত হইব না, রাধামতি এইরূপ সঙ্কল্প করিলে, আমরণকাল এক প্রকার মনের সুখে যাপন করিতে পারিত; কিন্তু অবৈধ ব্যবহারে এক্ষণে তাহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে! গৃহস্থের বধূ ও কন্যা হইয়া, সহচরীর মন্ত্রনায় লম্পট হেমেন্দ্রের করগত হইয়া, তাহাকে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে! বাটীর বাহির হইয়া, পিতা বা শ্বশুরালয়ে তাহার মুখ দেখান ভার দাঁড়াইয়াছে। বকেশ্বর ও চন্দ্রনাথ উভয়েই সমাজ-ভয়ে তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন।

দুর্ব্বিপাকে রাধামতি অপরিচিত বৃদ্ধের আশ্রয় পাইয়া, দিনপাতের সুযোগ বুঝিয়াও বুদ্ধিদোষে বিপথগামিনী। ভদ্রসমাজে রাধামতি অবশ্য স্থান

পাইবে না, তাহার জীবনের শেষ দিন দুঃখেই কাটিবে। এরূপ বিপাকে কে তাহার মুখের প্রতি চাহিবে? কলঙ্কিনী কাহার আশ্রয় লইবে? লোকের তিরস্কার লাঞ্ছনাই তাহার অঙ্গের ভূষণ! সাদরসম্ভাষণে কেহ তাহাকে আহ্বানও করিবে না। সুখস্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে এতাবৎ-কাল যাপন করিয়া, স্বেচ্ছাচারিতায় তাহাকে পরাধীনা ও সমাজচ্যুতা হইতে হইয়াছে; যথেষ্ট কষ্টভোগও করিতে হইতেছে। অন্যপক্ষে সে পূর্ণ যৌবনা—এ বয়সে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সকল ভোগ লালসায় বিরতা হইয়া, কালক্ষেপ করা তাহার পক্ষে সহজ নহে! রিপু-প্রাবল্যে কোন পথ অবলম্বন করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। বৃদ্ধের গৃহে কয়েক দিবস কালক্ষেপ করিয়াই, রাধামণি সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিল। কুপ্রবৃত্তি তাহার উপর এখনও আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ক্ষণিক সুখলাভে যে পাপের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইবে, দেহ বিনিময়ে অসার অর্থলাভে তাহার যে পরিণামে সর্ব্বনাশ হইবে, মৃত্যু শয্যায় শায়িতা হইয়া, আত্মীয় স্বজন দূরের কথা, ভদ্র ইতর কোন নর নারীই তাহার মুখে এক গণ্ডূষ জলও প্রদান করিবে না; এ সকল আদ্যোপান্ত না ভাবিয়া, যাহাতে আপাততঃ মনের সুখ লাভ হইতে পারে, সেই পথে অগ্রসর কামনায়, সে বৃদ্ধের নিকট বিদায় চাহিল।

কামান্ধ যুবক ভবিষ্যতের প্রতি চাহিয়া দেখে না, অথচ এই প্রকৃতির লোক কর্তৃক বারাঙ্গনা পোষিতা ও প্রতিপালিতা হইয়া থাকে। গৃহস্থের বধূ আজন্মকাল শ্বশ্রূঠাকুরাণী ও ননদিনীর ভর্ৎসনা গঞ্জনা সহ্য করিয়া সংসারধর্ম্ম রক্ষা করে; স্বামী সঙ্গতিপন্ন না হইলে, স্ত্রীলোকে সংসারে সুখ পায় না। তথাচ সংসারযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহিত হইবে, সমাজনীতি রক্ষা করিয়া কি প্রকারে দিনাতিপাত হইবে, এই ভাবনা চিন্তায় তাহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইতে থাকে; এরূপ কষ্ট স্বীকারেও হিন্দু-রমণী সতীত্ব রত্নের অধিশ্বরী হইয়া, স্বামীসহবাসে এক সন্ধ্যা আহার করিয়াও

মনের সুখ উপভোগ করে। রাধামতির অদৃষ্টে সে পথ রোধ হইয়াছে; সংসারী হইয়া সে যে সেই সুখ পাইবে, ইহজন্মের মত তাহার সে আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিয়াছে!. রূপ ও যৌবন গর্ব্বে এ সময়ে রাধামতি দশ টাকা সংস্থান করিতে পারিলে, সম্ভবতঃ পরিণামে তাহাকে দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না, গৃহধর্ম্মের প্রবেশ-দ্বার তাহার পক্ষে রুদ্ধ হইয়াছে; এই রূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া, এ বয়সে পরের দাসত্ব স্বীকারে তাহার মন বসিল না। ব্যাভিচার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এক চরিত্রহীন যুবকের প্ররোচনায় রাধামতি জীবিকা নির্ব্বাহ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল।

সচরাচর লম্পট হতভাগ্য যুবক সম্প্রদায় বারবিলাসিনীর চাতুরীময়ী প্রেমে মোহিত হইয়া উপপত্নীর সন্তোষ বিধানে বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করিয়া থাকে। অন্যপক্ষে বেশ্যার চিত্ত-স্থিরতা নাই, যখন যাহার নিকট অধিক পরিমাণে অর্থ উপায়ের সুযোগ বুঝে, কৃত্রিম ভালবাসা দেখাইয়া মিষ্ট কথায় তাহাকে জীবনের এক মাত্র অবলম্বন জানাইয়া, তাহার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া লয়; কিন্তু উপপতির অর্থাভাবে তাহার প্রতি সে পূর্ব্ব আদর যত্ন আর করে না! অধিক কি, তখন তাহাকে বিদায় করিতে চেষ্টা পায়; কিন্তু অসতী রমণী এরূপ পথ অবলম্বন করিয়া, এক দণ্ডও মনের সন্তোষ লাভ করিতে পারে না। আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপে বাহ্যিক সুখের ভাণ করিলেও, প্রকৃত সুখ লাভে সে রমণী চিরবঞ্চিতা! যেহেতু তাহাকে নিত্য নূতন লম্পটের মনস্তুষ্টি করিতে হয়। রমণী ব্যভিচারিণী হইলে, কদাচ মনোশান্তি উপভোগ করিতে পারে না। প্রেমিক সহবাসে প্রেমালাপে উন্মত্ত হইয়া, ভবিষ্যতের পথে চিরকালের জন্য সে কণ্টক ক্ষেপ করে। রাধামতি বৃদ্ধ প্রতিপালকের বাটী হইতে বিদায় লইয়া, অসার সুখ-ভোগ কামনায় যুবক সহবাসের কল্পনা করিল। অসৎ প্রবৃত্তির যন্ত্রনা পরক্ষণে অনুভূত হইয়া থাকে। ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি নৈসর্গিক বিঘ্ন বিপত্তি না

মানিয়া, রাধামতি পদব্রজে যে প্রেমিকের অনুসন্ধানে কতস্থানে যাতায়াত করিল, কত অন্তর্বেদনা ভোগ করিল, সে লম্পট অনর্থক কত আশাছলনায় তাহাকে ভুলাইয়াছিল; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল না, অভাগিনীর মনের কল্পনা মনেই মিলাইল, আশা পূরিল না।

হেমেন্দ্র বাটী ফিরিয়া যাইলে, তাহার কারণ এক সময়ে রাধামতির মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে বর্ত্তমান লম্পটের বিকৃত ব্যবহারে রমণী তাদৃশ বিচলিত হইল না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছে, পতির আদর যত্নে উপেক্ষা করিয়া, অভাগিনী দুর্গতির চরম সীমায় দাঁড়াইয়াছে। তাহার সরল হৃদয়ে এক্ষণে কাঠিন্য আশ্রয় লইয়াছে। অন্যের অশ্রুজলে যুবতীর চিত্ত আর আর্দ্র হয় না! যে কোন উপায়ে দশ টাকা সংস্থান হইতে পারে, বার্দ্ধক্যে দীনতার কাঠিন্যে পরিত্রাণ পাইবে, এই উদ্দেশ্যেই রাধামতি বিপথগামিনী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু লম্পটের ব্যবহারে তাহার মতিগতির পরিবর্ত্তন হইল। ভগবৎ কৃপায় তাহার সে সঙ্কল্প বিফল হইবামাত্র, কপটতার পূর্ণ মূর্ত্তি ধারণে সে অন্য ভাব গ্রহণ করিল। সমাজচ্যুত হইয়া রূপলাবণ্যই উপার্জ্জনের সম্বল জানিয়া, রাধামতি একবার অসদাচরণে চেষ্টা পাইল, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইল না। হেমেন্দ্রের আয়ত্তাধীনে যে রাধামতি সতীত্বধর্ম্ম রক্ষায় প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল; অর্থপিপাসায় সেই রমণী সেই ধর্ম্মনষ্ট করিতে অভিলাষিণী! মিথ্যাকথা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা যত কিছু জগতে দূষ্য বলিয়া গণ্য, একে একে সকলগুলিই যুবতী আশ্রয় লইয়াছিল। নিষ্ঠুর ঘাতক যেরূপ দয়া মায়া শূন্য হইয়া অপরাধীর প্রাণদণ্ড করে, প্রেমোন্মত্তা রাধামতি সেইরূপ নির্দ্দয়া, কিন্তু চঞ্চলা যুবতীর এ ভাব কতক্ষণের জন্য?

রাধামতি পিতৃগৃহে বা শ্বশুরালয়ে যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিয়াছে, গ্রহবৈগুণ্যে পিত্রালয়ত্যাগে এক দিনের জন্যও সে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। সংসারে সে এক্ষণে একাকিনী, নিঃসহায়া; তাহার

পীড়ায় সেবা করিতে কেহ নাই, আলাপ পরিচয়ে হীনচেতা স্ত্রীলোক তাহার আত্মীয়স্থানীয়া হইতে পারে! গৃহস্থের কুলবধূ হইয়া—গৃহধর্ম্মে থাকিলে, তাহার এ দুর্গতি কেন? পৃথিবীর দেবতা—পতি পদসেবায় তাহার মনের সুখে দিনপাত হইত! অসৎপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় সতী অসতী হইয়াছে; কিন্তু রাধামতির প্রতি ভগবানের অপার করুণা, অভাগিনী বিপথগামিনী হইবার কল্পনা করিলেও, বিধিদত্ত সতীত্ব ধনে বঞ্চিতা হয় নাই! কুলমান বজায় থাকিলেও অনুষ্ঠিত কার্য্যে তাহার সে পথ রোধ হইয়াছে, এক্ষণে জীবনের অবশিষ্ট কাল তীর্থাদি পর্য্যটনে ক্ষেপণ করিবার অভিপ্রায়ে যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থ লইয়া জনৈক সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিল।

রাধামতির কেশদাম তৈলাভাবে রুক্ষ, সুবর্তীর বেশবিন্যাস বা পারিপাট্য নাই; যৎসামান্য এক সন্ধ্যা আহারে দিনাতিপাত, পরিধানে স্থূল মলিন বাস; এক্ষণে সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা, কি প্রকারে মহাপাতকে পরিত্রাণ পাইবে, ভীষণ নরক যন্ত্রনায় অব্যাহতি লাভ করিবে, ইহাই তাহার সাধনা। মিত্রজ মহাশয়ের নয়নপুত্তলি সুবর্ণ প্রতিমা রাধামতি ধূলায় ধূসরিতা! সে লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য্য, অসামান্য রূপ রাশি যুবতীর এক্ষণে কোথায়? কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! ভগবান লীলাময়! তোমার লীলা চমৎকার!

ত্রিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

কামিনীর কুমন্ত্রণায় রাধামতি বৃদ্ধ পিতাকে নিঃসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। শোকতাপে বৃন্দেশ্বরের দিনাতিপাত হইতেছে। মিত্রজের পরম সুহৃৎ দ্বারকানাথ সমভাবে তাঁহার প্রতি আদর যত্ন করিতেছেন; তাঁহার অনুগ্রহে এরূপ দীনাবস্থাতে মিত্রজের কোন কষ্ট নাই।

রাধামতির গৃহত্যাগ বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বেই তাহার শ্বশুরালয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দ্রনাথ বক্কেশ্বরের নিকট সবিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। অভাগা বক্কেশ্বর দুহিতার কলঙ্কের কথা জানাইয়া, সে পত্রের আর কি উত্তর দিবেন? জনসমাজেও রাধামতির গৃহত্যাগের কথা নানা ছাঁদে রাষ্ট্র হইয়াছে। বক্কেশ্বর নিরপরাধী হইয়াও কন্যার কারণ জনসমাজে অপরাধী, লোকমুখে তাঁহার নিন্দা ঘোষিত হইয়াছে। কন্যাকে আজীবন আমোদপ্রমোদে তন্ময়া দেখিয়াও, তিনি তাহার চরিত্র সংশোধনের যথাযথ প্রতীকার করেন নাই, তাঁহার শৈথিল্যে রাধামতির চরিত্রে এরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, ইত্যাদি কত ভাবে কত লোক কত কথা বলিতেছে। রাধামতির দুর্ম্মতির প্রধান কারণ পিতামাতার অবৈধ আদর যত্ন। এক্ষণে অভাগা বক্কেশ্বরের কথা লইয়া হাটে, ঘাটে কত কথা উঠিতেছে! পুত্র-কন্যা জনিত অপবাদ পিতামাতার অসহ্য হইলেও, বক্কেশ্বর সে সকল কুৎসা ভগ্নহৃদয়ে বহন করিতেছেন!

বক্কেশ্বরের সংসারে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা নাই, এরূপ মনস্তাপে কোনপ্রকারে মুক্তিলাভ করিলেই, মিত্রজ আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। দ্বারকানাথ হেমেন্দ্রের জন্য কয়েক দিন দুঃখিত ছিলেন, কিন্তু রায় মহাশয়ের সংসারে অভাব কোথায়? লোক জন দাস দাসী দিবারাত্রি কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত, তাহারা সতত প্রভুর মনস্তুষ্টি করিতেছে, উপযুক্ত সন্তান মহেন্দ্রনাথ তাঁহার আজ্ঞাবাহী; পরিজনবর্গ সকলেই সংসারধর্ম্মে অনুরক্ত, কিন্তু বহুকালাবধি বক্কেশ্বরের সহিত তাঁহার সখ্যতা, তাহাতে এক সময়ে বক্কেশ্বরের পিতার নিকট তিনি যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন, ধার্ম্মিক ও উদারচেতা রায় মহাশয় তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ভদ্রসন্তান ঘটনাচক্রে দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, এ সময়ে যথাসাধ্য সাহায্য না করিয়া, তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। অন্যপক্ষে তিনি মিত্রজের সুখদুঃখের সহ-

ভাগী ; বক্কেশ্বরের বিপদে রায় মহাশয় বিচলিত না হইবেন কেন ? যাহাতে রাধামতিকে সত্বর গৃহে আনা হয়, সে চেষ্টাও তাঁহার যথেষ্ট কিন্তু সম্ভবতঃ রাধামতি কুপথগামিনী হইয়াছে,তাহাকে গৃহে আনিলে জনসমাজে অধিকতর কলঙ্ক ঘোষিত হইবে ; এই আশঙ্কায় সর্ব্বপ্রথমে রায় মহাশয় তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতে পারেন নাই। কথাপ্রসঙ্গে এ কথাও সময়ে বক্কেশ্বরের কর্ণগোচর হইয়াছিল।

মিত্রজের এক পক্ষে সমাজ-বন্ধন, অন্যপক্ষে অপত্যস্নেহ ; তিনি এখন কোন দিক্ রক্ষা করেন ? একবার ভাবিলেন, রাধামতিকে গৃহে আনিয়া, সমাজের সহিত সংস্রব রাখিবেন না, পরক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় এরূপ কলঙ্ক মস্তকে লইবেন, এই ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। এরূপ বিপাকে দিন দিনে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। দ্বারকানাথ তাঁহার আহারাদির তত্ত্বাবধানে যত্নবান্ হইয়াও, তাঁহার ব্যাকুল চিত্তের শান্তি বিধানে অক্ষম হইলেন ! পথে ঘাটে, এমন কি—পাঠশালার ছেলেরা পর্য্যন্ত বক্কেশ্বরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। মিত্রজ এক্ষণে মৃত্যুই মঙ্গল জানিয়াছেন, কিন্তু বিধির বিধি পাপপুণ্যের ফলভোগে কি অব্যাহতি পাইতে পারে ? দুঃসহ মনোকষ্টে বক্কেশ্বর উন্মাদ হইলেন। সাংসারিক ভোগবাসনা তাঁহার মন হইতে অন্তর্হিত হইল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া এক্ষণে দুরবস্থার চরম সীমায় আসিয়াছেন। পতিপ্রাণা কমলা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীশ্রীও ঘুচিয়াছে, এইরূপ মনোকষ্টভোগ করিয়াও রাধামতিকে লইয়া বক্কেশ্বর সংসারী হইয়াছিলেন, কিন্তু অভাগিনীর গৃহত্যাগে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ! সুবিজ্ঞ দ্বারকানাথ ঔষধ পথ্যের যথাযথ বন্দোবস্ত করিলেন, তাহাতে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু মনাগুণে তাঁহার চিত্ত-বৈকল্য, সেই চাঞ্চল্যে তিনি অহোরহঃ দগ্ধ বিদগ্ধ ! সে যন্ত্রনা নিবারিত হইবার নহে ! কন্যা রাধামতিই বক্কেশ্বরের শেষ জীবনের

বিঘ্নবিধায়িনী! সকাল সন্ধ্যা কন্যার চিন্তায় মিত্রজ আকুলিত; রায় মহাশয় তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সময়ে সময়ে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টিত হইয়াও, সে প্রয়াস তাঁহার ব্যর্থ হইল। সংসারজীবনে আহার বিহার প্রয়োজন, অভাগা বক্কেশ্বর শোকতাপ সহ্য করিয়াও, সে দৈনন্দিন অভাব পূরণে অনিচ্ছা সত্বেও ব্রতী রহিয়াছেন!

রায় মহাশয় মিত্রজকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন। তিনি তাঁহার মনোবিকার কারণ স্থানান্তরে তাঁহাকে পাঠাইতে পারিলে, অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইতে পারেন ভাবিয়া, এক দিন সন্ধ্যাকালে কথাপ্রসঙ্গে বক্কেশ্বরের পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে যাইবার কথা উত্থাপন করিলেন। বক্কেশ্বর এক্ষণে সংসারী হইয়া অসংসারী, গৃহী হইয়া গৃহশূন্য! অসার সংসারে তাঁহার দেহভার কষ্টপ্রদ, কোন গতিকে ইহজীবনে অব্যাহতি পাইলেই তাঁহার সে দুঃখ কষ্ট দুশ্চিন্তা সমস্ত ঘুচিয়া যায়; কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সুদীর্ঘ জীবন দিয়াছেন, এরূপ অসামান্য ঘাতপ্রতিঘাতেও তাঁহার শারীরিক তাদৃশ গঠনের হ্রাস হয় নাই! বাল্যকালাবধি কত পরিবর্ত্তন তাঁহার অদৃষ্টে সংঘটিত হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ শোকদুঃখের প্রবল ঝটিকায় আলোড়িত আন্দোলিত হইয়াও, সে দেহ-তরু উন্মূলীত হইল না! নিরাশ্রয় নিঃসহায় নিঃস্বাবস্থায় দিনাতিপাত করিয়াও বক্কেশ্বর বন্ধুর অনুরাগ লাভ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ তাঁহাকে সহোদর সদৃশ ভালবাসিতেন। কন্যা-বিরহশোকে মিত্রজ অহোরাত্র ম্রিয়মাণ, সে দৃশ্যে রায় মহাশয়ও বিচলিত; কিন্তু সংসারে সকল দিক বজায় রাখিয়া জীবন ধারণ সুলভ নহে; অধিকন্তু মরণাবধি লোকনিন্দা সহ্য করা কষ্টকর বুঝিয়াই, তিনি বার্দ্ধক্যের সম্বল ধর্ম্ম সঞ্চয়ে বাধ্য হইয়াছিলেন। বক্কেশ্বর দ্বারকানাথকেই সংসারের অবলম্বন জানিতেন, সে কার্য্যে রায় মহাশয়ের অভিরুচি, অগ্রপশ্চাৎ না চাহিয়া, তিনি তাহাতেই স্বীকৃত হইবার কথা।

সাংসারিক কার্য্যে সংযত থাকিয়া, এতাবৎকাল বক্কেশ্বরের ধর্ম্ম কর্ম্ম

কিছুমাত্র অনুষ্ঠিত হয় নাই, এক্ষণে বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত। বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলে, পরিণামে মঙ্গলের পক্ষে বিঘ্নবিপত্তির সম্ভাবনা; এক্ষণে সে পথে কণ্টক আরোপিত হইয়াছে। তিনি ঈশ্বর চিন্তায় সংযত থাকিয়া, জীবনের শেষ দশা মনের আনন্দে যাপন করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু রাধামতির এরূপ গৃহত্যাগে তাঁহার সে আশা-লতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। কন্যাশোকে অধীর হইয়া, তিনি ধর্ম্ম কর্ম্মে লক্ষ্য না রাখিয়া সর্ব্বক্ষণ ক্ষুণ্ণমনে যাপন করিতে ছিলেন।

দ্বারকানাথ সুখসম্ভোগের যথেষ্ট সুবিধা পাইলেও, তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, পরোপকারী ও সরল হৃদয়। পরেশ মঙ্গলচিন্তা রায় মহাশয়ের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, বক্রেশ্বরের মনস্তুষ্টির কারণ তিনি অর্থব্যয়েও কাতর নহেন। পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থপর্য্যটনে ঐহিক ও পারলৌকিক উভয় পক্ষেই মঙ্গলকর ভাবিয়া, দ্বারকানাথ মিত্রজকে তীর্থ যাবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এরূপ ভ্রমণে মনের পরিবর্ত্তন ও ঠাকুর দেবতা দর্শনে পুণ্যসঞ্চয় সম্ভাবনায়, বক্রেশ্বর রায় মহাশয়ের প্রস্তাবে দ্বিধাশূন্য চিত্তে স্বীকৃত হইলেন।

হেমেন্দ্র পৈত্রিক ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এতাবৎকাল আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করিয়া আসিতেছিল। সঙ্গদোষে লোকসমাজে তাহার অখ্যাতি ঘোষিত হইয়াছে; সকলেই হেমেন্দ্রকে লম্পট ও সুরাপায়ী জানিয়া অবজ্ঞা করে; আত্মীয়স্বজন, অধিক কি, তাহার পিতামাতা সকলেই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট। বেশ্যার বাহ্যিক অনুরাগও এক্ষণে হতভাগ্যের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, যে বিনোদিনীকে না দেখিলে, সংসার তাহার পক্ষে শূন্যময় বোধ হইত, যাহার মনস্তৃপ্তির কারণ হেমেন্দ্র—পতিব্রতা পত্নীর হৃদয়ে মর্ম্মাঘাত করিয়াছিল, সতী লক্ষ্মী সরলাকে জন্মের মত হারাইয়াছিল. সেই বারবিলাসিনী আমোদিনী—এক্ষণে অন্যের উপভোগ্যা! আমোদিনী তাহার প্রতি আর চাহিয়া দেখে না—এরূপ অবস্থায় হেমেন্দ্রের কথঞ্চিৎ চৈতন্যের উদয়

হইয়াছে; তাহার বহু দিনের সাধ রাধামতির সতীত্ব নাশে সে একান্ত আসক্ত ছিল, কামিনীর সহায়ে সেই রমণীকে আয়ত্তাধীন করিতে যাইয়া অভাগা ব্যর্থমনোরথ হইয়াছে, অথচ লোকাপবাদে তাহার মুখ দেখান ভার দাঁড়াইয়াছে। হেমেন্দ্রের আর পূর্ব্বমত দাম্ভিকতা বা বিলাস-লিপ্সা নাই। সুরা ও বেশ্যা মহিমা এক্ষণে তাহার হৃদয়ে স্তরে স্তরে সম্যক ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। অনুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য যুবক অনুতাপিত। জীবনে আর কখন এরূপ গর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না, মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, পিতার শরণাগত হইতে রায়পুত্র এক্ষণে চেষ্টা পাইতেছে। দ্বারকানাথ কলিকাতা হইতে হেমেন্দ্রকে বাটী লইয়া আসিয়া, তাহার স্বভাব চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে পিতা মিত্র সহ পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে যাইতেছেন শুনিয়া, হেমেন্দ্র তাঁহাদের অনুগামী হইতে অভিপ্রায় জানাইল। পুত্র সঙ্গে থাকিলে, অবশ্য তাহার চরিত্র অপেক্ষাকৃত সংশোধিত হইবে স্থির জানিয়া, দ্বারকানাথ হেমেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

বসুজ-গৃহিণী মাতঙ্গিনীর ন্যায়-পরায়ণতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল, সঙ্গত কার্য্যের অনুমোদনে তিনি কোন প্রকার উপেক্ষা করিতেন না। পুত্র ফণীন্দ্রনাথ ও কন্যা তারামণিই তাঁহার সংসারের অবলম্বন; স্বামী বার্দ্ধক্য দশায় পরিণত হইয়াছেন; বিষয় সম্পত্তি রক্ষায় পতির যত্ন থাকিলেও, গৃহধর্ম্ম পালনে, তাদৃশ মনোযোগ ছিল না; মাতঙ্গিনী সংসার কার্য্য বিচক্ষণতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। ফণীন্দ্রনাথের অদর্শনে গৃহিণী সংসার-বন্ধনে পতির

শৈথিল্য বুঝিয়া, বধূমাতাকে পিতৃগৃহ হইতে আনাইয়া ঘর সংসার বজায় রাখিতে মনস্থ করিলেন। কথায় কথায় তিনি একদিন চন্দ্রনাথকে বলিলেন, "ভাল, ফণীন্দ্র যেন নিরুদ্দেশ হইয়াছে, পুরুষ মানুষ বেঁচে থাকিলে—গৃহে আসিবে! আমাদের একান্ত দুরদৃষ্ট, নতুবা এমন হইল কেন? এক দিনও বাছার রাগ বা অভিমান দেখি নাই, মুখ তুলিয়া যে কাহাকে কখনও একটি কথার উত্তর করে নাই! দৈবক্রমে মন খারাপ হওয়াতে, সে গৃহত্যাগী হইয়াছে, কেন যে এমন ঘটিল—কিছুই জানি না; কিন্তু একের অভাবে যে সংসারটা যাইতে বসিয়াছে—দেশ বিদেশে তুমি তো তাহার সন্ধান লইতেছ, কোন খপরই পাওয়া যাইতেছে না, এখন দিন কতক বধূমাতাকে এ বাটীতে আনিলে হয় না?"

চন্দ্র। তুমি আমাকে যে কথার উল্লেখ করিলে, ইহাতো নূতন নহে! আমি সবই জানি, সবই বুঝি; কিন্তু ইহার প্রতিকারেরতো কোন উপায় দেখি না! আমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ, পুত্র কন্যা লইয়া লোক সংসারী হয়, ভগবানের কৃপায় আমার সে সুখের কোন অভাব ছিল না, যোগ্য পাত্রে তারামণিকে সম্প্রদান করিলাম! লোকে ঘর বর দেখিয়া কন্যা সম্প্রদান করে, আমাদের পক্ষে তাহার কোন ত্রুটি হয় নাই; সভা আলো করা জামাই—কিশোরী মোহন আজ বাঁচিয়া থাকিলে, আমাকে এত নৈরাশ হইতে হইবে কেন? ভগবান সে সাধে বাদ সাধিয়াছেন। তারামণি আপনার সংসার আপনি বুঝিয়া লইবার পূর্ব্বেই, সোনার চাঁদ কিশোরী কালকরলে—ঈশ্বর যাহা করেন, তাহাই ভাল; আমার সংসারের একদিক শূন্য হইল! কন্যার বৈধব্যে পিতামাতার যে কত কষ্ট, তুমি আমি তাহা ভালরূপই বুঝিয়াছি—কিশোরী মোহনের শোক হাড়ে হাড়ে বাঁধিয়াছে! যে দুইটী ধ্রুব তারা অবলম্বন করিয়া সাধের সংসার পাতিলাম, তাহার একটী তো অঙ্গহীন হইয়াছে, মেয়ে—পরের ঘরে থাকিবে, স্বামীর সোহাগ পাইবে,

শ্বশুর শাশুড়ীর আদরিণী হইবে, বাপমার এইতো সাধ! কিন্তু একের অবর্ত্তমানে তারামণির কি অবস্থাই দাঁড়াইয়াছে! যে দিন সে বিধবা হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহার সংসারের সকল সাধ আহ্লাদ শেষ হইয়াছে। তার উপর ফণীন্দ্র নাথের আক্কেলই বা কি? এতদিন যে তাহাকে লালন পালন করিলাম, লেখাপড়া শিখাইলাম—আমার সবই ভস্মে ঘি ঢালা হইল।

বিষণ্ণচিত্ত চন্দ্রনাথের চক্ষে জলধারা দেখিয়া, মাতঙ্গিনী পতির সান্ত্বনা কারণ বলিলেন, ভাল, যা হ'বার হইয়া গিয়াছে, যে রাখে—সেই মারে! গত বিষয়ের অনুশোচনায় ফল কি? সংসারে যে কয়েক দিন থাকিতে হয়, সকল দিকেইত লক্ষ্য চাই। শোক তাপে বিহ্বল হইয়া জড়ের অবস্থা প্রাপ্তিতে সুখ কি? জ্বালা যন্ত্রনায় তোমার আমার—দুই জনেরই—মনটা খারাপ হইয়াছে, মরণ হইলেই মঙ্গল! কিন্তু ইচ্ছা করিলেই কি মৃত্যু হয়? ভাগ্যদোষে সংসারের সাধ আহ্লাদ সকলই শেষ হইয়াছে, আর বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা! লোকে কথায় বলে—বিধবা কন্যা ও পতিহীনা পুত্রবধূ সংসারের অমঙ্গল! আমাদের কপালে দুটই জুটিয়াছে, কিন্তু ভগবান কি আমাদের প্রতি এতই নিদয় হইবেন? অন্ধের নয়নমণি জীবনসর্ব্বস্ব ফণীন্দ্রকে তিনি কি জন্মের মত কাড়িয়া লইবেন? সে যে আমার সুবোধ ছেলে, গ্রহ বৈগুণ্যে, তাহার মতিভ্রম ঘটিয়াছে, সে সংসারের প্রতি ধিক্কার দিয়া, আমাদের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া, দেশত্যাগী—অবশ্যই এক দিন না এক দিন তাহার দেখা পাইব! আঁধার সংসারে, ফণীন্দ্রের চাঁদ মুখ আবার দেখিব! সে আমাকে মা বলিয়া ডাকিবে, তাহার মুখের কথায়, প্রাণ শীতল করিব! কতদিনে মা শুভচণ্ডী তাহাকে সুমতি দিবেন, সাবেক ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিবে।"

চন্দ্র। এ জন্মে কি সে শুভ দিন আর আসিবে? তুমি মেয়ে মানুষ, সরল প্রাণ অত-শত বোঝ না, কিন্তু আমার মনে হয় যে, সে কপাল জন্মের মত ভাঙ্গিয়াছে।

মাত। না, তুমি এরূপ অকল্যাণের কথা মুখে আনিও না, এখন দিন কতক বধূমাতাকে বাপের বাড়ী থেকে আনাও, তাহার মুখ দেখে দিন কতক সংসারধর্ম্ম করি, এত সাধের সংসার এক কালে তুলিয়া দিতে—মন সরে না! ঘর কন্না, বাগান বাড়ী—সব জলাঞ্জলি দিয়া দেশ-ত্যাগী হ'তে প্রাণে বড় বাজে। আমার কথা রাখ, আর দিন কয়েক সংসারে থাক!

চন্দ্র। সাজান ঘর কন্না তুলে দিতে কার ইচ্ছা করে? সংসার করতে সুখ দুঃখ আছে, তা জানি, কিন্তু রক্ত মাংসের দেহে, মানুষের প্রাণে—দুই এ কত আর সহ্য হয়? সোনার চাঁদ জামাইটা গেল, একটা ছেলে নিয়ে ঘর করিতেছিলাম, তাও নদীর দখল, দেখতে দেখতে সাত বৎসর হয়ে গেল, ফণীন্দ্রের কোন সন্ধানও পাওয়া গেল না! সে কি এত দিন বেঁচে আছে? সুখভোগে তাহার জন্মাবধি কাটিয়াছে, কষ্টের লেশমাত্রও সে ভোগ করে নাই! বিদেশ বিভুঁয়ে আত্মীয় স্বজন বিহনে সে আমার কত কষ্টই ভোগ করিতেছে।

মাত। আমি তোমায় যে কথা বলতে যাই, কথায় কথায় অন্য কথা আসিয়া পড়ে, সে কথার কোন নিষ্পত্তি হয় না। এখন বৌ-মাকে এ বাটীতে আনিবার একটা ব্যবস্থা কর!

চন্দ্র। ছেড়ে দিয়ে ভেড়ে ধরলে—কি কাজ হয়? বৈবাহিক মহাশয়ের সংসারে কন্যা ভিন্ন আর কেহ নাই, এই কারণে সর্ব্ব প্রথমে বধূমাতাকে সুদীর্ঘ কাল পিত্রালয়ে রাখা হয়; আর এক কথা, বৌ-মা আমার আদরের মেয়ে, সে বাপের বাড়ী থাকিতে ভাল বাসে, এখনে

এলেই তাহার মন খারাপ হয়। তোমাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তায় সে আহ্লাদিতা না হয়ে, মনক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় তাহাকে এ বাটীতে এনেই বা সুখ কি?

মাতঙ্গিনী বধূমাতাকে লইয়া আসিবার জন্য স্বামীকে পুনঃ পুনঃ আকিঞ্চন করিলেন, কিন্তু কর্ত্তার মন এতই বিচলিত হইয়া ছিল যে, গৃহিণীর সকল কথা উপেক্ষিত হইল। তাহাতে চন্দ্রনাথ বলিলেন, "ফণীন্দ্রই যদি দেশ ত্যাগী, তবে আর সংসার কেন? পরের মেয়েকে ঘরে এনে কষ্ট দেওয়া অনর্থক!"

স্ত্রী পুরুষে সংসার সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে বহুক্ষণ যাপন করিল। মিত্রজ-কন্যা হেমেন্দ্রের কুহকে পড়িয়া যে গৃহত্যাগ করিয়াছে, এ সংবাদ চন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে জ্ঞাত হইলেও, মনের বেদনা মনেই সম্বরণ করিয়া ছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী মাতঙ্গিনী—গৃহলক্ষ্মী, সংসারের কাজ কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, সমাজে কোথায় কি হইতেছে, সে সকল সংবাদ তাঁহাকে লইতে হয় না। ফণীন্দ্রের অদর্শনে তাঁহার মন বিশেষ বিচলিত হইয়াছিল, মনের আবেগে বধূমাতাকে বাটীতে আনিবার জন্য স্বামী সকাশে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন, কিন্তু চন্দ্রনাথ সে কথায় আদৌ আস্থা প্রদান করিলেন না।

হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বারাণসী, ভাগিরথী তীরে। দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরের দিব্যমূর্ত্তি এখানে বিরাজমান। মহারাজ রঞ্জিৎ সিংহ মহাদেবের উপাসক, তিনি বহু ব্যয়ে ভক্তি-নিদর্শন এই দেবাদিদেবের মন্দির স্বর্ণমণ্ডিত করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি দর্শক মাত্রেই সে পরিচয় স্বচক্ষে দেখিয়া থাকে। ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুর আস্থা ও অনুরাগ, ধর্ম্মানুষ্ঠানে কঠোর জীবনযাপনে হিন্দুসন্তান যে কষ্ট সহ্য করে, অন্য কোন জাতির সে প্রথা দেখা যায় না। রেলওয়ের [illegible] লোকের সুবিধা হইয়াছে। ইচ্ছা করিলেই

যথেচ্ছা গমনাগমন করা যায়; কিন্তু পুরাকালে ধার্ম্মিকগণ কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটনে কত কষ্ট সহ্য করিতেন। রুদ্রদেব মূর্ত্তি বক্ষে লইয়া কাশী মোক্ষ ধাম, জগন্ময়ী জগজ্জননী শিবসমস্তিনী অন্নপূর্ণা এই পুণ্যধামে বিরাজিতা। তাই কাশীতে মৃত্যু হইলে, জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়—এই ধর্ম্ম বিশ্বাসে পিতামাতা জীবনসর্ব্বস্ব সন্তান সন্ততির মায়া মমতা ভুলিয়া, কোলের ছেলে ঘরে রাখিয়া, দেশদেশান্তর হইতে এই পুণ্যতীর্থ বারাণসী ধামে আসিতেন, এক্ষণে সে দুর্গম পথ সুগম হইয়াছে, সে ভাবের ভাবান্তরও দাঁড়াইয়াছে।

চন্দ্রনাথ বসু বার্দ্ধক্যের অবলম্বন একমাত্র পুত্র, ফণীন্দ্রনাথকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তাঁহার সংসারে তরামণি বিধবা কন্যা—অভাগিনী বালবিধবা, পিতৃ-গৃহেই তাহার দিনাতিপাত। স্বামীর মৃত্যুতে হিন্দুরমণীর শ্বশুরালয়ের সম্বন্ধ রহিত হইলেও, ভদ্রসন্তান পুত্রবধূর ভরণ পোষণের যথাযথ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু অনাথিনী তারামণির শ্বশুর পক্ষ হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। চন্দ্রনাথ অক্ষম পুরুষ নহেন, পৈতৃক সম্পত্তিও তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ ছিল। দুহিতার জন্য জামাতার বিষয় সম্পত্তি হস্তগত উদ্দেশ্যে আদালতে আশ্রয় গ্রহণে অপমান ভাবিয়া, তিনি কন্যাকে আপনার গৃহেই রাখিয়াছিলেন এবং তারামণির আবশ্যক মত দুই দশ টাকা তাহাকে দানও করিতেন। চন্দ্রনাথের পরিবার সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে, তিনি স্বয়ং, সহধর্ম্মিণী মাতঙ্গিনী, তারামণি ও ফণীন্দ্র। যথা সময়ে তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ রূপে পরের কন্যাকে তাঁহার পরিবারভুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কালক্রমে পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়েই তাঁহার সংসারভুক্ত নহেন।

খাদ্য গ্রহণে যে তৈজসপত্রাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সেইগুলি সঙ্গে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন [illegible]

কোন প্রয়োজন হইবে না—বুঝিলেন, তৎসমুদয় তিনি একটী গৃহ মধ্যে তালাবদ্ধ করিয়া রাখার ব্যবস্থা করিলেন।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আহার সামগ্রীর অভাব হয় না, চন্দ্রনাথ পরিধেয় বস্ত্রাদি কয়েকখানি সংগ্রহ করিলেন, প্রয়োজন মত টাকা কড়ি সঙ্গে লইয়া যাইবারও বন্দোবস্ত হইল। এদিকে তারামণি ও মাতঙ্গিনী গৃহস্থালীর উপযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যাদি গুছাইতে লাগিলেন। যথা সময়ে তীর্থ যাত্রার দিন স্থির হইল। বসুজ-পরিবার সকলেই কাশীযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে ফণীন্দ্র নাথ প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বাল্যকালাবধি তিনি সঞ্চয়ী, কখন অসৎসঙ্গে কালক্ষেপ করেন নাই, জ্ঞানোন্নতি সহ বিষয় বুদ্ধিও তাঁহার বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় তিনি বাটী হইতে মনের উদ্বেগে বহির্গত হইয়া ছিলেন। ক্রোধভরে বহুদিন পিতা ভ্রাতার কোন সংবাদ গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তিনি যে গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার ব্যবহারে বৃদ্ধ পিতা মাতার সুখ-শান্তি ভঙ্গ হইয়াছে—এ কথা এক্ষণে তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে, তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। পিতা ও পরিজন বর্গের সংবাদ প্রাপ্তির আশয়ে অনুনয় বিনয়পূর্ণ একখানি রেজেষ্টারি পত্র লিখিলেন, তৎসহ একখণ্ড সহস্র মুদ্রার করেন্সি-নোট পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সে পত্রখানি চন্দ্রনাথ কিরূপে পাইতে পারেন? ডাকঘর [illegible] 'গ্রাহক [illegible] নাই'—মন্তব্য জানাইয়া, পত্রখানি ফেরত পাঠাইয়াছেন, [illegible] ফণীন্দ্র নাথের হস্তগত হইয়াছে।

পিতা, মাতা, ভগ্নী. সহধর্ম্মিণী, কে কোথায়? বহুদিন গৃহত্যাগী নিরুদ্দেশী হইয়াছি! তাঁহাদের সংবাদ কি? করাল কাল কি সে পরিজনবর্গকে এককালে গ্রাস করিয়াছেন? পিতা কি গৃহে নাই, সপরিবারে তিনি তবে কোথায় যাইলেন? প্রাণপতিক কে কেমন আছেন? মা বাপের আমিই নয়ন-পুত্তলি, আমাকে তাঁহারা ক্ষণকাল না দেখিলে, ধরা শূন্যময় দেখিতেন! আমার সে স্নেহময় জনক জননীর দয়া মায়া ভুলিয়া, গৃহত্যাগে অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, এ মহাপাপের জন্য যথেষ্ট শাস্তিভোগ করিতে হইবে! এই রূপ আক্ষেপ পরিতাপে ফণীন্দ্রের হৃদয় উত্তরোত্তর বিচলিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, এতাবৎকাল পিতামাতা অবশ্য তাঁহার সন্ধান লইয়া থাকিবেন, এক্ষণে নীরস্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমি কেন তাঁহাদের সন্ধান লই নাই? মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া ফণীন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িলেন।

এক দিবস কর্ম্মস্থানে ফণীন্দ্র নাথ অতীত চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, অকস্মাৎ জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেই সাহেবই কার্য্যের পারদর্শীতা কারণ তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসেন; ফণীন্দ্রনাথকে এইরূপ চিন্তিত দেখিয়া সাহেব উৎকণ্ঠিত ভাবে তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শোকাচ্ছন্ন ফণীন্দ্রনাথ এরূপ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন যে, যে প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার এতাদৃশ পদোন্নতি হইয়াছে, তিনি স্বয়ং তাঁহাকে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু ফণীন্দ্রের কোন উত্তর নাই! সাহেব পুনরায় তাঁহাকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন; প্রভুর দ্বিতীয় প্রশ্নে ফণীন্দ্রের সংজ্ঞা হইল। সাহেবকে সম্মুখে দেখিয়া, ফণীন্দ্র আসন হইতে সত্বর উঠিয়া, যথাযথ অভিবাদন করিলেন এবং অবনত বদনে দণ্ডায়মান

রহিলেন। প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাসে ফণীন্দ্র সহসা একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তদবস্থায় সাহেব পুনরায় তাঁহাকে এরূপ দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ফণীন্দ্রনাথ মনোগত ভাব অপ্রকাশ রাখিয়া, অন্য কথার উত্থাপন করিতে চেষ্টিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নয়ন-দ্বয় হইতে অবিরত অশ্রু-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। ফণীন্দ্র দাঁড়াইতে না পারিয়া, ধরাতলে বসিয়া পড়িলেন। উদার-প্রকৃতি সাহেব ফণীন্দ্রের অবস্থা বুঝিয়া, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, কার্য্য সংক্রান্ত অন্য দুই এক কথার উত্থাপন করিয়া অবিলম্বে তিনি আপনার গৃহে যাইলেন। সে দিবস যথাসময়ে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফণীন্দ্রনাথ বাসায় উপস্থিত হইলেন, যাঁহার আনুকূল্যে ও আশ্রয়ে আসিয়া তিনি কার্য্যস্থানে প্রথম নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই হীরালাল সমীপে আর কোন কথা গোপন রাখিলেন না। ফণীন্দ্র এতাবৎকাল মনের দুঃখ মনেই সম্বরণ করিয়াছিলেন, আজ সে গতি রোধ করিতে না পারিয়া, প্রিয় বন্ধুর নিকট মনের আবেগ আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করিলেন।

মনে কোন ভাবের উদ্রেক হইলে, যতক্ষণ না তাহা অপরের নিকটে ব্যক্ত করা যায়, ততক্ষণ হৃদয়-ক্ষেত্রে চিন্তা-তরঙ্গ পুনঃ পুনঃ উদ্বেলিত হইতে থাকে। একের মনোগত ভাব অপরে কিরূপে বুঝিবে? কথাপ্রসঙ্গে একের মনোভাব প্রকাশ পাইলে, অন্যে বুঝিয়া তাহার সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে। দুঃসাধ্য হইলেও একে অন্যের বেদনা লাঘব করনে সাধ্যমত চেষ্টা করে। এতকাল ফণীন্দ্র মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিয়া ছিলেন, বাল্যসহচর হীরালাল সমীপেও সে কথার আদৌ [illegible] করেন নাই, কিন্তু [illegible] পত্রখানি ফিরিয়া আসায়, তিনি মনোবেগ আর সম্বরণ করিতে [illegible]লেন না। [illegible] ডাক হরকরা

তাঁহার হস্তে স্বয়ই পত্রখানি ফেরৎ দিয়া যায়, তৎক্ষণ হইতে তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই মানসিক চাঞ্চল্যে ফণীন্দ্র প্রভুর দৃষ্টি-পথে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও কোন কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত হয় নাই। সকল কথা প্রকাশ না করিলে, ফণীন্দ্রনাথ মনোদুঃখেই কালক্ষেপ করিবেন, সম্ভবতঃ অন্যের সহায়তায় উপকার হইতে পারে ভাবিয়া, তিনি প্রিয়বন্ধু হীরালাল সমীপে নিঃসন্দেহ চিত্তে হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। একের মনোবিকার অন্যের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইল। হীরালাল আপনার অবস্থা প্রিয়বন্ধু সদৃশ ভাবিয়া, তৎ প্রতিকারে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইলেন।

প্রভু গোমেশ সাহেব বিজাতীয় হইলেও, ফণীন্দ্রকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ যত্ন করিতেন, তাঁহারই অনুগ্রহে তিনি কার্য্যস্থানে উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে গোমেশ সাহেব সহৃদয় ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন, অনুগত ব্যক্তির যাহাতে উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, সুখ স্বচ্ছন্দ লাভ হইতে পারে, এইরূপ সকল বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি কর্ম্মচারীর অবস্থা স্বয়ং দেখিয়াছেন, অন্যপক্ষে বন্ধুর সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে হীরালাল আর বিলম্ব করিলেন না। এক্ষণে ফণীন্দ্রনাথের যাহাতে চিত্তপ্রফুল্ল হয়, হীরালাল ও গোমেশ উভয়েই তৎসাধনে সযত্ন হইলেন। অভাগা ফণীন্দ্র যে কার্য্যের অনুসন্ধানে একাকী সংযুক্ত হইয়া ছিলেন, এক্ষণে তাহাতে সেই দুই জনের সহায়তা পাইলেন।

বড়লোক কোন কার্য্যে উদ্যোগী হইলে, তাহা সত্বরই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আফিসের প্রধান সাহেব যখন ফণীন্দ্রনাথের সাহায্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। সবিশেষ নিরাকরণ করিতে আর বিলম্ব হইবে কেন? তিনি চন্দ্রনাথ বসুর দেশত্যাগ সম্বন্ধে সবিশেষ উৎসুক হইয়া, হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেটকে পত্র লিখিলেন; সে পত্রের প্রত্যুত্তর পাইতে গোমেশের পক্ষে

বিলম্ব হইল না। তিনি জানিতে পারিলেন যে, চন্দ্রনাথ পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া, সপরিবারে, কাশী গিয়াছেন। সহৃদয় গোমেশ ফণীন্দ্রনাথকে ডাকাইয়া এই সংবাদ জানাইলেন। প্রভুর কথায় ফণীন্দ্রের মনের উদ্বেগ কথঞ্চিৎ দূর হইল।

পত্র দ্বারা সংবাদ গ্রহণে ফণীন্দ্রনাথ হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবেন, সে অপেক্ষায় বহুদিন গত, এক্ষণে তিনি পিতামাতার চরণ দর্শন কারণ বিলম্ব করিতে পারিলেন না। ভগ্নী ও পত্নীর সন্ধান পাইবেন, একারণ তিনি প্রভুর নিকট সংবাদ পাইবামাত্র আত্মীয় স্বজনের সাক্ষাৎ করিতে উৎসুক হইলেন। মহাত্মা গোমেশ তদ্দণ্ডে দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি ছাড়পত্র লিখিয়া দিলেন এবং চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রযুক্ত পথিমধ্যে যাতয়াতের কষ্ট সম্ভাবনায়, হীরালাল-কেও তাঁহার সহিত প্রেরণ করিলেন। ফণীন্দ্র ও হীরালালের সে যাতা-য়াতের রেলভাড়া কিছুই লাগিল না।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

রায় মহাশয়ের অনুরোধে বক্কেশ্বর পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। মিত্রজের বিষয় সম্পত্তি যৎসামান্যই ছিল; ধর্ম্মপরায়ণ দ্বারকানাথ তৎসমুদয় উচিত মূল্যে বিক্রয় করিয়া, বক্কেশ্বরের নামে দুই হাজার টাকার দুইখানি কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিয়াছিলেন। রাধামতির গৃহত্যাগ দিবসাবধি রায় মহাশয়ের যত্নেই মিত্রজ প্রতিপালিত হইতে ছিলেন; এখনও দ্বারকানাথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ-পর্য্যটনে যাইতেছেন। [illegible] বহন করিবেন, সর্ব্বসমেত তাঁহারা পাঁচ জনে বাটী হইতে [illegible], গোপাল, বক্কেশ্বর ও হেমেন্দ্র [illegible] দ্বারকানাথ [illegible] হইয়াছেন, তাঁহারা বৈদ্যনাথ,

গয়া, আলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ স্থানে পাঁচ সাত দিন বাস করিয়া, প্রত্যেক তীর্থের ঠাকুর দেবতাদি দেখিয়া, মনের আনন্দে কালাক্ষেপ করিতেছেন। এতাবৎকাল সংসার-বন্ধনে অতিবাহিত হইয়াছে, কিরূপে পরিবারবর্গের অভাব মোচন হইবে, সংসারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, এই সকল ভাবনা চিন্তাতেই দ্বারকানাথ ও বক্রেশ্বরের সময় যাপিত হইয়াছে। এক্ষণে উভয়েই বার্দ্ধক্যে উপস্থিত; অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে! পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের বিচার পরজন্মে, যে যেমন কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, সে সেই মত ফলভোগ করিয়াছে, এক্ষণে এই সকল ভাবনা চিন্তায় উভয়েই অগতির গতি ভগবান চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন। সংসারে প্রবেশ করিয়া যে, অসার আমোদ প্রমোদে পুনরায় সুখ সম্ভোগ করিবেন, সে আসক্তি তাঁহাদিগের হৃদয়-দর্পণে এক্ষণে আর প্রতিবিম্বিত হয় না!

সাক্ষাৎ পাপের প্রতিমূর্ত্তি হেমেন্দ্র অসৎ কার্য্যে অনুরক্ত থাকিয়া, চিরকালই কালক্ষেপ করিয়াছে; যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পরলোকে তাহার ঊর্দ্ধ বা অধোগতি—সে ভোগ করিবে। রাধামতির সঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়া, যে দিন রায় মহাশয় হেমেন্দ্রকে গৃহে লইয়া আসেন, সেই দিন হইতেই হেমেন্দ্রের যেন কথঞ্চিৎ চৈতন্যসঞ্চার হইয়াছে। হতভাগা মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, ইহ জীবনে আর কদাচ গর্হিত কার্য্যে অনুরক্ত হইবে না। বিদেশে পিতার কষ্ট হইবে ভাবিয়া, সাধ্যমত পিতার সেবা শুশ্রূষায় তাঁহার সান্ত্বনা হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে সে পিতার অনুগামী হইয়াছে। ধর্ম্মের প্রতি গুরু জনের একান্ত অনুরাগ ও আগ্রহ দর্শনে, অধিকন্তু সৎসঙ্গের মাধুর্য্যে [illegible] ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রীতি জন্মিয়াছে।

রায় মহাশয় স্থানে স্থানে [illegible]

স্বভাবেরও তৎসহ উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। অভাগা বাল্যাবধি লেখা পড়ায় আদৌ মনযোগ দেয় নাই. এক্ষণে ধর্ম্মানুশীলনে মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠে, তাহার যথেষ্ট মনস্তাপ জন্মিল। জ্ঞানথর্ব্বতা প্রযুক্ত শাস্ত্রালোচনায় অশক্ত হওয়ায়, অবকাশ মতে হেমেন্দ্র পণ্ডিতসভায় উপস্থিত হইয়া, আগ্রহ সহ গীতা ভারতাদির পাঠ শ্রবণে উৎসুক হইল। ধর্ম্মান্দোলনে অবিরত মনোনিবেশ করায়. দিনে দিনে তাহার ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পাতকী হেমেন্দ্র সময়ে নবজীবন লাভ করিল, অসার সংসারের অসার আমোদ প্রমোদের প্রলোভনে আর বিচলিত হইল না।

রায় মহাশয় নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, অবশেষে, কাশীধামে উপনীত হইলেন। বিদেশে অর্থসাচ্ছল্যে, কোন কষ্ট হয় না. সঙ্গতিসম্পন্ন রায় মহাশয় তীর্থস্থানের ক্রিয়া-কলাপ, পিতৃ-লোকের শ্রাদ্ধ, দানধ্যানাদি যথাযথ ভাবে সুসম্পন্ন করিলেন; বরেশ্বরকে তিনি সহোদর সদৃশ ভাল বাসিতেন, এ কারণ নিজ ব্যয়ে তাঁহারও ক্রিয়াদি যথাযথ সম্পন্ন করাইলেন। অধিকন্তু কোম্পানির কাগজ ব্যতীত বরেশ্বরের হস্তে যে নগদ দেড় শত টাকা ছিল; সেই টাকার অধিকাংশই দেবসেবা ও অন্যান্য ক্রিয়া কলাপে মিত্রজ স্বয়ং ব্যয় করিতেছিলেন।

সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

[illegible] কোন কথা না জানাইয়া, গৃহ ত্যাগী [illegible] সংসারের প্রতি অনুরাগ [illegible] করিয়াছিল

সংসার কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী; অকস্মাৎ কোন কথা কাহাকেও না বলিয়া, তিনি প্রবাসী হইলেন! বিশেষতঃ সেই বৎসর তাঁহার বি, এ পরীক্ষা দিবার কথা। যেরূপ মনঃসংযোগসহ এতাবৎকাল ফণীন্দ্র বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছিলেন, বিবাহের পর হইতে আর তাঁহাকে সেরূপ উদ্যোগী দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পুত্রের এরূপ বিকৃত অবস্থার প্রতি চন্দ্রনাথের পূর্ব্বেই দৃষ্টিপাত হইয়াছিল; কিন্তু উপযুক্ত সন্তান বাল্যকালাবধি পিতার অনুমতি না লইয়া কখন কোন কার্য্য করে নাই। লোকের সহিত বাদ বিসম্বাদে যাহার বিষদৃষ্টি, সে গুণধর পুত্র ফণীন্দ্র যে তাঁহাকে কোন কথা না জানাইয়া, এককালে গৃহত্যাগী হইবে—এ ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব! একারণ চন্দ্রনাথ পুত্রের অন্যায় ব্যবহারে প্রথমতঃ তাদৃশ বিচলিত হন নাই।

ফণীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশে বসুজ ভাবিলেন—ফণীন্দ্র কলিকাতায় বিদ্যোপার্জ্জনে গিয়াছে, কিন্তু লোক পাঠাইয়া সংবাদ পাইলেন যে, পুত্র কলিকাতায় যায় নাই। তিনি স্থানে স্থানে সন্ধান লইতে লাগিলেন, দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহ পরে মাস, মাসের পর বৎসর কাটিল, চন্দ্রনাথ ফণীন্দ্রনাথের অনুসন্ধানে নিশ্চেষ্ট হইলেন না। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, এখানে ওখানে লোক প্রেরণ দূরস্থ বন্ধু বান্ধবকে সংবাদ প্রদান ইত্যাদি প্রকারে পুত্রের সন্ধান লইতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছিল; কিন্তু এরূপ ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়াও তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। পুত্রের নিরুদ্দেশে তাঁহার মনে সুখ ছিল না, ক্ষুণ্ণভাবে চন্দ্রনাথের দিন যাপিত হইতেছিল। কাজ কর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ ছিল না; বিষয় সম্পত্তি পৈত্রিক আমলের জনৈক কর্ম্মচারীই দেখিয়া শুনিয়া থাকে। স্থাবর সম্পত্তির নির্দ্দিষ্ট আয়েই তাঁহার সংসার চলিতেছিল।

মনোকষ্টে দিন কাটিতেছে, এমন সময়ে [illegible] কথা কর্ণগোচর করিয়াছিলেন; এবং কোলাহল হইল, [illegible] এক

খানা পত্রও লিখিয়াছিলেন, আপনার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ও জানাইয়াছিলেন। একে ফণীন্দ্রবিরহে তাঁহার চিত্তস্থিরত্ব হ্রাস; তাহতে রাধামতি গৃহত্যাগিনী—কুল-লক্ষ্মী কুলটা, এ কথা শুনিয়া তিনি যে বিহ্বল হইয়া পড়িবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? সংসারে আর এক দণ্ড থাকিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। কর্ম্মচারীর হস্তে বিষয় সম্পত্তি নির্ভর করিয়া, দুহিতা ও গৃহিণীসহ চন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বেই কাশীবাসে যাত্রা করিয়াছেন।

সংসারে উপস্থিত তারামণি ভিন্ন চন্দ্রনাথ ও মাতঙ্গিনীর অবলম্বন আর কেহ ছিলনা! পত্নীসহ চন্দ্রনাথ যখন কাশীধামে যাত্রা করিলেন, অবশ্য কন্যা তাঁহাদের সঙ্গে যাইল; পিতামাতা ভিন্ন তারামণিরই বা সংসারে আর কে আছে? চন্দ্রনাথ পৈত্রিক ভদ্রাসন ও বিষয় সম্পত্তি এককালে হস্তান্তরিত করেন নাই, তীর্থ বাস সঙ্কল্প করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন, স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও, সংসারের প্রতি তাকাইয়া কলত্র পুত্রীর মুখ চাহিয়া, তিনি তৎসমুদয় বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন নাই; স্থাবর বস্তু সম্বন্ধে তাঁহাকে অন্য কোন বন্দোবস্ত করিতে হয় নাই।

অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

জামালপুর হইতে [illegible] প্রাতেঃ ফণীন্দ্রনাথ [illegible] কার [illegible] ছিলেন, সেই স্থানে [illegible]

পুত্রগতপ্রাণ চন্দ্রনাথ হারানিধি ফণীন্দ্রকে দেখিয়া, আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে দরদর ধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সংসারের আশা ভরসা, মায়া মমতা সমুদয় ত্যাগ করিয়া, বয়স্ক জীবনের অবশিষ্ট কাল ধর্ম্মানুষ্ঠানে কাটাইবেন, মনস্থ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন; বারাণসী ধামে বাস করিতেছেন। যে পুত্রের অদর্শনে চন্দ্রনাথের সংসার ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে, তিনি সংসারী হইয়া অসংসারী হইয়াছেন, বহুকাল পরে অকস্মাৎ সেই প্রাণাধিক পুত্ররত্ন পাইয়া, বিস্ময়ে তাঁহার মুখ হইতে প্রথমে কোন কথাই নিঃসৃত হইল না, তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অনিমেষ নয়নে সন্তানের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

ফণীন্দ্রনাথ লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহার শিষ্টতা ও সদাচারে সকলেই মোহিত, সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ ও প্রশংসা করিত। তিনি বিদ্যা বুদ্ধিতে ও সৌজন্যতায় প্রভুর যথেষ্ট অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। মনের উদ্বেগে বৃদ্ধ পিতামাতার দয়া মায়া ভুলিয়া, সংসারধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া, প্রবাসী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্যের সূত্রপাতেই পিতামাতাকে দুঃখিত করিয়াছেন, পৈত্রিক ভিটা জন্মভূমি ত্যাগে প্রবাসী সাজিয়াছেন। কতদিনে জনক জননীর সংবাদ পাইবেন, তাঁহারা জীবিত কি মৃত—এ তত্ত্বও রাখেন নাই, ভদ্রতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, সেই অভাগীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, এখন তাঁহার সেই সহধর্ম্মিণী কোথায়? এতাবৎকাল কোন সংবাদই তিনি রাখেন নাই—পিতৃদর্শনে একে একে সকল কথা তাঁহার স্মৃতিপথে জাগ্রত হইল, কিন্তু পিতার সম্মুখীন হইয়া চরণস্পর্শে তাঁহার কোন সংবাদ [illegible] [illegible], এই আশঙ্কা [illegible] [illegible]

[illegible]

থাকিতে পারিলেন না। পিতৃদেবের চরণবন্দনে ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া কৃতাপরাধ জন্য ফণীন্দ্র নাথ পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পুত্রহারা চন্দ্রনাথ ফণীন্দ্রকে হৃদয়ে চাপিয়া অনিমেষ নেত্রে তাহার মুখেরপ্রতি চাহিয়া থাকিলেন! সকল কথাই একে একে তাঁহার স্মরণ-পথে আসিল, বৃদ্ধ ঘন ঘন পুত্রের মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি ফণীন্দ্রনাথের আগমন বার্ত্তায় মাতঙ্গিনী এতই অধীরা হইয়াছিলেন যে, অন্তঃপুর হইতে কন্যাসহ চন্দ্রনাথের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফণীন্দ্র গর্ভধারিণীকে দেখিয়া ভক্তি সহ প্রণাম করিলেন। হীরালাল অন্তঃপুরবাসিনীদ্বয়কে বহির্বাটিতে এ ভাবে উপস্থিত দেখিয়া, অন্তরালে যাইয়া ফণীন্দ্রের অপেক্ষায় রহিলেন। পিতা, মাতা ও ভগ্নীর কুশল সংবাদ লইয়া, ফণীন্দ্র তাঁহাদের সহিত মিষ্টালাপ ও সাদর সম্ভাষণ করিয়া, বন্ধুর বিশ্রামার্থ বৈঠকখানা গৃহে যাইলেন। চন্দ্রনাথ ও মাতঙ্গিনী বহুদিনের পর ফণীন্দ্রনাথকে পাইয়া, আনন্দোৎসবে উন্মত্ত হইলেন, কিন্তু, সংসারে সুখ ক্ষণস্থায়ী!

ফণীন্দ্র পরিজন সহ আনন্দে মিলিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন, কোন বাধা বিঘ্ন নাই, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে রাধামূর্ত্তির চিত্র অঙ্কিত হইল। সুখের সময়ে সকল কথাই মনে উঠে! তিনি পিতা মাতা ও ভগ্নীকে দেখিয়াছেন, কিন্তু যে অঙ্কশোভিনীর অনুরাগে বিদ্যোপার্জ্জনে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, পরমারাধ্য জনক জননীকে ভুলিয়াছিলেন, উন্নতির পথ রোধ করিয়াছিলেন, প্রশংসা হইয়াছিলেন, [illegible] অবলম্বন করিয়া সাধের সংসার [illegible] [illegible] [illegible]

বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু বধূমাতা যে গৃহত্যাগে বিপথগামিনী হইয়াছেন, সে কথা পুত্রকে কোন মুখে প্রকাশ করিবেন? পুত্রের কাতর ভাবে কথায় কথায় চন্দ্রনাথ ফণীন্দ্রকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের প্রস্তাব করিলেন। পিতৃবাক্যে ফণীন্দ্রনাথের আশা ভরসা সকলই ফুরাইল! অকস্মাৎ পিতা তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিলেন কেন? তবে, তাঁহার জীবনসঙ্গিনী রাধামতি কোথায়! সংসারধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া যে ফণীন্দ্র পত্নীর অনুরাগাকাঙ্ক্ষী, সে স্ত্রৈণ পুরুষের পক্ষে অন্য রমণীর পাণিগ্রহণ—এ কথা তাঁহার হৃদয়ে বজ্রাঘাত সদৃশ বোধ হইলে। ফণীন্দ্রনাথ একদৃষ্টে পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিলেন, পার্থিব উপাস্য দেব—জন্মদাতা পিতা চন্দ্রনাথ ফণীন্দ্রকে বিবাহের কথা বলায়, তিনি এক কালে মর্ম্মাহত হইয়াছেন, কিন্তু পিতাকে কোন উত্তর প্রদানে উপযুক্ত পুত্রের অধিকার কোথায়? পিতার কথায় প্রতিবাদ করিলে, গুরুজনের যে অপমান করা হয়, এইরূপ ঘোর সমস্যায় পড়িয়া ফণীন্দ্র ইতোপূর্ব্বে সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন, এক্ষণে অনন্যোপায় হইয়া, তিনি মাতৃসমীপে যাইলেন। সে দিবস রাধামতি সম্বন্ধে কোন কথার উত্থাপন হইল না।

ফণীন্দ্রনাথের বন্ধু আহারাদি করিয়া, তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন। সহধর্ম্মিণীর সংবাদ না পাইয়া ফণীন্দ্র একে উদ্বিগ্ন, তাহাতে পিতার কথায় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ—প্রিয়বন্ধু হীরালালের বিদায় প্রার্থনায় তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। হীরালাল সন্ধ্যার ট্রেণে জামালপুর যাত্রা করিলেন, ফণীন্দ্র বন্ধুর সহিত ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইয়া, তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ফণীন্দ্রনাথ গৃহে আসিয়া সকলকে দেখিলেন, কেবল বিরহবিলাসিনী প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ পাইলেন না। রাধামতি কোথায়? স্ত্রী পিত্রালয়ে

কি অবস্থিতি করিতেছে? যৌবন সীমা অতিক্রম করিয়া রাধামতি প্রৌঢ়া, সে এ বয়সে পিতার নিকটে কেন? শাশুড়ীর মৃত্যু তো পূর্ব্বেই হইয়াছে, শশুর এখন জীবিত না মৃত! তিনি দুহিতাকে অবলম্বন করিয়া কি এখনও সংসারী? যদি রাধামতির পিতৃগৃহে বাস—তবে, পিতা তাহাকে আনিবার কথা না তুলিয়া, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের কথা তুলিলেন কেন? রাধামতি কি ইহসংসারে নাই! ইহ জীবনে ধিক্কার দিয়া রাধামতি কি জন্মেরমত বিদায় গ্রহণ করিয়াছে? পিতা কোন কথা কহিলেন না, মাতার মুখেও স্ত্রীর কোন পরিচয় পাইলাম না! বাবা ও মা যেন বধূর কথা কহিলেন না, কিন্তু সহোদরা কি কারণ নিরুত্তরা? ভগ্নী প্রমুখাৎ অবশ্য সকল কথা প্রকাশ পাইত, কিন্তু বধূর কথা তারামণি তো কিছু জানাইল না! সংসারসঙ্গিনী রাধামতি তবে কোথায়? কি বিষম সমস্যায় পড়িলাম! সংসার ত্যাগে মনের সুখ ছিল, সংসারে আসিয়া একি ঘোর দুর্ব্বিপাক ঘটিল! যাহার দর্শনে সুখসাগরে নিমগ্ন হই, যে রমার শুভ চিন্তায় অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়াও বিরক্ত হয় না, আমার সেই প্রণয়িনী রাধামতি সময়ে অনুরাগিণী হইবে—এই আশা এখনও হৃদয়ে জাগ্রত! যাহাকে আমি জীবনাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জানি, যাহার সহিত আমার জীবনমরণে সম্বন্ধ, সেই জীবন-সঙ্গিনী রাধামতি তবে কোথায়? কে তাহার সবিশেষ সংবাদ দিয়া এ ব্যথিত হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিবে? এই দারুণ চিন্তায় ফণীন্দ্রনাথ সমস্ত রাত্রি জাগ্রত!

বহুকালের পর ফণীন্দ্র বাটীতে আসিয়াছেন, স্বজন সম্মিলনে আনন্দে দিন যাপন [illegible] কাৰ্ত্তিক পড়িয়াছে। তারামণি, [illegible] ফণীন্দ্রের [illegible] সংবাদ তাঁহারা ফণীন্দ্রনাথের [illegible] করিলেন। ফণীন্দ্র

রজনী জীবের শান্তি-দায়িনী, শ্রমী সারাদিন পরিশ্রম করিয়া নিশার অবসরে বিরাম লাভ করে। এই সময়ে লোকের পার্থিব সকল ভাবনা চিন্তা, কিছুই থাকে না। দিবাভাগে বৈষয়িক কার্য্যে যতদূর জড়িত থাকিতে হয়, রাত্রিকালে সে কার্য্যে অবকাশ পাইয়া, স্বচ্ছন্দে নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে স্থান পাইয়া শান্তিলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু চিন্তানলে যাহার হৃদয় অবিরত দগ্ধ বিদগ্ধ, এরূপ বিরামেও তাহার অবসর হয় না! নিদ্রাদেবীর প্রবল প্রতাপে নয়নদ্বয় যতক্ষণ না নিমীলিত হয়, ততক্ষণ সে ব্যক্তি সেই চিন্তায় আকুল!

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহজগতেই হইয়া থাকে। কোন গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে আপাততঃ মুক্তি পাইলেও এককালে পরিত্রাণ সম্ভবে না! পরিণামে তজ্জনিত কষ্ট অবশ্য ভোগ করিতে হয়। অভাগিনী রাধামতি সুখ সম্ভোগ বাসনায় পরজন্মের কথা ভুলিয়া ছিল, সেই ভ্রমে তাহার অধোগতি হইয়াছে; দুঃখিনী—সতীর সর্ব্বস্ব রক্ষা করিলেও, সমাজের চক্ষে সে দূষিতা, তাহার প্রতি কাহারও আস্থা নাই! দুশ্চরিত্রের কুহকে মজিয়া, জাতিধর্ম্মে বঞ্চিতা হইয়া, সতী—অসতী, পথের ভিখারিণী। বয়োবৃদ্ধিতে তাহার চিত্তচাপল্য বিদূরিত হইয়াছে; পরিণামের শুভচিন্তায় জীবনের শেষ কয়েক দিন সৎপথে যাপন করিতে তাহার বাসনা—কিন্তু জনসমাজে রাধামতি [illegible], সে অসতীকে কে আশ্রয় দিবে? রাধামতি গৃহত্যাগিনী হইয়া, সমাজের সকল সংস্রব ঘুচাইয়াছে! ফণীন্দ্র রাধামতিকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন, শ্বশুর শাশুড়ী, পিতামাতা সকলেরই একটি [illegible] সামগ্রী ছিল; কিন্তু অবিমৃষ্য-কারিতায় [illegible] ঘটিয়াছে! [illegible] জন্মের মত

শোকতাপেই কাটাইতে হইবে। আপনার অবস্থা ভাবিয়া অবলা এক্ষণে হতাশ্বাস ভাবাপন্না! দ্বারকানাথ হেমেন্দ্রকে লইয়া যাওয়ার দিন হইতে যদি রাধামতির চৈতন্য হইত, তাহা হইলে তাহাকে এরূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না! কিন্তু, বিধাতা তাহাকে হাস্যাস্পদ ও লাঞ্ছনা ভোগের জন্যই সৃজন করিয়াছেন; দেবতার খেলার পুত্তলি রাধামতি এ খেলা না খেলিলে, লীলাময়ের লীলা যে পূর্ণ হয় না!!.. কোন উপায়ে দেহ অবসানেই রাধামতি শান্তি জানিয়াছে!

সংসার-ছলনায় ভুলিয়া লোকের যে দুর্গতি হয়—এতদিনে সে বিশ্বাস অনাথার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। লোকে দুঃখের প্রতীকার করিবে, অসময়ে সহায় হইবে, সে অসার আশায় তাহার বিশ্বাস বা অধিকার নাই! তীর্থপর্য্যটন মানসে রাধামতি বৈদ্যনাথ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণাদি করিয়া সর্ব্বশেষে কাশীধামে পৌঁছিল। যে রমণী সহ রাধামতি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছিল, মিত্রজ-কন্যা টাকা কড়ি তাহারই নিকট রাখিয়া ছিল; কাশীধামে উপস্থিত হইবামাত্র সেই স্ত্রীলোকটী রাধামতির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যে কোথায় যাইল, তাহার আর কোন সন্ধান হইল না। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে বারাণসীর পথে ঘাটে বেড়াইয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া, অভাগিনী রাধামতি এক্ষণে দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিল। ভিক্ষালব্ধ অন্নে দিনাতিপাত হয় না বুঝিয়া, রাধামতি লোকের বাটীতে গঙ্গাজল যোগাইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যাকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে, রাধামতি জল লইতে আসিয়াছে, এমন সময়ে সে ফণীন্দ্রনাথের নয়নপথে পতিত হইল। ফণীন্দ্র প্রতিদিন প্রভাত ও সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, অধিকন্তু এইস্থানে এই এই সময়ে স্ত্রীসজ্জনের সমাগম হইয়া থাকে। সহসা ফণীন্দ্র রাধামতিকে দেখিতে পাইলেন। ফণীন্দ্র বিদেশে বহুদিন যাপন করিয়াছেন, এতাবৎকাল স্ত্রীর

সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, রাধামতিরও দৃষ্টি ফণীন্দ্রনাথের প্রতি পড়িল! উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের প্রতি, কোথায় যেন পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, এইরূপ মনে মনে দুই জনেই সন্দিগ্ধ হইয়া, কিয়ৎক্ষণ উভয়ে উভয়ের প্রতি চাহিয়া থাকিল; পরক্ষণে যে যাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। সে দিবস উভয়ের কোন কথাবার্ত্তা হইল না। রাধামতি কলস ভরিয়া জল লইয়া চলিয়া গেল, ফণীন্দ্র অনিমেষ লোচনে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিলেন; যতদূর দৃষ্টি—রাধামতিকে তিনি নয়নের অন্তরাল করিলেন না। এ রমণী কে? সত্য সত্যই কি রাধামতি—না অন্য কেহ? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া ফণীন্দ্র রাধামতির অনুগামী হইলেন, কিন্তু অবিলম্বে ফিরিয়া আসিলেন। রাধামতির পশ্চাৎগামী হইতে ফণীন্দ্রনাথের সাহস কুলাইল না। ফণীন্দ্রনাথের চরিত্র নির্ম্মল ও সাধু, অকস্মাৎ পথিমধ্যে রমণীর অনুগমনে লোকের দৃষ্টিগোচর হইলে, অবশ্য তাঁহার লজ্জার কথা।

ফণীন্দ্র বাটীতে যাইয়া সে দিন যথানিয়মে আহারাদি করিলেন, সুখ স্বচ্ছন্দে রাত্রিও প্রভাত হইল, কিন্তু রাধামতির চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী থাকায়, তাঁহার সুনিদ্রা হইল না, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া প্রভাতেই সেই দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌছিলেন। সেই স্থানে সেই রমণীর সাক্ষাৎ কামনায় তিনি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সুদূরে রাধামতিকে দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্রেই ফণীন্দ্রের অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। এই দুঃখে রাধামতি অধোমুখী হইল, তাহাকে অবনতবদনা দেখিয়া ফণীন্দ্রের চিত্ত অধিকতর আকুলিত, তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া, পরক্ষণে রাধামতির পার্শ্বদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লোকলজ্জা, সমাজভয় কোন দিকেই তাঁহার লক্ষ্য রহিল না! যে রমণীর পূর্ণমূর্ত্তি তাঁহার মনে চির বিরাজিত, তাহার সম্বন্ধে তত্ত্ব জানিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা! এ কি রাধামতি—না অন্য

কেহ, মনে মনে তাঁহার সন্দেহ; কিন্তু পরস্পর নয়নে নয়নে মিলনে, পরক্ষণে সে সন্দেহ তাঁহার বিদূরিত হইল। ফণীন্দ্র আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, দারুণ উদ্বেগে বলিলেন, 'রাধামতি' এ স্থানে যে তোমার সহিত দেখা হইবে, সে আশা ছিল না। প্রিয়তমে! তোমারই জন্য লেখা পড়া ছাড়িয়া অহোরাত্র তোমারই মঙ্গলচিন্তা করিয়াছি। মা'র সহিত তোমার সদ্ভাব হয় না দেখিয়া, আমি তোমারই মনস্তুষ্টির কারণ—তোমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া ছিলাম। পার্থিব দেবদেবী পিতামাতাকে, স্নেহের সহোদরা তারাকে পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশে দীন ভাবে দিনাতিপাত করিয়াছি আজি বিধাতা আমার প্রতি সুপ্রসন্ন, তাই তোমার দেখা পাইলাম।"

পরক্ষণে স্বামীর কাতরোক্তি শ্রবণে রাধামতি কাঁদিল, কাতরে জানাইল, "নাথ! দাসীকে স্পর্শ করিবেন না, আমি নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, নির্ম্মলকুলে কলঙ্ক দিয়াছি, আমার মত অভাগিনী এ সংসারে কেহ নাই।" অধিক কথা বলিতে রাধামতি আর অবসর পাইল না, রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। প্রস্তর খণ্ডে অনাথার মস্তক নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, তদ্দণ্ডে বিদার্ণ হইয়া গেল। সে দারুণ আঘাতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত বহির্গত হওয়ায়, রাধামতি স্বামী-সকাশে প্রাণত্যাগ করিল। ফণীন্দ্রনাথ সহধর্ম্মিণীর অসচ্চরিত্রের কথা শ্রবণ করিয়াও তাহার প্রতি অনুরাগী ছিলেন, পূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিয়া ছিলেন যে, ইহ জীবনে তিনি বিবাহ করিবেন না; এক্ষণে স্ত্রীর শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শনে তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা অধিকতর দৃঢ় হইল! লোকজন ডাকাইয়া ফণীন্দ্রনাথ অবিলম্বে রাধামতির সংকার করাইলেন। ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথ পুত্রানুষ্ঠিত কার্য্যের সংবাদ পাইয়া, অবিলম্বে সে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ফণীন্দ্রের মুখাকৃতি দর্শনে তাঁহাকে বিষণ্ণ হইতে হইল।

এতদিনে ফণীন্দ্রনাথের সংসার-পথের কণ্টক দূর হইল! স্ত্রী-বিয়োগ

শোকে তিনি এরূপ অধীর হইয়া পড়িলেন যে, পিতা মাতার প্রবোধ বাক্যেও সান্ত্বনা পাইলেন না, অথচ বাহ্যিক শোকভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া, স্ত্রী-বিয়োগ শোক স্তরে স্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। বাল্যকালাবধি তিনি পিতামাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন, স্ত্রীকে ভালবাসিয়া, তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে ফণীন্দ্র বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। যাহার জন্য এত কষ্ট, সে আজ চিরদিনের মত তাঁহার হৃদয় শূন্য করিয়া চলিয়া গেল। সহধর্ম্মিণী কুলটা, আজি হিন্দু-সমাজে সে স্ত্রীর কথা মুখে আনিলে পাপ হয়! ফণীন্দ্র সুবিজ্ঞ বিচক্ষণ হইয়াও, স্ত্রীর রূপ লাবণ্যে এরূপ মুগ্ধ ছিলেন, সেই অসতীর শোকে অভিভূত হইলেন। তিনি মুখে কোন শোক ভাব ব্যক্ত না করিলেও, পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে স্তম্ভিতভাব গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ জনকজননী স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া ফণীন্দ্রনাথকে প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু উপস্থিতে চন্দ্রনাথ ও মাতঙ্গিনীর সে স্নেহ, সে উদ্যম, সে যত্ন—সকলই বৃথা হইল।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

ফণীন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর কর্ম্মসূত্রে যে অর্থ-সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহার, পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। শারীরিক দৌর্ব্বল্য উল্লেখ করিয়া, অবসর গ্রহণ অভিপ্রায়ে তিনি, কর্ম্মস্থলের প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ গোমেজের নিকট এক খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। গোমেজ সাহেব তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, অকস্মাৎ কর্ম্মত্যাগ করিয়া ফণীন্দ্র অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকিবেন, উত্তরোত্তর তাঁহার মনোবিকার বর্দ্ধিত হইতে পারে, এই ভাবিয়া তিনি

সেই আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিলেন এবং কার্য্য স্থানে সত্বর ফিরিয়া আসি-বার জন্য ফণীন্দ্রনাথকে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন।

ফণীন্দ্র কাজ কর্ম্মে আর নিযুক্ত হইবেন না, এইরূপ স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; জীবনের অন্তিম অবস্থায় মনের সুখে দিনপাত করিবেন—মন্তব্য জানাইয়া, সাহেবের পত্রের প্রত্যুত্তরে আর একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। উদারচেতা গোমেশ সাহেব কোন ক্রমেই ফণীন্দ্রকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিলেন না, অগত্যা তাঁহার আবেদন-পত্র গ্রাহ্য হইল। গোমেশ সাহেব ফণীন্দ্রনাথের কর্ম্মস্থানে ও অন্যান্য লোকের নিকট যে টাকা কড়ি পাওনা ছিল, তৎসমুদায় সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ফণীন্দ্র অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক হইলেও, পিতার সহিত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত হইলেন।

বহুপূর্ব্বে ফণীন্দ্র তদীয় শ্বশুর বঙ্কেশ্বর সমীপে ডাকযোগে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কেশ্বর দ্বারকানাথ সহ তীর্থ-পর্য্যটনে আসিয়া-ছেন, একারণ পত্রখানি তাঁহার হস্তগত হয় নাই; যথাসময়ে সেখানি ফণীন্দ্রনাথের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিল। শ্বশুর কি এখন বাটীতে নাই! তিনি কি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন! অথবা দুহিতা বিপথগামিনী সংবাদে, তিনি লজ্জায় পত্র গ্রহণ বা কোন উত্তর প্রদান করেন নাই! এই সকল বিশৃঙ্খল চিন্তায়, কিন্তু ফণীন্দ্রনাথ আর বিচলিত হইলেন না।

শোকতাপে কিছুদিন গত হইলে, এক দিন চন্দ্রনাথ পুত্রকে সংসার ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আকিঞ্চন করিলেন। চন্দ্রনাথের এরূপ প্রস্তাবে পুত্র অনেক বার যুক্তি দেখাইয়া খণ্ডন করিয়াছিল, কিন্তু পিতামাতার পুনঃ পুনঃ এরূপ অনু-রোধে, তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, শোকাবেগে ফণীন্দ্র কয়েক দিন অস্থির ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে। কুলকলঙ্কিনী রাধামতির প্রণয়াসক্ত হইয়া, তিনি পিতৃমাতৃ ভক্তি ভুলিয়া, একবার সুদীর্ঘ কালক্ষেপ, করিয়া

ছিলেন,সে ত্যাগে প্রবাসী হইয়া হৃদয়ে দারুণ কষ্ট পাইয়াছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যু-জনিত শোকে অভিভূত থাকিলে,সংসার ধর্ম্ম সকলই যায়—এরূপ ব্যবহার তাঁহারও পক্ষে শোভা পায় না! অনেক যুক্তিতে ফণীন্দ্র স্ত্রীবিয়োগ চিন্তা ত্যাগ করিলেন, পিতা মাতার সন্তোষ সাধনে স্থির সঙ্কল্প করিলেন। পুত্রের ঈদৃশ আচরণে চন্দ্রনাথ ও মাতঙ্গিনীর আনন্দ হইল, রূপলাবণ্যা লজ্জাশীলা ভদ্র-কন্যার সহিত অনতিবিলম্বে চন্দ্রনাথ ফণীন্দ্রের বিবাহ দিলেন। বিষয়সম্পত্তির অভাব ছিল না, পিতা মাতাকে সুখী করিবার জন্যই ফণীন্দ্র কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় মত বিবাহের পরে কাশীধামে ফণীন্দ্রনাথ বাসোপযোগী একখানা সুচারু বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন।

বক্রেশ্বর ও দ্বারকনাথ ইতোপূর্ব্বে বারাণসী ধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কালক্রমে ফণীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহাদিগের দেখা সাক্ষাৎও হইয়াছিল। বসুজ-পুত্র শ্বশুর মহাশয়কে বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আকিঞ্চন করিয়াছিলেন; কিন্তু মিত্রজ জামাতার কথায় কোনমতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি কোন মুখে আর বৈবাহিকের বাটীতে যাইতে পারেন

একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

লম্পট হেমেন্দ্র এক্ষণে পূর্ণ যোগী! সংসার ধর্ম্মে তাহার অনুরাগ নাই! কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে তাহার ধর্ম্মানুরাগ সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষাদি কর্ত্তব্যপালনেও তাহার মনস্তৃপ্ত হইল না; পরিণামের মঙ্গল চিন্তায় সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হেমেন্দ্র হিমাচলাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে জনৈক তপস্বীর সহিত হেমেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়; ভবিষ্য-শুভ চিন্তায় সেই মহাত্মা সমীপে হেমেন্দ্র স্বীয় জীবনী আদ্যোপান্ত বর্ণন করে; সন্ন্যাসী পতিতের আখ্যায়িকা শ্রবণে তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করেন যে দর্শনে-

ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে হেমেন্দ্র অসৎ পথ অবলম্বন করিয়াছিল, অকস্মাৎ সেই মহাত্মার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার সেই দৃষ্টি রোধ হয়। অল্পাবস্থায় হেমেন্দ্র কর্ত্তব্য পালনে লঙ্ঘন করিল না, উত্তরোত্তর ধর্ম্মানুশীলনে তাহার পরকালের মঙ্গলসাধনা করিতে লাগিল। কিন্তু হেমেন্দ্র ও রাধামতির অধঃপতনের মূল-মন্ত্রণাদায়িনী পাপিষ্ঠা কামিনী ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। দুশ্চারিণী ঈশ্বরের নিয়মাধীনে গলিত কুষ্ঠ ও দুঃসাধ্য বিকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, জীবনের শেষ দিনে দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

ললিতচন্দ্র চৌর্য্যাপরাধে রাজপ্রহরী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ইতোপূর্ব্বে কারা-বদ্ধ হইয়াছিল। সংসারে সুনাম একবার ঘুচিয়া যাইলে, বহু যত্নেও সে অখ্যাতি মুক্ত হয় না; অভাগা ললিত অসদনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ বন্দী ভাবেই জীবন যাপন করিয়া, কারাবাসেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

দ্বারকনাথ ও রত্নেশ্বর আর বাটী ফিরিলেন না। কাশীধামে কিয়ৎকাল বাস করিয়া, উভয়েই নিয়তিবশে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। মঙ্গলাকে বৈধব্যযন্ত্রণা অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই, হেমেন্দ্র সংসারত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, এ সংবাদ পাইয়াই তিনি শোকাকুলা হইয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ত্তার মৃত্যুর অনতিবিলম্বেই রায়-পত্নীর মৃত্যু হয়, পুণ্যবতী পুত্রবিরহ শোকে অনায়াসে চিরমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

নিয়তির নিয়মানুসারে ফণীন্দ্রের পিতা মাতা কাশীপ্রাপ্ত হইলেন। ফণীন্দ্র স্বগ্রামে বাস নব-পরিণীত সাধের সংসার পাতিয়াছিলেন, পিতা মাতার অভাবে, ফণীন্দ্রের পুত্র কন্যার মুখদর্শনে জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখ স্বচ্ছন্দে যাপিত হইল। প্রথমে রাধামতির প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা সঞ্চার হইয়াছিল, সময় ক্রমে পত্নীর প্রতি সেই প্রেম অর্পিত হইল। প্রণয়-মিলনে মনের সুখে আনন্দে দম্পতী কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।